প্রচার।

মাসিক পত্র

প্রথম বৎসর

১২৯১-৯২

কলিকাতা।

২ নং ভবানীচরণ দত্তের গলি হইতে
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট পিপলস্ প্রেসে
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র

১ম খণ্ড।] ১৫ই শ্রাবণ, ১২৯১। [১ম সংখ্যা।

সূচনা।

আমাদিগের এই মাসিক পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখবন্ধ লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিক পত্র থাকিতে আবার একখানি এমন ক্ষুদ্র পত্র কেন? সেই কথা বলিবার জন্যই এই সূচনাটুকু আমরা লিখিলাম।

এ কথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে, বল্মীকও আছে। সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না আমরা সেই খানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল—প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া বহিবে ভরসা আছে।

দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক এক খানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্যকক্ষ;—দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতা, এবং গাম্ভীর্য্যে সমান-

জীবী মার্কণ্ডেয় বা অষ্টাদশ পুরাণপ্রণেতা বেদব্যাসেরই আত্মজ বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম, যে রাবণ কুম্ভকর্ণ মেঘেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কণ্টেম্পোরারি বা নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরি পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব সম্ভবে, ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালীর দেশে, সে সকল সম্ভবে না। ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী বড় অর্থোদরপুর হইলেও ছয় ফর্ম্মা সুপাররয়াল মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দেখি যে, মাসে মাসে অল্পলোকই ছয় ফর্ম্মা সুপাররয়াল আয়ত্ত করিতে পারেন। যাহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, অর্থচিন্তায় এবং সংসারের জ্বালায় শশব্যস্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত,—এক মাসে ছয় ফর্ম্মা পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফর্ম্মার মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু বুলাইয়া তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন। তার পর সেই জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যারসপরিপূর্ণ মাসিক পত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোষের নীচে পড়িয়া যায়। ক্রমশঃ দীপতৈল তাহাকে নিষিক্ত করিতে থাকে। বুভুক্ষু পিপীলিকা জাতি তদুপরি বিহার করিতে থাকে। এবং পরিশেষে বালকেরা তাহা অধিকৃত করিয়া ছাঁটিয়া, কাটিয়া, ল্যাজ বাঁধিয়া দিয়া ঘুড়ী করিয়া উড়াইয়া দেয়;—হেম বাবু রবীন্দ্র বাবু নবীন বাবুর কবিতা, দ্বিজেন্দ্র বাবু যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্র, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচন, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া গগন-পথে উত্থান পূর্ব্বক বালকগুলীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার ত কথাই নাই।

উনন ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা, মাজা, ঘষা প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সে পত্র নিজ সাময়িক জীবন চরিতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষে সদ্গতি বটে, এবং ছয় ফর্ম্মার স্থানে তিন ফর্ম্মা আদেশ করিয়া 'প্রচার' যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না ; গত্যন্তর ও বেণের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফর্ম্মায় এই ভরসা করা যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে ; এবং পাকশালের কার্য্যনির্ব্বাহে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে, গৃহিণীদিগের সহিত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে।

তার পর টাকার কথা। বৎসরে তিন টাকা অতি অল্প টাকা—অথচ সাময়িক পত্রের অধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট শুনিতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীরা যে স্বভাবতঃ শঠ বঞ্চক এবং প্রতারক, ইচ্ছাপূর্ব্বক সাময়িক পত্রের মূল্য ফাঁকি দেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না, সুতরাং আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, তিন টাকাও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ক্ষমতাতীত। সকলের তিন টাকা জোটে না এই জন্য দেন না, দিতে পারেন না বলিয়াই দেন না। যাঁহারা তিন টাকা দিতে পারেন না, তাঁহারা দেড় টাকা দিতে পারিবেন এমত বিবেচনা করিয়া, আমরা এই নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশ করিলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি লোক পড়েই না, টাকাই দেয় না, তবে এত ভস্মরাশির উপর আবার এ নূতন ছাই মুঠা ঢালিবার প্রয়োজন কি ? সাময়িক সাহিত্য যদি আমরা ছাই ভস্মের মধ্যে গণনা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ

কার্য্যে হাত দিতাম না। আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা-বৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটী প্রধান উপায়। যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নতিসাধক তত্ত্ব, দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ্য এবং বহু পরিশ্রমে অধ্যয়নীয় গ্রন্থ সকলে, সাগর-গর্ভনিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কাইত থাকে, তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি সাময়িক পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। আর সাময়িক পত্রের সমকালিক লেখক ও ভাবুকদিগের মনে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত করিবার সাময়িক পত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাহা না থাকিলে লেখক ও ভাবুকদিগকে প্রত্যেকে এক এক খানি নূতন গ্রন্থ প্রচার করিতে হয়। বহু সংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ পাঠক কর্তৃক সংগৃহীত এবং অধীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সাময়িক পত্রই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভাব উভয় প্রচার পক্ষেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই আমরা সর্ব্ব-সাধারণ-সুলভ সাময়িক পত্রের প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে, "নবজীবন" নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত্ন করিব। সত্য ধর্ম্ম এবং আনন্দের প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম "প্রচার।"

যখন সর্ব্বসাধারণের জন্য আমরা পত্র প্রচার করিতেছি, তখন অবশ্য ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য যে, প্রচারের প্রবন্ধগুলি

সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকেরা এ বিষয়ে কতদূর মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না—আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকিবে ইহা বলিতে পারি। কাজটা কঠিন, কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এমন ভরসা অতি অল্প। তবে সাধারণপাঠ্য বলিয়া আমরা বালকপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত করিব না। ভরসা করি, প্রচারে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অপণ্ডিত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনীয় হইবে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতবিদ্য ব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা শুনিবে, তাহা পণ্ডিতের পড়িবার বা বুঝিবার বা শুনিবার যোগ্য নয়। আমাদিগের এ বিষয়ে অনেক সংশয় আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মূর্খে তুল্য মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিয়াছেন। ভিতরে সকলেরই মনুষ্যপ্রকৃতি এক। আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে, অজ্ঞানীকে যতটা ঘৃণা করি, বোধ হয় ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান পাতিয়া শুনিতে পারেন, আজকার দিনে এ বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক বলিবার কথা আছে!

এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কেন না পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ, যাঁহারা বিদ্বান্, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপ-

হার প্রদান করেন। এ কাজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা করেন। আমরা মনুষ্যের নিকট সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাঁহার নিকট মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও কীটাণুমাত্র, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাঁহার প্রসাদ মাত্র। এবং সকল অসিদ্ধি তাঁহার কৃত নিয়মলঙ্ঘনেরই ফল।

বাঙ্গালার কলঙ্ক।

যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন।

যাহা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও

এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ নর্ম্মানের অধীন হইয়াছিল, জর্ম্মানির প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি, রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না।

বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী

পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কীওয়ালার যে সকল বল-বীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল অনৈতিহাসিক কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।

পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এবিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাঁহার মতের সৎপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাঁহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণই নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন। গথ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেনপালসম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি। সে কথা গুলি এই :—

ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তার পর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক্ তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেন বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন। সেন-

বংশীয়েরা পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পাল-বংশীয়েরা মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের সিপাহি পল্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিতদ্বার,এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট সিপাহি মধ্যে গণ্য। অথচ আমরা রাজেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বে দেখিতে পাইতেছি, পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা আসিয়া বেহার জয় করিয়াছিল। সেন-বংশীয়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল,ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে গুপ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গালী কর্ত্তৃকই বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজি কথা না হয় ছাড়িয়া দিই।

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস্ গ্যাঙ্গ্যারিডি Gangaridai নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জনপদের স্থান-নির্ণয় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, 'যেখানে' গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্ব্ব সীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের ঐ Gangaridai শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রকে লোকে গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্ভব—সুরাষ্ট্র (সুরট), মধ্যরাষ্ট্র (মেবাড়), গুর্জ্জররাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি দেশের ন্যায় যেরূপ

রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ় হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট্ শব্দ বা রাঢ়শব্দ প্রচলিত থাকিবে। সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ "গঙ্গা-তীরস্থ" শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকে "তীরস্থ" বলে। ত্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম "তীরভুক্তি।" এস্থলেও গঙ্গাশব্দ পরিত্যাগ হইয়া কেবল "তীর" শব্দ আছে। গঙ্গারাঢ়ও সেই জন্য এখন "রাঢ়" শব্দে দাঁড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ়দেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস্ বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহা-দিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেগ্জাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেগ্জাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন; ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস। আমরা নূতন সাক্ষী শিখা-ইয়া আনিতেছি না।

অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাঢ়ী-দিগের নাম তখন আমরা কেহ পূর্ব্বে শুনি নাই। যখন মার্সম্যান প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের কাছে আমরা স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাঢ়ীর নাম আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু গঙ্গারাঢ়ী নাম আমরা নূতন

গড়িলাম না। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। যেখানে দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস্ Gangaridai বলেন, সেই প্রদেশকেই লোকে এখন রাঢ়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢ়ী নামের ঐতিহাসিক সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমরা কেবল সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে অবগত আছেন, ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহ (Mackenzie's Collection) নামে কতকগুলি দুর্লভ ভারতবর্ষীয় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সে গুলি মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে। অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থের একটী তালিকা উইল্সন্ সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, লিখিত আছে যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাঢ়ী নাম নূতন গড়ি নাই। তবে অনভিজ্ঞ ইংরাজেরা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই যে অনন্ত বর্ম্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ। উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ—ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গা বা চোরগঙ্গা

নামে একজন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন করেন। এ কথাটী মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমাময় রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী ছিলেন,* এই কথা যাহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক তাহারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন। উইলসন্ সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত পৃষ্ঠাতেই যে একখানি সাশনের উল্লেখ আছে,তাহাতে লিখিত আছে,রাঢ়ী কোঁলাহলই উড়িষ্যা-বিজেতা এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না।

ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোনার্কের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত। বাঙ্গালার পাঠানেরা যতবার তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, ততবার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত হইয়াছিল। বরং গঙ্গাবংশীয়েরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত। একদা লাঙ্গলীয় নরসিংহ নামে এক জন গঙ্গাবংশীয় রাজা বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানের ঐরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় এবং নগর আক্রমণ করিয়া লুঠপাঠ করিয়া পাঠানের সর্ব্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান। উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ

---

* "বর্ম্মা" শব্দে বুঝাইতেছে যে, উহাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব না, তবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণকেই বা বাঙ্গালী বলিব কেন?

চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসন রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।

এই সকল কথার পর্য্যালোচনা করিয়া, হণ্টর সাহেব সেকালের উড়িয়া সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাঢ়ীসৈন্তের প্রাপ্য। সকলেই জানেন যে, উড়িষ্যায় গঙ্গা-বংশীয়দিগের সাম্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুদায় এবং যাহা বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্ম্ম্যান্ উইলিয়ম্ ইংলণ্ড জয় করিয়া নর্ম্মাণ্ডির রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যায় বাস করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত রহিল ইহাই সম্ভব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধিকার ছিল। বাঙ্গালার মুসল-মানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, কাজেই প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাঢ়ীগণ কর্ত্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাঢ়ী বাঙ্গালিরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত ছিল, তবে অন্যান্য বাঙ্গা-লিরা এত হীনবীর্য্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য

বাঙ্গালিরা রাঢ়ীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিল, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বাঙ্গালিদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। রাঢ়দেশের কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল,* এবং সেনরাজারা যে উহা গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। অন্য বাঙ্গালিদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই—কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশেই হয় নাই, ইহা বঙ্গদর্শনের "ভারতকলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ (১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা। বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু, আমরা যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে। সুতরাং এবারে আমাদিগকে এইখানেই নিরস্ত হইতে হইল। বারান্তরে এই কথা সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিব।

* এই জন্যই কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজা পৃথক্ হওয়াতে সমাজও পৃথক্ হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্ম।

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছি। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আহ্লাদের বিষয় বটে। জাতীয় ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য হিন্দুধর্ম্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে "সত্য সত্য" বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অনেকে স্বকারী করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।*

এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি যে, হিন্দুধর্ম্মের নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে। যথা একাদশীর ব্রত স্বাস্থ্যরক্ষার একটী উত্তম উপায়। তবে শরীররক্ষার ব্রতই কি হিন্দুধর্ম্ম? আমরা একটী জমীদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং

* পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।

অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন। এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছু মাত্র বিঘ্ন হইলে মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন,—ভোজনান্তে জমিদারী কার্য্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকর্দ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহ্নিকে, ক্রিয়া কর্ম্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্রে ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া

দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম করেন এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকে বঞ্চনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির সস্নেহ প্রতি-পালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়— তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই ধর্ম্ম? যদি আচার ধর্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?

ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র বিহিত আচারবান্ নহে, এজন্য এ হিন্দু নহে। কোথায় এ হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ পাইব?

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুশাস্ত্রেই হিন্দুধর্ম্ম আছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কি? শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে 'মনুসংহিতা'। মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগ-পুষ্করিণ্যাদির

জলে স্নান পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে*। যে হিন্দুধর্ম্মে তৃষিতকে এক গণ্ডূষ জলদানের অপেক্ষা আর পুণ্য নাই বলে, সেই হিন্দুধর্ম্মেরই এই গ্রন্থে বলিতেছে যে, সহস্র সহস্র লোককে জলপিপাসাপীড়িত করিয়া প্রাণে মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি হয়, তবে এরূপ নৃশংস ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবনে কি ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দুধর্ম্ম নহে, যুদ্ধনীতি মাত্র,—কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে এ হিন্দুধর্ম্মে মন্বাদি অপেক্ষা মোল্‌ত্‌কে ও নেপোলিয়ন্ অধিক অভিজ্ঞ।

স্থূল কথা এই, মনুতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ধর্ম্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ হইতেছে। এ সকলকে যদি ধর্ম্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, চোরের ধর্ম্ম লুকাচুরি, তখন যেমন ধর্ম্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল বিধিকে "রাজধর্ম্ম" ইত্যাদি বলা, সেইরূপ। তবে মনুতে যাহা যাহা পাই, তাহাই যদি ধর্ম্ম নহে, তবে জিজ্ঞাসা, মনুর কোন্ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম্ম আছে এবং কোন্ গুলিতে নাই, এ কথার কে মীমাংসা করিবে? যদি মন্বাদি ঋষিরা অভ্রান্ত হন, তবে তাঁহাদিগের সকল উক্তিগুলিই ধর্ম্ম—যদি তাহাই ধর্ম্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক্ তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বাণিজ্য করে,

*ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারোপরিখাস্তথা ইত্যাদি। ৭ অধ্যায় ১৯৬।

তাহাকে খাওয়াইবে না; যে টাকার সুদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদাধ্যয়নশূন্য, তাহাকে খাওয়াইবে না, যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না। যাহার অনেক যজমান, তাহাকে খাওয়াইবে না। যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না, যে শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না, যে শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে কি শূদ্রকে অধ্যয়ন করায়, যে ছল করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করে, যে দুর্জ্জন, যে পিতা মাতার সহিত বিবাদ করে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদি বহুবিধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, মিত্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুর এই বিধি অনুসারে চলিলে শ্রাদ্ধকর্ম্মে আজিকার দিনে একটীও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, সুতরাং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অথচ যে বাপের শ্রাদ্ধ করিল না, তাহাকেই বা হিন্দু বলি কি প্রকারে? এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা কোন রূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্ম্মে এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সর্ব্বাংশে সংমিলিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? দুইটী মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ অর্থাৎ যে টুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত

হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম একবারে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আর কোন নূতন ধর্ম্ম সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত,না সমাজকে একেবারে ধর্ম্মহীন রাখা উচিত? যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।* আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে,কোন্ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে; কেহই হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইস্‌লাম্ কতকগুলা বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা

* অনেকে বলেন যে, ধর্ম্ম (Religion) পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া, কেবল নীতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নীতিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমূলক।

পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন কুক্কুট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই; তখন আর কোন্ ধর্ম্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব? ব্রাহ্মধর্ম্মের আমরা পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে।

যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে? তবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না। এবং বোধ হয় কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম আছে; তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই সবমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুসমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেই টুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম

নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়; তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মেই নাই। সেই টুকু সার ভাগ। সেই টুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে। প্রথম, বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। তাঁহাদের যা হোক্ একটা ধর্ম্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দু-

ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

আর একটী গোলযোগ এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্ টুকু ধর্ম্ম, কোন্ টুকু ধর্ম্ম নয়? কোন্ টুকু সার, কোন্ টুকু অসার? উত্তর, আপনারাই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেই খানেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ না দেখিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে?

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্পলোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সংসার।

সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?

সংসার অসার এই, সংসারে কিছুই নেই,
সংসার বিষের তরু দুঃখফলময়!
কেহ বলে এই সার, এই ছাড়া নাই আর,
এই কয় অক্ষরেই জগত জড়ায়!
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?

সংসার সকলি ভুল, সংসার পাপের মূল,
সংসার ত্যজিলে জীব মুক্তিপদ পায়,
শুনি কোনো শাস্ত্র-মুখে, কোনো বা শাস্ত্রের বুকে,
সংসার, প্রণব লেখা সোনার পাতায়!
সংসার তোরে রে আমি ভাবিকি প্রথায়?

বিধাতার যত লীলা, তোরই কোলে ছড়াইলা,
তুই না থাকিলে সৃষ্টি জড়পিণ্ডময়!
তুই বিনা এ আকাশ, শূন্য খালি পরকাশ,
এ সূর্য্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণশূন্য হয়!
সংসার, তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায়?

যেখানে রে তোর ঘটা, সেইখানে দেখি ছটা—
এই মাঠ এই বন এই মরু-গায়!
হেরি রে নগরতলে, তোরই সে তুফান্ চলে—
নরকঙ্কালের কায়া কত ভাসে তায়!
সংসার, তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায়?

তোরই ষড়-রস-জলে ধরণী ভাসিয়া চলে,
তোরি ফুলে ফুলময় আকাশ ভূতল!
তুই রে মোহন-বাঁশী, তুই রে প্রকৃতি-হাসি,
তুই রে একাই এই জীবন-সম্বল!
কি ভাবে, সংসার, তোরে সুধাই রে বল্?

তুই নরকের রথ, তুই পুনঃ স্বর্গপথ,
ইহ-পরলোকই তুই, নিত্যের স্বরূপ,
সদসৎ যত আর তড়িচ্ছটা কল্পনার,
তুই রে সুধার হ্রদ, তুই বিষকূপ।
সংসার, তোরে রে আমি ভাবিব কিরূপ ?

ত্যজিয়ে সংসার তোরে, কি নিয়ে এ ভবঘোরে,
হাসিবে কাঁদিবে প্রাণী, হেরিবে কি আর ?
হাসিকান্না নাহি যায়, কি লাভ হেরিয়ে তায়,
সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার।
জীবজগতের চক্ষু তুই রে সংসার।

আমারে চরণতলে, মথিস্ যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস্ উদ্গার,
সংসার, তোরই ও মুখে চাহিয়ে থাকিব দুখে,
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর ?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার।

সংসার, তোরই ও মুখে, হেরিব আবার সুখে,
হেরিব যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই।
"আমি যার সে আমার" এই বাক্য যবে সার
হবে এই ভবতলে, সবার সবাই!
সংসার তোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই॥

সীতারাম।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এখনও এ প্রদেশে এমন অনেক স্থূলবুদ্ধি লোক আছেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা-নিবাসী ভ্রাতৃগণকে "বাঙ্গাল" বলিয়া উপহাস করেন। এখনও অনেক বিষয়ে, পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা, আমাদের অপেক্ষা ভাল। কিন্তু যখন, কলিকাতা ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল, বাঘের ভয়ে রাত্রে লোক ঘরের বাহির হইত না, তখন পূর্ব্ববাঙ্গালা জনপূর্ণ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামনগরাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গালায় অনেক বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থে তাহারই মধ্যে এক জনের কথা বলিব। আমার যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহার অনেক কথা, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, উপন্যাসে গাঁথিয়া বলিতে হয়, কিন্তু এ গ্রন্থ উপন্যাস হইলেও সে মহাত্মা ঐতিহাসিক, তাঁহার কালও ঐতিহাসিক। মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা তাঁহাকে দস্যু বলিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় শিবজীকেও তাঁহারা ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

পূর্ব্বকালে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম "ভূস্‌নো।" যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত

না, তখন সেই ভূষণা অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। এক জন ফৌজদার সেখানে বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় এক শত আশী বৎসর পূর্ব্বে, এক দিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সোরু গলির ভিতর, পথের উপর এক জন মুসলমান ফকির শুইয়াছিল। ফকির, আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। এমন সময়ে সেখানে এক জন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক বড় দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু ফকির পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে মাতা মরে, অন্তিম কাল উপস্থিত। তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সেকালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল। খোদ আকবর শাহ, ইস্‌লাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও, এক জন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন। হিন্দুরা ফকিরদিগকে মান্য করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত। গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিলেন না। বলিলেন,

"সেলাম্ শাহ সাহেব! আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িল না, কোন উত্তরও করিল না।—গঙ্গারাম যোড়হাত করিল, বলিল,

"আল্লা তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ্! আমায় একটু পথ দাও।"

শাহসাহেব নড়িলেন না।—গঙ্গারাম যোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছু-তেই নড়িল না, কথাও কহিল না। অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিল—সে কাজির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে আপনার বাটীতে ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই চারি বার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম ক্ষণেক কাল অতিশয় চীৎকারপরায়ণা স্বীয় ভগি-নীকে শান্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন। তার পর তাহাকে এক জন প্রতিবাসিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, মার সৎ-কারের জন্য পাড়া প্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেলেন। পাঁচ জন সজাতি যুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্নে ভগিনী এবং প্রতিবাসিগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দুই জন পাইক, ঢাল সড়কি বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বড় বিষণ্ণ হইলেন।

সভয়ে দেখিলেন, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল,

"কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর? আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিল,

"কাফের! বদরখ্‌ত! বেতমিজ্‌! চল্‌।"

পাইকেরা বলিল, "চল্‌!"

এক জন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর এক জন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। এক জন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর এক জন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথায় পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজির কাছে লইয়া গেল। ফকির মহাশয় দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্ব্বোধ্য ফার্‌সি ও আর্‌বি শব্দসকল সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজি সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদি শাহ সাহেব—সাক্ষী ও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্ত্তা শাহ সাহেব। কাজি মহাশয় তাহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরাণ ও নিজের চসমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক্ সমালোচনা করিয়া, পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেল। যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তার যে দুই চারিটী দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজি সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দিল এবং যে সকল কথার অর্থ হয় না, এরূপ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাকে গালি দিতে দিতে এবং ঘুসী কীল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল। সে দিন সন্ধ্যা হইয়াছিল ; সে দিন আর কিছু হয় না—পরদিন তাহার জীবন্ত সমাধি হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটীতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ সম্বাদ পৌঁছিল। ভগিনী শুনিল, ভাইয়ের কাল জীবন্ত কবর হইবে। তখন সে মেয়ে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনীর নাম শ্রী। বোধ হয়, প্রথমে নামটা শ্রীমতী কি শ্রীশালিনী—কি এমনি একটা কিছু সুশ্রাব্য শব্দ ছিল। কিন্তু এখন সে সকল লোপ পাইয়াছিল। নামের মধ্যে কেবল শ্রী টুকু অবশিষ্ট ছিল। সকলেই তাহাকে শ্রী বলিয়া ডাকিত—আর কিছু বলিত না। এখন তাহার বয়স ২৫ বৎসর হইতে পারে। গঙ্গারামের অনুজা। গঙ্গারামের প্রথম স্ত্রী গত হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে

পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়া, পিত্রালয়ে বাস করিতেছিল। প্রথম পত্নীর গর্ভজাত গঙ্গারামের কোন সন্তানাদি ছিল না। সুতরাং সম্প্রতি সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামী-সহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া, প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রীও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া, মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! হে অনাথনাথ! আমি, আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও। আমি স্ত্রীলোক পাপিষ্ঠা। আমা হইতে কি হইবে! তুমি দেখিও, ঠাকুর!"

এই বলিয়া সেখান হইতে শ্রী অপসৃতা হইয়া বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, সে শ্রীর মার অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি চুপি কি বলিল। পরে দুই জনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল। শ্রী মধ্যে মধ্যে অনুচ্চস্বরে একটু একটু কাঁদে, আবার চুপ করে। সে দেশে কোটা ঘর তত বেশী নয়, কিন্তু এখনকার অপেক্ষা তখন কোটা ঘর অধিক ছিল, মধ্যে মধ্যে একটি একটি বড় বড় অট্টালিকাও পাওয়া যাইত।

ঐ দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া, এমনি একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে দিঘী, দিঘীতে বাঁধা ঘাট। বাঁধা ঘাটের উপর কতকগুলা দ্বারবান্ বসিয়া, কেহ সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, কেহ টপ্পা গাইতেছিল, কেহ স্বদেশের প্রসঙ্গে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিল। তাহাদেরই মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া পাঁচকড়ির মা বলিল,

"পাঁড়ে ঠাকুর! ভাণ্ডারীকে ডেকে দাও না?" দ্বারবান্ বলিল, "হাম পাঁড়ে নেহি, হাম্ মিশর হোতে হেঁ।"

পাঁচকড়ির মা। তা জানি না, বাছা! পাঁড়ে কিসের বামুন? মিশর যেমন বামুন?

তখন মিশ্রদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ ভাণ্ডারী লেকে কেয়া করোগে?"

পাঁচকড়ির মা। কি আর করিব? আমার ঘরে কতকগুলা নাউ কুমড়া তরকারী হয়েছে, তাই বলে যাব যে, কাল গিয়ে যেন কেটে নিয়ে আসে।

দ্বারবান্। আচ্ছা, সো হাম্ বলেঙ্গে। তোম ঘর্‌মে যাও।

পাঁচকড়ির মা। ঠাকুর, তুমি বলিলে কি আর সে ঠিকানা পাবে, কার ঘরে তরকারী হয়েছে?

দ্বারবান। আচ্ছা। তোমারি নাম বোল্‌কে যাও।

পাঁচকড়ির মা। যা আবাগির বেটা! তোকে একটা নাউ দিতাম, তা তোর কপালে হলো না।

দ্বারবান। আচ্ছা তোম্ খাড়ি রহো। হাম্ ভাণ্ডারীকো বোলাতে হেঁ।

তখন মিশ্র ঠাকুর গুন্ গুন্ করিয়া পিলু ভাঁজিতে ভাঁজিতে অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অচিরাৎ জীবন

ভাণ্ডারীকে সম্বাদ দিলেন যে, "একঠো তরকারিওয়ালি আয়ি হ্যায়। মুঝকো কুছ মিলেগা তোমকো বি কুছ মেল সক্‌তা হায়। তোম জল্‌দী আও।"

জীবন ভাণ্ডারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো চাবি ঘুন্‌সিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ। কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশা পাইয়া সে শীঘ্র বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, দুইটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কে ডেকেছ গা?"

পাঁচকড়ির মা বলিল, "এই আমার ঘরে কিছু তরকারি হয়েছে, তাই ডেকেছি। কিছু বা তুমি নিও কিছু বা দ্বারবান্‌জীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।"

জীবন ভাণ্ডারী। তা তোর বাড়ী কোথা বলে যা, কাল যাব।

পাঁচকড়ির মা। আর একটী দুঃখী অনাথা মেয়ে এয়েছে, ও কি বল্‌বে একবার শোন।

শ্রী গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষভাবে বলিল,

"ও ভিক্ষে শিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।" পাঁচকড়ির মা তখন অস্ফুটস্বরে ভাণ্ডারী মহাশয়কে বলিল, "ভিক্ষেই যদি কিছু পায় ত অর্দ্ধেক তোমার।"

ভাণ্ডারী মহাশয় তখন প্রসন্নবদনে বলিলেন, "কি বল মা?" শ্রী একটু মাথা তুলিয়া, একটু ঘোমটা কম করিয়া, লজ্জায় বড় জড় সড় হইয়া, কোন রকমে, কিছু বলিল। কিন্তু কথাগুলি এত অস্ফুট, যে ভাণ্ডারী তাহার কিছু শুনিতে পাইল না। ভাণ্ডারী তখন, পাঁচকড়ির মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলে? কিছুইত শুনিতে পাই না।" তখন পাঁচকড়ির মা কথা বুঝাইয়া দিল। সে বলিল, "উনি বলিতেছেন যে, আমি তোমার হাতে যা দিতেছি, তাহা তোমার মুনিবের হাতে দিও। তিনি যা বলেন, আমাকে আসিয়া বলিও। আমি এই খানে আছি।"

এই বলিয়া শ্রী কাঁকালের কাপড় হইতে একটা মোহর

বাহির করিল। সেই মোহর পাঁচকড়ির মা ভাণ্ডারীর হাতে দিল।—ভাণ্ডারী লইয়া প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে জীবন দরজার প্রদীপে সেই মোহরটা একবার দেখিল। দেখিল, একটা সোনার আকব্বরী মোহর। কিন্তু তাহাতে একটা ত্রিশূলের দাগ আছে। ভাণ্ডারী মহাশয় স্থির করিলেন, "এ বেটী ত ভিখারী নয়—এই ত আমার মুনিবকে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে। প্রভু আমার ধনবান্, তাঁর মোহরে দরকার কি? এটা জীবন ভাণ্ডারীর পেটারার মধ্যে প্রবেশ করিলেই শোভা পায়। তবে কি না, যে ত্রিশূলের দাগ দেখিতেছি, এ ধরা পড়া বড় বিচিত্র নহে। ও সব মতিগতি আমার মত দুঃখী প্রাণীর ভাল না—যার ধন তার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই ভাল।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া, জীবন ভাণ্ডারী লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক যেখানে প্রভু গদির উপর বসিয়া আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু টানিতেছিলেন, সেইখানে মোহর পৌঁছাইয়া দিল। এবং সবিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদিত হইল।

জীবন ভাণ্ডারীর মুনিব অতি সুপুরুষ। ত্রিশ বৎসরের যুবা, অতি বলিষ্ঠ গঠন, রূপে কার্ত্তিকেয়। তিনি মোহরটি লইয়া দুই চারি বার আলোতে ধরিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"দুর্গে! এ কি এ!"

ভাণ্ডারী বলিল, "কি বলিব!"

প্রভু বলিলেন, "যে তোকে মোহর দিয়েছে, তাকে এই খানে ডেকে নিয়ে আয়। সঙ্গে কেহ আছে?"

ভাণ্ডারী মহাশয় তরকারীর কথাটা একেবারে গোপন করিবার মানসে বলিলেন, "এক জন মেছুনি আছে।"

প্রভু। সে যেন আসে না, তুইও পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইবি।

শুনিয়া ভাণ্ডারী বেগে প্রস্থান করিল। এবং অচিরাৎ শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্ত্তা বলিলেন,

"আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি আমাকে চিনিয়াছ কি?"

ব্রীড়াবতী কোন উত্তর করিতে পারিল না।

গৃহকর্ত্তা। আমি সীতারাম রায়।

শ্রী মনে মনে হাসিল; মনে মনে বলিল, "এত পরিচয় দেওয়ার ঘটা কেন? আমি না জানিয়া আসিয়াছি, মনে করেন না কি?"

শ্রী, সীতারামের মনের ভাব বুঝিল না। সীতারামের কাছে পরস্ত্রী মাতৃবৎ।·ইহা তাঁহার দৃঢ়ব্রত। তবে এই ত্রিশূলাঙ্কিত মোহরের ভিতর একটা নিগূঢ় কথা ছিল, তাই সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াই সীতারাম এরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বলিলেন,

"আমি সীতারাম রায়—তুমি কে? তোমার মুখে ঘোম্‌টা —কথা কহিতেছ না, আমি চিনিব কি প্রকারে?"

তখন শ্রী, মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী?"

শুনিয়া, শ্রী কাঁদিয়া উঠিল।

সীতারাম বলিলেন, "এত দিনের পর কেন আসিয়াছ? আসিয়াছ ত অত কাঁদিতেছ কেন?"

শ্রী তবু কাঁদে—কথা কহে না। সীতারাম বলিল,

"নিকটে এসো।"

তখন শ্রী, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না—আমার অশৌচ।"

সীতা। সে কি?

গদ্‌গদস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে শ্রী বলিতে লাগিল, "আজ আমার মা মরিয়াছেন!"

সীতারাম। সেই বিপদে পড়িয়া কি তুমি আজ আমার কাছে আসিয়াছ?

শ্রী। না—আমার মার কাজ আমিই যথাসাধ্য করিব। সে জন্য তোমায় দুঃখ দিব না। কিন্তু আজ আমার ভারি বিপদ।

সীতা। আর কি বিপদ?

স্ত্রী। আমার ভাই যায়। কাজি সাহেব তাহার জীবন্তে কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন হাবুজখানায় আছে।

সীতা। সে কি? কি করেছে?

তখন শ্রী যাহা যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায়?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পর এসেছি।

সীতারাম। আমি কি করিব?

শ্রী। তুমি কি করিবে? তবে কে করিবে? আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজি। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য?

শ্রী বলিল, "তবে কি কোন উপায়ই নাই?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিল,

"উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। দেখ দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?

সীতারাম, অনেকক্ষণ ভাবিল। পরে বলিল,

"তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্য, আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে সীতারামকে মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে করিতে ঘোম্‌টা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

সীতারাম দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া, ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি যতক্ষণ না দ্বার খুলি, ততক্ষণ আমাকে কেহ না ডাকে।" মনে মনে ভাবিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?"

বেদ।

বেদ, হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাতিরিক্ত আছে, তাহা বেদমূলক বলিয়া চলিয়া যায়। যাহা বেদে নাই বা বেদবিরুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব।

সকলেই জানেন। বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদ তিনটি—ঋক্, যজুঃ, সাম। অথর্ব্ব সে সকল স্থানে গণিত হয় নাই। অথর্ব্ব বেদ অন্য তিন বেদের পর সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের অনেক শ্লোকার্দ্ধ যজুর্ব্বেদে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যখন বলি, ঋক্ একটী বেদ, যজুঃ একটী বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঋগ্বেদ একখানি বই বা যজুর্ব্বেদ একখানি বই। ফলতঃ এক এক খানি বেদ লইয়া এক একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরী সাজান যায়। এক এক খানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

একওখানি বেদের তিনটী করিয়া অংশ আছে, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ,

উপনিষৎ। মন্ত্রগুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে, যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা, যজুর্ব্বেদসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের এক এক খানি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অনেক। যজ্ঞের নিমিত্ত বিনি-য়োগাদি সহিত মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত গদ্যগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগুলি গ্রন্থ বেদের অংশ। এক উপ-নিষদই ১০৮ খানি।

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই যে, ইহা কেহই প্রণয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে হইতে, মনুষ্য-ভাষায় সঙ্কলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে; অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ করিবেন না, বোধ হয়।

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বসিয়া বসিয়া অগ্নিস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিধি রচনা করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয় পাঠকের মধ্যে অনে-কেই বিশ্বাস না করিতে পারেন। বেদের উৎপত্তিসম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল সবিস্তারে সঙ্কলিত করি-বার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনুষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বেদ যে রূপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সঙ্কলিত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে

হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায়। ঋগ্বে-দের মন্ত্র ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্র; যথা, ইন্দ্রস্তোত্র, অগ্নিস্তোত্র, বরুণস্তোত্র। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রশ্লিষ্টপাঠ গদ্যে বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ত্র গান। ঋগ্বে-দের মন্ত্রও গীত হয় এবং গীত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রের উদ্দেশ্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি।

হিন্দুমতানুসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামিত্যাদি*" কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কাছে ঋগ্বে-দেরই প্রাধান্য। বাস্তবিক ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পরিচয় পশ্চাৎ দিব, অগ্রে সংহিতার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

ঋগ্বেদে দশটী মণ্ডল ও আটটী অষ্টক। এক একটী মন্ত্রকে এক একটী ঋচ্ বলে। এক ঋষির প্রণীত এক দেবতার স্তুতি সম্বন্ধে মন্ত্রগুলিকে একটী সূক্ত বলে। বহুসংখ্যক ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত সূক্তসকল এক জন ঋষি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইলে একটী মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটী মণ্ডল ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে। কিন্তু এরূপ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারিব না। এগুলি কেবল ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম। আমরা পাঠককে ঋগ্বেদ-সংহি-তার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দুই একটা সূক্ত বা ঋক্ উদ্ধৃত করিব। সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্ উদ্ধৃত

* বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ইত্যাদি।

করিতেছি। কিন্তু ইহার একটী "হেডিং" আছে। আগে "হেডিং"টী উদ্ধৃত করি।

"ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দ্দেবতা।
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।"

আগে এই "হেডিং"টুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ "হেডিং" সকল সূক্তেরই আছে। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা দেখিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, সে সকলেরও ঐরূপ একটু একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক্, এই "হেডিং"টুকুর তাৎপর্য্য কি? ইহাতে চারিটী কথা আছে, প্রথম, এই সূক্তের ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। দ্বিতীয়, এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। তৃতীয়, এই সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী। চতুর্থ, এই সূক্তের বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সূক্তের একটী ঋষি, একটি দেবতা, ছন্দ এবং বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি?

প্রথম, ঋষিশব্দটুকু বুঝা যাক্। ঋষি বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর শাদা দাড়ীওয়ালা গেরুয়াকাপড়-পরা সন্ধ্যাহ্নিক-পরায়ণ ব্রাহ্মণ—বড় জোর সেকালের ব্যাস বাল্মীকির মত তপোবল-বিশিষ্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে করি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে ঋষিশব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই।

বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম "নিরুক্ত।" নিরুক্ত একটি "বেদাঙ্গ।" যাস্ক, স্থৌলষ্টিবী, শাকপূণি প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ নিরুক্তকর্ত্তা। বেদের কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখন, নিরুক্তকার ঋষিশব্দের অর্থ কি বলেন? নিরুক্তকার বলেন এই যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ" অর্থাৎ যাহার

কথা সেই ঋষি*। অতএব যখন কোন সূক্তের পূর্ব্বে দেখি যে, এই সূক্তের অমুক ঋষি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সূক্তটীর বক্তা ঐ ঋষি। এই বক্তা অর্থে প্রণেতা বুঝিতে হইবে কি? যাঁহারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্রণীত নহে, তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদ-মন্ত্রসকল ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহারা মন্ত্ররচনা করেন নাই, জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন। যে ঋষি যে সূক্ত দেখিয়াছিলেন, তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহা জানি, কিন্তু যোগ-বলেই হউক আর যে বলেই হউক, শব্দ যে দৃষ্ট হইতে পারে, ইহা অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। যদি কেহ বিশ্বাস করিতে চান যে, যখন লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, তখন মন্ত্রসকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে। আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরূপ উদাহরণের স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সূক্ত আছে যে, তাহাতে ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গড়িয়াছি, সৃষ্ট করিয়াছি বা জন্মাইয়াছি। সে যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, ঋষি অর্থে আদৌ তপোবল-বিশিষ্ট মহাপুরুষ নহে, সূক্তের বক্তা মাত্র।

এই প্রথম সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা। তার পর দেবতা অগ্নি।

* বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে সম্পূর্ণমৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঋষি-বাক্যকে সূক্ত বলে।

সূক্তের দেবতা কি ? যেমন ঋষি শব্দের আলোচনায় তাহার লৌকিক অর্থ উড়িয়া গেল তেমনি দেবতা শব্দের আলোচনায় ঐ রূপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়িয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" অর্থাৎ সূক্তে যাহার কথা থাকে, সেই সে সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা "Subject" তাই দেবতা।

ইহাতে অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন, এক্ষণে যাহাদিগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সূক্ত সকলে তাঁহারাই স্তুত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অর্থেই তাঁহারা বেদমন্ত্রে দেবতা। এরূপ আপত্তি যে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ দানস্তুতিসকল। কতকগুলি সূক্ত আছে, সে গুলিকে দানস্তুতি বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব ঐ সকল সূক্তের দানই দেবতা। ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি দেবতা শব্দের অর্থ সূক্তের বিষয় (Subject), তবে দেবতার আধুনিক অর্থ আসিল কোথা হইতে? এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেবতা শব্দটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, "যো দেবঃ সা দেবতা" যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপত্তি দেখ। দিব ধাতু হইতে দেব। দিব দীপনে বা দ্যোতনে। যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, অর্থাৎ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। কালে যাহার প্রশংসায় সূক্ত রচিত হইতে লাগিল তাহাই দেব হইল। পর্জ্জন্য যিনি বৃষ্টি করেন, তিনি উজ্জ্বল

নহেন, তিনিও দেব হইলেন। ইন্দধাতু বর্ষণে। সংস্কৃতে একটি র প্রত্যয় আছে। রুদ্ ধাতুর পর র করিয়া রুদ্র হয়, অসু ধাতুর পর র করিয়া অসুর হয়। ইন্দধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র হয়। অতএব যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টি করেন তাঁহাকে উজ্জ্বল বলিয়া মনে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান্—বৃষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই তিনিও বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন। বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন বলিয়াই তিনি দেবতা হইলেন। এ সকল কথার সবিস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে।

"ঋষির্মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।" ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী হইবে না। কেন না ছন্দ ইংরাজি বাঙ্গালাতেও আছে। ঋক্‌গুলি পদ্য, কাজেই ছন্দে বিন্যস্ত। "যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ।" অক্ষর পরিমাণকে ছন্দ বলে। চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার হয়—পয়ার একটি ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, নানা রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সূক্ত যে ছন্দে রচিত,—আমরা যাহাকে "হেডিং" বলিয়াছি, তাহাতে দেবতার ও ঋষির পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। যাঁহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পূর্ব্বকার-কবিদিগের কাব্য পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ প্রথা বাঙ্গালা রচনাতেও ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লিখিত হইত, যথা "গণেশ-বন্দনা।" তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, যথা "ত্রিপদী ছন্দ" বা "পয়ার।" শেষে ঋষি লিখিত হইত, যথা "কাশীরাম দাস কহে" কি "কহে রায় গুণাকর।" ইংরাজিতেও

দেবতা ও ঋষি লিখিত হয়; ছন্দ লিখিত হয় না। যথা, De Profundis দেবতা, Alfred Tennyson ঋষি।

ঋষি দেবতা ও ছন্দের পর বিনিয়োগ। যে কাজের জন্য সূক্তটীর প্রয়োজন, অথবা যে কাজে উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই বিনিয়োগ। যথা, অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগঃ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার। অতএব ইংরাজিতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে, ঋষি (author) দেবতা (subject) ছন্দঃ (metre) বিনিয়োগ (use)।

এক্ষণে আমরা ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিতে পারি।

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥"

'ঈলে,' কি না স্তব করি। "অগ্নিমীলে" কি না অগ্নিকে স্তব করি। এ ঋকের এইটীই আসল কথা। "অগ্নিং" কর্ম্ম "ঈলে" ক্রিয়া। আর যতগুলি কথা আছে, সব অগ্নির বিশেষণ। সে গুলি পরে বুঝাইব। আগে অগ্নি শব্দটি বুঝাই। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, অগ্নি অগ্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে, "অগ কম্পনে।" বাচস্পত্য অভিধানে লেখে, "অগ বক্রগতৌ।" কিন্তু ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে পীড়িত করিব না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটী ব্যাখ্যা অনেক কাজ করিয়াছে। নিরুক্তে সেটী পাওয়া যায়। "অগ্র" শব্দ পূর্ব্বক "নী" ধাতুর পর ইন্‌ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে "অগ্নি" শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। যাহা অগ্রে নীয়মান। এখন যজ্ঞ করিতে গেলে হোম চাই। হোমে অগ্নিতে আহুতি

দিতে হয়। নহিলে দেবতারা পান না। এই জন্য যাহা প্রথমে যজ্ঞে নীয়মান তাহাই অগ্নি। এই ব্যাখ্যাটী পরিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না অগ্নি এই নাম অন্যান্য আর্য্যজাতির মধ্যে দেখা যায়। যথা, Latin *ignis* Slav *Ogni*। তবে নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহার কথা বলিলাম।—কাজেই যদি অগ্রপূর্ব্বক নী ধাতু হইতে অগ্নি হইল, তবে অগ্নি দেবতাদিগের অগ্রণী হইলেন, যদি অগ্রণী হইলেন, তবেই তিনি দেবতাদের প্রধান, আগে যান এ কথাও উঠিল। বহ্বৃক্ মন্ত্রভাগে আছে—"অগ্নির্মুখং দেবতানাম্।" অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ও মুখস্বরূপ। আর "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ" দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মুখ্য। এইরূপ কথা হইতে হইতেই কথা উঠিল, "অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানী" অর্থাৎ অগ্নি দেবতাদিগের সেনানী। সেনানী কি না সেনাপতি।

তার পর এক রহস্য আছে।—আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রে অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুয়ানিতে দেবতাদিগের সেনাপতি কে? পুরাণেতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার, কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্ত্তিকেয়, মহাদেব অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র। যখন এই মত প্রচলিত হইয়াছে, তখন অগ্নি রুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্তু অতি প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগ্নি রুদ্র হন নাই, তখন কার্ত্তিকেয় অগ্নির পুত্র। যাঁহারা এতত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ খুঁজেন, তাঁহারা মহাভারতের বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যা

পর্ব্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইবেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" অগ্নি দেব-সেনানী, শেষ দাঁড়াইল, অগ্নির ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পুত্র।

ক্রমশঃ

সীতারাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দণ্ড চারি ছয় পরে, সীতারাম দ্বার খুলিয়া, জীবনভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মেনাহাতীকে ডাকিয়া আন।"

শুনিয়া জীবন শিহরিয়া উঠিল। ও নামটা শুনিলে, অনেকেই শিহরিয়া উঠিত। জীবন নিজে এ রাত্রিকালে মেনাহাতীর সম্মুখীন হওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিল। বুদ্ধি খরচ করিয়া অলাবুলোভী সেই মিশ্র ঠাকুরকে মেনাহাতীর আহ্বানে পাঠাইলেন। মিশ্র ঠাকুর নির্ভীকচিত্তে মেনাহাতীর সন্ধান করিয়া তাহাকে প্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন।

"মেনাহাতী" একটা হাতী নহে—মনুষ্য, ইহা বোধ হয়, বুঝা গিয়াছে। তবে ইহার অতি প্রকাণ্ড আকার দেখিয়া, লোকে তাহার হাতী নাম রাখিয়াছিল। ইহার প্রকৃত নাম মৃণ্ময়। ইনি সীতারামের সজাতি ও কুটুম্ব, এবং অতিশয় অনুগত ও বশম্বদ। তবে তাঁহার আকার এবং অগাধ বল

ও সাহস বড় বিখ্যাত ছিল। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বড় ভয় করিত, হঠাৎ কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সম্মত হইত না। মৃণ্ময়, পর্ব্বতাকার কলেবর লইয়া, সীতারামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য ডাকিয়াছেন?"

সীতারাম বলিলেন, "বড় জরুরি কাজ আছে। আমার পরিবারবর্গ এখান হইতে লইয়া যাইতে হইবে।"

মৃণ্ময়। কবে?

সীতা। আজ রাত্রেই—এখনই।

মৃ। কোথায় নিয়ে যাব?

সীতা। তাহা কেবল তুমিই জানিবে, আর কেহ যেন না জানে। ছয় কান না হয়। নিকটে আইস, তোমায় কানে কানে বলিয়া দিই।

সীতারাম, মেনাহাতীর কানে কানে একটা স্থানের নাম বলিয়া দিলেন। মেনাহাতী জিজ্ঞাসা করিল,

"জিনিষ পত্র কি লইয়া যাইতে হইবে?"

সীতা। নগদ টাকাকড়ি, গহনাপত্র, যা দামে বেশী, তাই যাইবে। আর যা সঙ্গে না লইলে নয়, তাই যাইবে।

মৃ। আপনি সঙ্গে থাকিবেন?

সীতা। না। কিন্তু আমি শীঘ্র তোমাদের সঙ্গে জুটিব। তুমি বাড়ী বন্ধ করিয়া যাইও।

মৃ। কেন? আজ আপনি কোথা থাকিবেন?

সীতা। আমি আজ এখন বাহির হইব। আজ আর ফিরিব না।

মৃ। তবে আপনি অন্দরে সংবাদ দিন যে, যাত্রা করিতে হইবে।

সীতা। আচ্ছা; আমি অন্দরে যাইতেছি। তুমি দো াগ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম অন্তঃপুরমধ্যে গেলেন। অন্তঃপুরে প্রশস্ত চত্বর মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। চারি দিকে রোয়াক। কোথাও বঁটী পাতিয়া বিপুলস্থূল ঘোর কৃষ্ণাঙ্গী পরিচারিকা মৎস্য জাতির প্রাণাবশিষ্ট সংহারে সমুদ্যত। কোথাও ঘটোধ্নী গাভী কদলী-পত্রাদি বিমিশ্র উদ্ভিদ্ প্রভৃতি কবলে গ্রহণ পূর্ব্বক মিলিত লোচনে সুখে রোমন্থ করিতেছে। পারিস্ নগরী কবলিত করিয়া চতুর্থ ফ্রেডেরিক্ উলিয়মের সে সুখ হইয়াছিল কি না জানি না, কেন না তিনিত রোমন্থ করিতে পারেন নাই। কোথাও কৃষ্ণ-শ্বেতবর্ণবিমিশ্র মার্জ্জার মৎস্যাধারের কিঞ্চিদ্দূরে লাঙ্গুলাসনে অবস্থিত হইয়া মৎস্যকর্ত্তনকর্ত্রীর কিঞ্চিন্মাত্র অনবধানতার প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথাও নিঃশব্দ কুক্কুর অতি ধূর্ত্তভাবে কোন্ ঘরের দ্বার অবারিত তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত। কোথাও বহু বালকগণ একমাত্র অন্নপাত্রকে বেষ্টন করিয়া বর্ষিয়সী কটুম্বিনীর বহুবিধ প্ররোচনে উপশমিত ক্ষুধাতেও আহারে নিযুক্ত। কোথাও অন্য বালকবালিকাসম্প্রদায় কৃতাহার এবং কৃতকার্য্য হইয়া সাতুরে-পাটী পাতিয়া ঈষচ্চঞ্চলশীতলমন্দা-নিলস্নিগ্ধচন্দ্রালোকে শয়ন করিয়া অতি প্রাচীনার নিকট সহস্রবার শ্রুত উপন্যাস পুনঃশ্রবণ করিতেছে। কোথাও নবোঢ়া যুবতী এবং বালিকাগণ বাট্‌নাবাটা কুট্‌নাকোটা দুধজ্বাল ইত্যাদি গৃহকার্য্য উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের কাছে আপনাপন

আশা ভরসা, সুখ সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্যের কথা বলিতেছে। এমন সময়ে অকালোদিত জলদবৎ, উদ্যান-বিহারকালে বৃষ্টিবৎ, দুঃখের চিন্তার কালে অপ্রার্থিত বন্ধুবৎ, নিদ্রাকালে বৈদ্যবৎ, গুরু ভোজনের পর নিমন্ত্রণবৎ এবং অর্থ-শেষ-কালে ভিক্ষুকবৎ, সীতারাম আসিয়া সেখানে দর্শন দিলেন।

"এত কি গোল কচ্চিস্ গো তোরা!" সীতারাম এই কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণকায়াশালিনী মৎস্য-বিধ্বংসিনীর মৎস্য-কর্ত্তন-শব্দ সহসা নির্ব্বাপিত হইল। তাহাকে অনাবৃত শিরোদেশে কিঞ্চিন্মাত্র অবগুণ্ঠন-সংস্থানের উদ্যোগিনী দেখিয়া, ছিদ্রান্বেষিণী মার্জ্জারী মৎস্য-মুণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক যথেপ্সিতস্থানে প্রস্থান করিল। গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র অন্যা পরিচারিকা সেই সুখনিমীলিতনেত্রা কদলীপত্র-ভোজিনী গাভীর প্রতি ধাবমানা হইয়া তাহার প্রতি নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিল। এবং তস্যা স্বামিনীকে চক্ষুরাদি-ভোজিনী ইত্যাদি নবরসাত্মক বাক্যে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিল। উপন্যাসদত্তমনা পাত্রাবিশিষ্টভোজী শিশুগণ অকস্মাৎ উপন্যাসের রসভঙ্গ দেখিয়া আহার্য্যের প্রতি নানাবিধ দোষারোপ পূর্ব্বক অধৌত বদনে দশদিকে প্রস্থান আরম্ভ করিল। যাহারা আহার সমাপন পূর্ব্বক চন্দ্র-কিরণ-শীতল-শয্যায় শয়ন করিয়া উপন্যাস শ্রবণ করিতেছিল, তাহারা তাহার অকালে সমাপন দেখিয়া ঘোরতর অসূয়াসূচক সমালোচনার অবতারণা করিল। উদ্ভিদ্-কর্ত্তন-পরায়ণা সুন্দরীগণ অস্পষ্টালোকে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তথাপি অবগুণ্ঠন দীর্ঘীকৃত করিলেন। যে মেয়েরা বাট্না বাটিতেছিল, তাহারা বড় গোলে পড়িল। এত ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দই বা করি কি করে? আর কাজ বন্ধ করি-

সেই বা কি মনে করিবেন? আর যাহারা দুগ্ধকটাহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা আরও গোলে পড়িল। তাহারা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় সব দুধটুকু উছলিয়া পড়িয়া গেল।

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কেউ গঙ্গাস্নানে যাবে গা?" অমনি "বাবা, আমি যাব" "দাদা, আমি যাব" "জ্যাঠা, আমি যাব" "মামা, আমি যাব" ইত্যাদি শব্দ নানাদিক হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা, অর্দ্ধবয়স্কা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, পোগণ্ড এবং অপোগণ্ড শিশু, সকলেই এক স্বরে বলিল, "আমি যাব।" অকর্ত্তিত মৎস্য অরক্ষিত হইয়া কুক্কুর এবং বিড়ালের মনোহরণ করিতে লাগিল। যত্ন-প্রস্তুত এবং কর্ত্তিত অলাবু এবং বার্ত্তাকুরাশি রোমন্থশালিনী গাভী জিহ্বা প্রসারণ পূর্ব্বক উদরসাৎ করিতে লাগিল, কেহ দেখিল না। কাহারও দুধ আঁকিয়া গেল, কেহ শিল নোড়া বাঁধিয়া পড়িয়া গেল। কাহারও ছেলে কাঁদিয়া বড় গণ্ডগোল বাঁধাইল, কিন্তু কিছুতেই কাহারও দৃক্‌পাত নাই।

সীতারাম বলিলেন, "তবে সকলেই চল। কিন্তু আর সময় নাই, আজ রাত্রে দিন ভাল, খাওয়া দাওয়ার পর সকলকেই যাত্রা করিতে হইবে। অতএব এই বেলা উদ্যোগ কর।"

তৎপরে সীতারাম যথাকালে গৃহিণীর নিকট দেখা দিলেন। গৃহিণী বলিলে একটু দোষ পড়ে। কেন না গৃহিণী শব্দ এক বচন। এদিকে গৃহিণী দুইটি। তবে বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই; আর একবারেও দুই গৃহিণীর সাক্ষাৎ হইতে পারে না। এই জন্য বৈয়াকরণদিগের নিকট করযোড়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া আমরা গৃহিণী শব্দই প্রয়োগ করিলাম।

গৃহিণী দুইটি বলিয়া লোকে নাম রাখিয়াছিল, সত্যভামা আর রুক্মিণী। সত্যভামা এবং রুক্মিণীর চরিত্রের সঙ্গে তাহাদের চরিত্রের যে, কোন সাদৃশ্য ছিল, এমন আমরা অবগত নহি। তাহাদিগের প্রকৃত নাম নন্দা ও রমা। যাঁহার কাছে এখন সীতারাম আসিলেন, তিনি নন্দা। লোকে বলিত সত্যভামা।

নন্দা অন্তরাল হইতে সব শুনিয়াছিল। সীতারামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ গঙ্গাস্নানের এত ঘটা কেন?"

সীতারাম বলিলেন,

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ—"

নন্দা। তা জানি; তিনি মাথায় থাকুন। হঠাৎ তাঁর উপর এ ভক্তি কেন?

সীতা। দেখ, তোমাদের ঐহিক সুখের জন্য আমার যেমন জবাবদিহি, তোমাদের পরকালের সুখের জন্যও আমার তেমনি জবাবদিহি। সাম্‌নে একটি যোগ আছে, তোমাদের গঙ্গাস্নানে পাঠাব না?

নন্দা। তুমি যখন কাছে আছ, তখন আবার আমাদের গঙ্গাস্নান কি? তুমিই আমাদের সকল তীর্থ। তোমার পাদোদক খাইলেই আমার এক শ' গঙ্গাস্নানের ফল হইবে। আমি যাব না।

সীতা। (সত্যভামার নিকট হার মানিয়া) তা তুমি না যাও, না যাবে, যারা যেতে চায় তারা যাক্।

নন্দা। তা যাক্। সবাই যাক্, আমি একা থাকিব, একটু ভূতের ভয় করিবে, তা কি করিব? কিন্তু আসল কথা কি, বল দেখি?

সীতা। আসল আর নকল কিছু আছে না কি ?

নন্দা। তুমি ত ভাজা পটল, ত বল উচ্ছে।

সীতা। তবু ভাল, উচ্ছে ভেজে ত পটল বলি না ?

নন্দা। তা বল না, কিন্তু আমাদের কাছে দুই সমান; লুকোচুরিতেই প্রাণ যায়। ভিতরের কথা কি বলিবে ?

সীতা। বলিবার হইত ত বলিতাম।

অমনি নন্দার মুখখানা মেঘঢাকা মেঘঢাকা আকাশের মত, জলভরা জলভরা ফোটা পদ্মটার মত, হাই দিলে আরসি যেমন হয়, সেই মত এক রকম কি হইয়া গেল। একটু ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে নন্দা বলিল, "তা নাই বলিলে; তা সন্ধ্যার পর তোমার কাছে কে এয়েছিল, সেইটা বল ?"

সীতা। তা ঢের লোক ত আমার কাছে আসে। সন্ধ্যার পর অনেক লোক এয়েছিল।

নন্দা। মেয়েমানুষ কে এয়েছিল ?

সীতা। তাও ত ঢের আসে। খাজনা মিটাতে, ভিক্ষা মাঙ্গ্‌তে, দায়ে অদায়ে পড়িয়া ঢের মাগী ত আমার কাছে আসে। স্ত্রীলোক প্রায় সন্ধ্যার পরই আসে।

নন্দা। আজ সন্ধ্যার পর কজন স্ত্রীলোক এয়েছিল ?

সীতা। মোটে এক জন।

নন্দা। সে কে ?

সীতা। তার ভাই বাঁচে না।

নন্দা। তা নয়—সে কে ? নাম কি ?

সীতা। আর এক দিন বলিব।

এইবার মেঘ বর্ষিল, দর্পণস্থ বাষ্পরাশি জলবিন্দুতে পরিণত হইল,—সত্যভামা কাঁদিল।

তখন সীতারাম নন্দার চিবুক গ্রহণ পূর্ব্বক বড় মধুর আদর করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যেখানে রমা ঠাকুরাণী দর্পণ লইয়া সরু সরু কালো কুচ্‌কুচে চুলের দড়িগুলি গুছাইতেছিলেন, সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। রমা কনিষ্ঠা,—নন্দার অপেক্ষা একে বয়সে ছোট, আবার আকারেও ছোট, সুতরাং নন্দার অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। নন্দার যৌবন এবং রূপ উভয়ই পরিপূর্ণ, শ্রাবণের গঙ্গা,—রমার দুইই অপরিপূর্ণ, বসন্তনিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী ক্ষুদ্রা কল্লোলিনী। নন্দা তপ্তকাঞ্চনবৎ শ্যামাঙ্গী—রমা হিমানি-প্রতিফলিত কৌমুদীবৎ গৌরাঙ্গী। সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। বলিলেন, "রুক্মিণি! গঙ্গাস্নানের কথা শুনেছ?"

রমা। ছি ছি ও কি কথা!

সীতা। কোন্‌টা ছি ছি? গঙ্গাস্নান ছি ছি? না রুক্মিণী ছি ছি?

রমা। তাঁরা হলেন দেবতা, লক্ষ্মী,—আর সেই একটা কি নাম মনে আসে না—

সীতা। শিশুপালের গল্পটা বটে? তা সে কথা রহিল। গঙ্গাস্নানের কথাটা কি? শুনেছ?

রমা। শুনেছি বৈ কি?

সীতা। যাবে?

রমা। তাইত চুলের দড়ি গোছাচ্চি।

সীতা। কেন যাবে? এই ত আমি তোমার সর্ব্ব-তীর্থ কাছে আছি।

রমা। যেতে না বল, যাব না।

সীতা। তবে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে কেন?

রমা। যাইতে বলিতেছিলে বলিয়া।

সীতা। আমি ত যাইতে বলি নাই—আমি কেবল সবাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে, কেহ যাবে? তা তুমি যাবে কি?

রমা। তুমি যাবে কি?

সীতা। যাব।

রমা। তবে আমিও যাব।

সীতা। কিন্তু আজ আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। কাল পথে মিলিব।

রমা। আজ আমাদের নিয়ে যাবে কে?

সীতা। মেনা হাতী নিয়ে যাবে।

রমা। বাপ্‌রে! তা হোক্। একটা কথা বলিবে?

সীতা। কি?

রমা। তোমার কি কাজ?

সীতা। সব কথা কি বলা যায়?

রমা। (সীতারামকে উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া) বলিতে হইবে। তোমার বড় সাহস, আমার বড় ভয় করে, তুমি কোন দুঃসাহসের কাজ করিবে,—তাই আমাদের সরাইয়া দিতেছ।

সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া রমার খোঁপা ধরিয়া টানিল, মারিবার জন্য এক চড় উঠাইল, শেষ রমার নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। বলিল,

"আমি বড় দুঃসাহসের কাজ করিব সত্য, কিন্তু কোন ভয় নাই।"

রমা। তোমার ভয় নাই—আমার আছে। তোমার ভয়

আমার ভয় কি স্বতন্ত্র ? শোন, আজ সবার গঙ্গাস্নানে যাওয়া বন্ধ। তুমি আজ আমার এই ঘরের ভিতর কয়েদী।

বলিতে বলিতে রমা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দ্বারে পীঠ দিয়া বসিল। বলিল, "যাইতে হয় আমার গলায় পা দিয়া যাও। এখন বল দেখি, আজ তোমার কাছে কে আসিয়াছিল ?"

সীতা। তোমাদের কি অষ্ট প্রহর চর ফেরে না কি ?

রমা। ভাণ্ডারী মহাশয় কিছু তরকারির প্রত্যাশায় বঞ্চিত হয়েছেন, তাই আমরা ও কথাটাও শুনিয়াছি। সে কে ?

সীতা। শ্রী।

রমা। সে কি ? শ্রী ? কেন আসিয়াছিল ?

সীতা। তার একটি ভিক্ষা ছিল।

রমা। ভিক্ষা পাইয়াছে কি ?

সীতা। তুমি কি ভিক্ষুককে ফিরাইয়া থাক ?

রমা। তবে সে ভিক্ষা পাইয়াছে। কি দিলে ?

সীতা। কিছু দিই নাই, দিব স্বীকার করিয়াছি।

রমা। কি দিবে শুনিতে পাই না ?

সীতা। এখন না ; দ্বার ছাড়।

রমা। সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে, আমি দ্বার ছাড়িব না।

সীতা। তবে শুন, কাজি সাহেব শ্রীর ভাইকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছেন। শ্রীর ভিক্ষা, আমি তাহার ভাইকে রক্ষা করি। আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি।

রমা। তাই, আমরা আজ গঙ্গাস্নানে যাইব ! তুমি আমাদের পাঠাইয়া দিয়া, নির্ব্বিঘ্নে ফৌজদারের ফৌজের সঙ্গে লাঠালাঠি দাঙ্গা করিবে।

সীতা। সে সকল কথায়, মেয়েমানুষের কাজ কি?

রমা। কাজ কি? কিছুই কাজ নাই। তবে কি না, আমি গঙ্গাস্নানে যাইব না।

এই বলিয়া রমা, ভাল করিয়া দ্বার চাপিয়া বসিল। সীতারাম অনেক কাকুক্তি মিনতি করিতে লাগিল। রমা, দৃক্‌পাতও করিল না।

সীতারাম বড় ফাঁপরে পড়িলেন,—দেখিলেন, অনর্থক সময় যায়। অতএব যাহা বলিবেন না মনে করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন,

"তুমি জান, আমার সত্য-ভঙ্গ হইলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি তা জান ত?"

তখন রমা বলিল, "তবে আমারও কাছে একটা সত্য কর, দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি।"

সীতা। কি বল?

রমা। তুমি বিনা বিবাদ বিসম্বাদে—দাঙ্গা লড়াই না করিয়া শ্রীর ভ্রাতার জন্য যাহা পার, কেবল তাহাই করিবে, ইহা স্বীকার কর।

সীতা। তাতে আমি খুব সম্মত। দাঙ্গা লড়াই, আমার কাজও নয়, ইচ্ছাও নয়। কিন্তু যত্ন সফল হইবে কি না, সন্দেহ।

রমা। হোক্ না হোক্—বিনা অস্ত্রে যা হয়, কেবল তাই করিবে, স্বীকার কর।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সীতারাম বলিলেন,

"স্বীকার করিলাম।"

রমা প্রসন্নমনে, দ্বার ছাড়িয়া দিল। বলিল,

"তবে আমরা গঙ্গাস্নানে যাইব না।"

সীতারাম ভাবিলেন। বলিলেন, "যখন কথা মুখে আনা হইয়াছে, তখন যাওয়াই ভাল।"

রমা বিষণ্ণ হইল, কিন্তু আর কিছু বলিল না। সীতারাম আর কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক গোছ মানুষ, তসর নামাবলী পরিধান, মাথাটি যত্ন-পূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে—কেবল এক "রেফ।" কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা,—খুব লম্বা ফোঁটা, আর আর বামুনগিরির সামান সব আছে। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতা-রাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড়ও তখন সেইখানে বাস করিতেন। সম্প্রতি ভূষণায় বাস করিতেছিলেন। সীতা-রাম একখানি ভাল বাড়ী তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি কি কথা হইল, তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রচূড়ের কাছে লুকা-ইবার যোগ্য সীতারামের কোন কথাই ছিল না। শ্রীর কাছে আর রমার কাছে যে দুইটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সীতারাম তাহা সবিস্তারে নিবেদিত হইলেন। বলিলেন,

"এই উভয়সঙ্কটে কি প্রকারে মঙ্গল হইবে, আমি বুঝিতে

পারিতেছি না। নারায়ণমাত্র ভরসা। মারামারি কাটা-কাটিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। আমি সেই জন্যই মেনা হাতীকে সরাইয়াছি। কিন্তু স্তুতি মিনতিতেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এমন ভরসা করি না। যাই হোক, প্রাণ-পাত করিয়াও আমি এ কাজ উদ্ধার করিতে রাজি আছি। সিদ্ধি আপনার আশীর্ব্বাদ। যদি সিদ্ধি না হয়, তবে পাপ-শান্তির জন্য কাল প্রাতে তীর্থযাত্রা করিব। তাই আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।”

চন্দ্রচূড়। আমি সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি, এখনও করিতেছি, মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি এই রাত্রেই কি তুমি কাজির নিকট যাইবে?

সীতা। না। আজ রাত্রি জাগরণ করিয়া নিভৃতে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব। কাল উপযুক্ত সময়ে কাজির নিকট উপস্থিত হইব।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, সহজ লোক নহেন। মেনা হাতী শরীরে যা, ইনি বুদ্ধিতে তাই। তিনি মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন, “বাবাজি একটু গোলে পড়িয়াছেন, দেখিতেছি। যুদ্ধ বিগ্রহে যে ইচ্ছা নাই, সে কথাটা মনকে চোক্-ঠারাই বোধ হইতেছে। সেই রুক্মিণী বেটীই যত নষ্টের গোড়া। তা বেটী মনে করে কি, রুক্মিণী আছে, নারদ নাই! জাত নেড়ে, বাপু বাচার কি কাজ! নারায়ণ কি নেড়ের দমন করিবেন না? কত কাল আর হিন্দু এ অত্যাচার সহ্য করিবে? একবার দেখি না, সীতারামের বাহুতে বল কত? বৃথাই কি নারায়ণকে তুলসী দিই?”

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তর্কালঙ্কার বলিলেন,

"তুমি তীর্থযাত্রা করিবে, এবং পরিবারবর্গকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইবে শুনিয়া, আমি বড় বিপন্ন হইলাম।"

সীতা। কি? আজ্ঞা করুন।

চন্দ্র। আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ কোন যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহাতে এক সহস্র রৌপ্যের প্রয়োজন। তাই বা আমায় দিবে কে? উদ্যোগই বা করিয়া দেয় কে?

সীতা। টাকা এখনই আনাইয়া দিতেছি। আর উদ্যোগের জন্য কাহাকে চাই?

চন্দ্র। যজ্ঞের যে সকল আয়োজন করিতে হইবে, জীবন ভাণ্ডারী তাহাতে বড় সুপটু। জীবন ভাণ্ডারীকেও আনাইয়া দাও। আমার এই তল্পিদার ভৃত্য রামসেবক বড় গুণবান্ আর বিশ্বাসী। তার হস্তে খাতাঞ্চিকে পত্র পাঠাইয়া দাও, টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীকে আনিবে।

সীতারাম তখন একটু কলাপাতে বাঁকারির কলমে খাতাঞ্চির উপর এক হাজার টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীর জন্য চিঠি পাঠাইলেন। রামসেবক তাহা লইয়া গেল। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন সীতারামকে বলিলেন, "এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, মঙ্গল হইবে।"

তখন সীতারাম গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে অনতিবিলম্বে জীবন ভাণ্ডারী সহস্র রৌপ্য লইয়া আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিল। তর্কালঙ্কার বলিলেন,

"কেমন জীবন! এ সহরে তোমার মুনিবের যে যে প্রজা যে যে খাতক আছে, সকলের বাড়ী চেন ত?"

জীবন। আজ্ঞা হাঁ, সব চিনি।

চন্দ্র। আজ রাত্রে সব আমায় দেখাইয়া দিতে পারিবে ত?

জীবন। আজ্ঞা হাঁ, চলুন না। কিন্তু আপনি এত রাত্রে সে সব চাঁড়াল বাগ্দীর বাড়ী গিয়া কি করিবেন?

চন্দ্র। বেটা, তোর সে কথায় কাজ কি? তোর মুনিব আমার কথায় কথা কয় না,—তুই বকিস্! আমি যা বলিব তাই করিবি, কথা কহিবি না।

জীবন। যে আজ্ঞা, চলুন। এ টাকা কোথা রাখিব?

চন্দ্র। টাকা সঙ্গে নিয়ে চল্। আমি যা করিব, তা যদি কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিস্, তবে তোর শূল-বেদনা ধরিবে—আর তুই শিয়ালের কামড়ে মরিবি।

এখন জীবন ভাণ্ডারী শূল-বেদনা এবং শৃগাল এ উভয়কেই বড় ভয় করিত—সুতরাং সে ব্রহ্মশাপভয়ে আর দ্বিরুক্তি করিল না। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন পূজার ঘর হইতে এক আঁজলা প্রসাদী ফুল নামাবলীতে লইয়া জীবন ভাণ্ডারী ও সহস্র রৌপ্য সহায় হইয়া বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া জীবন ভাণ্ডারী একটা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই এক জন।"

চন্দ্র। ইহার নাম কি?

জীবন। এর নাম যুধিষ্ঠির মণ্ডল।

চন্দ্র। ডাক তাকে।

তখন জীবন ভাণ্ডারী "মণ্ডলের পো! মণ্ডলের পো!" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে ডাকিল। যুধিষ্ঠির মণ্ডল বাহিরে আসিল। বলিল, "কে গা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "কাল গঙ্গারাম দাসের জীয়ন্তে কবর হইবে, শুনিয়াছ?"

যুধিষ্ঠির। শুনিয়াছি।

চন্দ্র। দেখিতে যাইবে?

যুধিষ্ঠির। নেড়ের দৌরাত্ম্য, কি হবে ঠাকুর, দেখে?

চন্দ্র। দেখিতে যাইও। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর হুকুম। এই হুকুম নাও।

এই বলিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর একটী প্রসাদী ফুল নামাবলী হইতে লইয়া যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে। যাইব।"

চন্দ্র। তোমার হাতিয়ার আছে?

যুধি। আজ্ঞে, এক রকম আছে। মুনিবের কাজে মধ্যে মধ্যে ঢাল শড়কী ধরিতে হয়।

চন্দ্র। লইয়া যাইও; লক্ষ্মীনারায়ণজীউর হুকুম। এই হুকুম লও।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার জীবনভাণ্ডারীর থলিয়া হইতে একটী টাকা লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিলেন।

যুধিষ্ঠির টাকা লইয়া—মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে অবশ্য লইয়া যাইব। কিন্তু একটা কথা বলিতেছিলাম কি—একা যাব?"

চন্দ্র। কাকে নিয়ে যেতে চাও?

যুধি। এই পেসাদ মণ্ডল। জোয়ানটাও খুব, খেলোয়াড়ও ভাল—সে গেলে হইত।

তখন চন্দ্রচূড় আর একটী প্রসাদী ফুল ও আর একটী টাকা যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। বলিলেন, "তাহাকে লইয়া যাইও।"

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর সেখান হইতে জীবন ভাণ্ডারীর সঙ্গে গৃহান্তরে গমন করিলেন। সেখানেও ঐ রূপ টাকা ও ফুল বিতরণ করিলেন। এইরূপে সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়া

রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীতে রমাতে সে রাত্রে এমনিই আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল।

গ্রাম্য কথা।

প্রথম সংখ্যা।—পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়।

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া, তাহার পর-চালার নীচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। এক জন পণ্ডিত মহাশয়, বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কান পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ। একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় এক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?"

ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম, "ভোঁদা।" ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভূক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয়, ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে "মূর্খ!" "গর্দ্দভ!" প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন। ছাত্রও কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল,

"কেন, পণ্ডিত মহাশয়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?"

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয় তা কি জানিস্ না?

ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভাল করিয়া চিবিয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?

তখন ভোঁদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে হয়?"

রাম বলিল। আজ্ঞা, ভুজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন, "শুন্‌লি রে ভোঁদা! তোর কিছু হবে না।"

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, "না হয় না হোক্—আপনার যেমন পক্ষপাত!"

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে, হনুমান!

ভোঁদা। ওর কপালে ভুক্তো, আমার কপালে ভূ?

ছাত্র যে সুচর্ব্বণীয় "ভুক্তো" এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন না। রাগ করিয়া, ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং আদেশ করিলেন, "এখন বল্ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি হয়?"

ভোঁদা (চোখে জল)। আজ্ঞে, তা জানি না।

পণ্ডিত। জানিস্ নে? ভূত কিসে হয় জানিস্ নে?

ভোঁদা। আজ্ঞে তা জানি। ম'লেই ভূত হয়।

পণ্ডিত। শূওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়।

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয়। তখন সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল,

"আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয় ?"

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশকালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া, ভোঁদার মা তার কাছে এসে সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল,

"কেন, কি হয়েছে, বাবা ?"

ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, "এখন কি হয়েছে, বাবা! এমন ইস্কুলে আমায় পাঠিয়েছিলি কেন পোড়ারমুখী ?"

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা ?

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা! শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। শিগ্‌গির হোক! আমি তোর শ্রাদ্ধ করি।

মা। সে আবার কি বাপ! কাকে বলে ?

ছেলে। শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক্! শিগ্‌গির হোক।

মা। সে কি মরাকে বলে, বাপ্ ?

ছেলে। তা না ত কি ? আমি তাই বল্‌তে পারি না ব'লে, পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে।

মা। অধঃপেতে মিন্‌সে! আক্কেল নেই! আমার এই এক রত্তি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে! যে কথা কেউ জানে না, তাই বল্‌তে পারে নি ব'লে ছেলেকে মারে! আজ মিন্‌সেকে আমি একবার দেখ্‌বো।

এই বলিয়া, গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু চলিলাম। সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, "হ্যাঁ গা পণ্ডিত মশাই, যা কেউ জানে না, আমার ছেলে তাই বল্‌তে পারে নি ব'লে কি এমনি মার মার্‌তে হয়?"

পণ্ডিত। ও গো এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ভূত কেমন ক'রে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয়, গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে জান্‌বে গা? ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পণ্ডিত। ও গো সে ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত?

পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝ্‌বে? বলি, একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলেমানুষ ওকে কি ও সব কথা ব'লে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখিলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা শীঘ্র

মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম,

"মহাশয় ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।"

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, "আপনি প্রশ্ন করুন।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি, ভূত কয়টি?"

পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয়। শুন্‌লি মাগী?" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, "ভূত পাঁচটি।"

তখন ভোঁদার মা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে রে মিন্‌সে! তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্! ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত না বারো ভূত?"

পণ্ডিত। সে কি, বাছা! ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ। ক্ষিত্যপ্—

ভোঁদার মা। বার ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন তাহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক বলিলাম, "উনি যা বলিলেন, তা হতে পারে। অনেক সময়েই শোনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখন শোনেন নাই, অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে?"

কথাটা শুনিয়া, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি। কেন না বুদ্ধিটা কিছু স্থূল। তাঁকে একটু ভেকাপানা দেখিয়া আমি বলিলাম, "মহাশয় এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন,

"কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাং
ভূত্তানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ।"

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্য্যন্ত। কিন্তু এ দিকে বড় ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন—অতএব যেমন শুনিলেন, "ভূত্তানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ।" অমনই উত্তর করিলেন,

"মহাশয়, যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেইত আছে, "অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলী তরুঃ।"

শুনিয়া, ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল,

"তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে মার কেন?"

পণ্ডিত। আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান্ করিব বলিয়াই ত মারি! না মারিলে কি বিদ্যা হয়?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তাটির কিছু হলো না কেন? ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না।

* অস্যার্থ। কৃপণদিগের ধন আর যাহারা পোষ্যপুত্ররূপ কুষ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন,তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত। বাছা! ও সব কি তোমাদের হাতে হয়? ও আমাদের হাতে।

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে?

এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যা লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, মা, এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূত ছাড়া করিয়াছে।

ঈশ্বরোপাসনা।

(সাকার ও নিরাকার)

অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের উপাসনার কোন প্রয়োজন বিবেচনা করেন না। এই প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য লিখিতেছি না। যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রদায়-বিশেষের মতানুযায়ী উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বস্ব উপাসনা-পদ্ধতিকে প্রশস্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে এবং কি উপাসনা-পদ্ধতি কোন্ স্থলে প্রশস্ত, তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে দেখা যাউক, বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে? আস্তিকগণ সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগতের মূল কারণ এবং সেই কারণ এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এই বিশ্বাস থাকিলেই যে, ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলা যায়, তাহা নহে। কিম্বা ঈশ্বর দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্য অব্যক্ত ইত্যাদি বলিতে পারিলেই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিতে হইবে, তাহা নহে। সেক্ষপীয়র এক জন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের সহিত অন্য কাহারও কাব্যের তুলনা হয় না। ইহা জানিলেই কবি সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ইহা বলা সঙ্গত হয় না। তবে যিনি সেক্ষপীয়রের কাব্যসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহার রসগ্রাহী হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, কবিত্ব বিষয়ে সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। আবার তিনি যদি সেক্ষপীয়রের বাসস্থান, চরিত্র আদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তবে চরিত্রাদি বিষয়ে সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে বলা যায়। ঈশ্বর জগৎ-রচয়িতা বলিলেই যে, ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিয়া লইলাম, তাহা নহে। সেই রচনা-কৌশলমধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি ভাবগ্রাহী হইতে পারি, তবে জগৎ-রচনা বিষয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিব। যেমন সেক্ষপীয়রনামা কবিকে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্য অধ্যয়ন ও রসগ্রহণ প্রয়োজন, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিতে হইলে সৃষ্টিবিষয় অধ্যয়ন এবং ভাবগ্রহণ প্রয়োজন। প্রলয়কর্ত্তাকে জানিতে হইলে প্রলয়তত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং পালনকর্ত্তাকে বুঝিতে হইলে পালন-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এবং যখন একমাত্র ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া জানিতে চাহিব, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ

য়ক জ্ঞান এবং সংহারকর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান যে ঐশ্বরিক এক শক্তির বিষয়, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গুটি কত বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। বাস্তবিক সেই জগৎকারণের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেই অজ্ঞতা যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টাই আমার মতে ঈশ্বরোপাসনা। যিনি এই অজ্ঞতায় অসন্তুষ্ট, জ্ঞানলালসা-বৃত্তিবশতঃ তিনি সেই জগৎ-কারণ-তত্ত্ব-অন্বেষী হন এবং তিনিই আমার মতে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক। অর্থাৎ আগ্রহচিত্তে সেই আদি-কারণের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই তাঁহার উপাসনা। যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে লালসা না থাকে, গির্জ্জায় গিয়া নিজের জন্য প্রার্থনা কর বা মন্দিরে বসিয়া কোন দেব-মূর্ত্তি ভাবনা কর, তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহাতে এমন কেহ না বুঝেন যে, আগ্রহ চিত্তে জগতের কারণ অনুসন্ধান করাই ঈশ্বর-উপাসনা। তাহা হইলে আজকালকার পাশ্চাত্য নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণকে ঈশ্বরোপাসক বলিতে হয়। আগ্রহ চিত্তে সেই এক জগৎ-কারণ-তত্ত্ব-অনুসন্ধানকে ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। অর্থাৎ জগতের আদি কারণ এক এবং অদ্বিতীয়, ইহা বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ সেই কারণের স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। সমুদ্রের তলে কি আছে, ইহা জানিবার জন্য সমুদ্র অন্বেষণ করা, মুক্তা অন্বেষণ করা নয়। সমুদ্রতলে মুক্তা আছে ইহা জানিয়া, সমুদ্র অন্বেষণ করাই মুক্তা অন্বেষণ।

এক্ষণে দেখা গেল যে, ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গ ঈশ্বরের অস্তিত্বে

বিশ্বাস, ঈশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, এই জ্ঞান ও সেই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য জ্ঞান-লালসা এবং সেই জ্ঞান-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, সাধারণ জনগণ কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যে যে পদ্ধতিতে উপাসনা করেন, তন্মধ্যে কাহাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি। সাকার উপাসনাকেই বা কোন্ সময় ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি এবং নিরাকার উপাসনাকেই বা কখন্ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি না?

গাভী একটি সাকার পদার্থ। গাভীগণ দ্বারা আমরা এই সংসারে অনেক উপকার প্রাপ্ত হই। সে উপকার ভুলিবার নয়। সেই জন্য যদি আমি একটি গাভীকে ভক্তিসহকারে পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

অগ্নির অসীম ক্ষমতা। অগ্নি না থাকিলে আমরা মনুষ্যত্ব পাইতাম না। আবার অগ্নি বড় ভয়ের জিনিষ। অগ্নি সম্বন্ধে এই শ্রদ্ধা ও ভয় বিমিশ্রিত হওয়ায়, যদি আমি অগ্নির পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

সূর্য্য এই সৌরজগতের সকল ঘটনার আদি। সূর্য্যের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে উহার মাহাত্ম্যে মন পূরিয়া যায়, এমন অবস্থায় যদি আমি সূর্য্যকে স্তব করি, তবে তাহাও ঈশ্বরোপাসনা নহে।

ছেলেবেলা থেকে শুনিয়া আসিতেছি, প্রলয়ঙ্করী কালী-দেবীর অসীম ক্ষমতা; ভক্তিভাবে তাঁর উপাসনা করিলে ঐহিক পারত্রিক অনেক ফল লাভ হয়। সেই বিশ্বাসে যদি কালীমূর্ত্তি সম্মুখে ধরিয়া কালীর উপাসনা করি, তবে তাহা কালীদেবীর উপাসনা বটে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা নহে।

কিন্তু যদি আমি ঐ গাভী, ঐ অগ্নি, ঐ সূর্য্যকে উপলক্ষ করিয়া জগৎকারণ সেই অনাদি পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা করি, ঐ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলে ঈশ্বরের যে মহিমা বিরাজমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যে, ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়, ইহা বুঝিয়া, সেই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধায়ী হই, এবং সেই সেই মহিমা মাহাত্ম্যে ভাবগ্রাহী হইয়া, ঐ অগ্নি সূর্য্যাদিকেই ভক্তিভাবে প্রণাম করি, তবে আমি ঈশ্বরোপাসনা করিলাম বলিতে হইবে।

যদি কোন দেবতার উপর অশেষ শুভফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস থাকে এবং সেই জন্য সেই দেবদেবীর পূজা করি, তবে তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে, কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধায়ী আমার যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকে যে, শাস্ত্রকারগণ যাঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা যখন দেবদেবীবিষয়ে চিন্তা করা ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান-লাভের এক প্রকার উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী আমার দেবদেবীর বিষয় চিন্তা করা উচিত। এইরূপ দেব-দেবীর চিন্তা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের পথ বুঝিয়া যদি দেবদেবীর উপাসনা করি, তবে ইহা ঈশ্বরোপাসনা।

এরূপ উপাসনায় কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করিতেছি না; কেবল সাকার পদার্থ বিষয় চিন্তার সাহায্যে অনাদিকারণ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি। এরূপ উপাসনাকে সাকার উপাসনা বলিতে হইবে বটে, কিন্তু ইহা সাকার পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করা যে সাকার উপাসনা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণচরিত্র।

ধর্ম্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচন প্রয়োজনীয়। কেন না, বাঙ্গালার ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ বড় বেশী স্থান অধিকৃত করিয়া আছেন। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না। খৃষ্টীয় পাদ্রি ও নব্য বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নিকট কৃষ্ণ অনেক গালিগালাজ খাইয়াছেন, তথাপি তিনি দেশ ছাড়িয়া যান নাই। বরং শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার উপাসনা বিস্তার করিতেছেন। কোন্ বলে তিনি এত জবরদস্তি করিতেছেন, তাহার বিচার নিতান্তই আবশ্যক।

আমার উদ্দেশ্য, প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণসম্বন্ধে কি কি কথা আছে এবং তাহাতে তিনি কি ভাবে স্থাপিত হইয়াছেন, তাহাই দেখাইব। বাকীটুকু পাঠক আপনি স্থির করিয়া লইবেন।

যে প্রাচীন গ্রন্থের কথা বলিতেছি, তাহা পাঁচখানি। (১) মহাভারত, (২) ভাগবত, (৩) বিষ্ণুপুরাণ, (৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৫) হরিবংশ। এই পাঁচখানিতে কৃষ্ণকে কি ভাবে দেখান হইয়াছে এবং তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই লিখিব।

এই পাঁচখানির মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেন মহাভারতকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিতেছি, তাহা

সবিস্তারে বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ বড় বাড়িয়া যাইবে, এবং বড় কটমটও হইয়া উঠিবে। এখন ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভাগবতেই আছে যে, উহা মহাভারতের পরে রচিত হইয়াছিল এবং মহাভারতের অসম্পূর্ণতা বশতঃই নারদের উপদেশমতে রচিত হয়। আর হরিবংশ সম্বন্ধে আর কিছু বলা যাউক না যাউক, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হরিবংশ মহাভারতের উত্তরখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তরখণ্ড পূর্ব্বখণ্ডের যে পরবর্ত্তী, সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব আমি মহাভারতের কৃষ্ণেরই পরিচয় দিব। মহাভারতে কৃষ্ণের যে জীবনী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে যাহা নাই, অথচ পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ; অনেক স্থলে কাব্যের ভূষণোপযোগী কবি-কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

আবার কৃষ্ণের মহাভারতীয় চরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইবার আগে একটা কথার মীমাংসা করিতে হয়। মহাভারতের অপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থে কি কৃষ্ণের কোন প্রসঙ্গ নাই? থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষভাগে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদ তৎপূর্ব্বেই প্রণীত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল ইহাই সম্ভব। সুতরাং বেদে তাঁহার কোন প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে, অথচ কথাটা এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করা যায় না। কথাটা এই :—

"তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা,

উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপাদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"
ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসা-শূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি (কথা) অবলম্বন করিবে "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

ইহাতে কেবল দুইটি কথা পাইলাম। (১) কৃষ্ণ দেবকী-পুত্র। ইহাতেই বুঝা গেল যে, অন্য কোন কৃষ্ণের কথা হইতেছে না। (২) কৃষ্ণ ঘোরের নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবত্বসূচক কোন কথা নাই। তবে একটা বড় লাভ হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ যে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। এ কথার প্রমাণও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থান এ নহে। কথাটা এই যে, যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইল, আর তাহাতে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ থাকিল, তবে ইহা নিশ্চিত যে, কৃষ্ণ মহাভারতের কবির কল্পনা-প্রসূতমাত্র নহেন, দেবকী-প্রসূত বটেন।

মহাভারতেও যে ভাবে আমরা কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তাহাতেও বুঝা যায় যে, কৃষ্ণ জনসমাজে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত। দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে তিনি প্রথম দেখা দেন; মহাভারতের পাঠকের সঙ্গে এই তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। তৎপূর্ব্বে মহা-ভারতে তাঁহার কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। কেবল আদি-বংশাংবতরণিকা পর্ব্বাধ্যায়ের ৬৩ অধ্যায়ে এক কথায় লেখা আছে যে, তিনি দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার যথেষ্ট

কারণ আছে। অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ম্বরে আসিয়াছিলেন। মহাভারতকার তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচয় কিছু মাত্র না দিয়া একেবারে বলিতেছেন,

"বলভদ্র, জনার্দ্দন,* বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায়, সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চ পাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির ভীম ও নকুল সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন" ইত্যাদি।

এই প্রথম কৃষ্ণের কথা। ইহাতে কি বুঝায় না যে, কৃষ্ণকে সবাই জানে, তাঁহার কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই? এই সকল আলোচনা করিয়া স্থির করিতে হয় যে, মহাভারত প্রণয়নের পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণ জনসমাজে সুপরিচিত ছিলেন; তিনি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক হইলেই ঈশ্বরের অবতার হইলেন, এমন কথা বলিতেছি না। তবে এমন অনেক লোক আছেন যে, তাঁহারা স্বীকার করেন না যে, আমরা এক্ষণে যাঁহাকে কৃষ্ণ বলি, তিনি কখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, কৃষ্ণ কেবল কবিরই কল্পনা। সে কথাটা ভুল, এতটুকু বুঝা গেল।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার কোন বর্ণনা নাই। দেখা গেল, যখন তাঁহাকে দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে প্রথম দেখিলাম, যদুবংশের নেতৃস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন, তখন মহাভারতে

* "জনার্দ্দন" শব্দটি হয় "বলভদ্রের" বিশেষণ, নয় কোন লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ অন্য নামের স্থানে আদিষ্ট হইয়াছে। নহিলে, "কৃষ্ণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইলেন", এ কথার অর্থ হয় না।

বাল্যবৃত্তান্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ব্রজলীলা, গোকুল, বৃন্দাবন, কংসবধ, মথুরা-জয় প্রভৃতির কোন কথা নাই। কেবল যেখানে সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পরিচয় দিতেছেন, সেইখানে কংসবধের ও মথুরার সামান্য প্রসঙ্গ আছে। ব্রজলীলার কোন কথাই নাই।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কৃষ্ণের এই আদিম জীবনী মধ্যে যাহার প্রমাণ না পাইব, তাহা অসত্য ও পরবর্ত্তী কবিদের কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে কৃষ্ণের বাল্যকালে নন্দগোপের আলয়ে প্রতিপালিত হইবার কথা সব মিথ্যা নহে। মহাভারতে সে বৃত্তান্ত বর্ণিত না হউক, মহাভারতে তাহার প্রমাণ আছে। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণকালে কৃষ্ণকে যে সকল স্তুতিবাক্যে আহূত করেন, তন্মধ্যে ব্রজনাথ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। সমগ্র মহাভারতে সবে এই একবার ব্রজ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। আর বনপর্ব্বে এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে যেখানে শিশুপাল ভীষ্মকে কৃষ্ণার্চ্চনার জন্য ভৎর্সনা করিতেছেন, সেইখানে অনেকগুলি কথা পাওয়া যায়। ভীষ্মকে শিশুপাল বলিতেছেন,—

"যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের* প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম্ম? না বল্মীকপিণ্ড মাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর?

* গোপাল অর্থে গোয়ালা।

এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই কি বিস্মিত হইয়াছ?"

আর এক স্থানে শিশুপাল ভীষ্মকে বলিতেছেন, "এই বাসুদেবের পূতনাঘাত প্রভৃতি ক্রিয়া সকল কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে।"

এই কয়টি কথা ভিন্ন মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। যে ভাবে কথাগুলি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে এমন বুঝায় না যে, এই বাল্যলীলার কথা মহাভারতের কবির স্বকপোলরচিত। তাঁহার স্বকল্পনা হইলে তিনি ইহা সালঙ্কারে এবং যে ভাবে বলিলে কৃষ্ণের মহিমা বৃদ্ধি হয়, সেই ভাবে বলিতেন। আর কথাগুলাও আমরা তাহা হইলে সবিস্তারে শুনিতে পাইতাম। সে সকল কিছুই হয় নাই। কেবল শত্রুর গালির ভিতর ইহার অতি সংক্ষেপ প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইতেছি। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, মহাভারতের কবি আপনার কাব্যের সম্পূর্ণতা জন্য যদিও কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা আবশ্যকীয় বোধ করেন নাই, তথাপি সেই বাল্যলীলার কিম্বদন্তী পূর্ব্ব হইতে ছিল এবং কিম্বদন্তী ছিল বলিয়াই শিশুপালের তিরস্কার বাক্যে তাহার প্রসঙ্গ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাও প্রমাণ করে যে, কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কবিকল্পিত কাব্যের নায়কমাত্র নহেন। ভাগবতকার সেই কিম্বদন্তীগুলি লইয়া সম্প্রসারণ পূর্ব্বক সালঙ্কারে বর্ণিত করিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু আসল কথাটা পাঠককে বলিতেছি, মনোযোগ

করুন। এই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতে ব্রজগোপী বা রাধিকার কোন প্রসঙ্গ কোথাও নাই। নামমাত্র নাই। ইঙ্গিতমাত্র নাই। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত করিতে হয়? এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রজগোপীর কথা সব অমূলক, সব মিথ্যা, সব পরবর্ত্তী পুরাণকারদিগের কাব্যকল্পনা মাত্র। যদি কৃষ্ণচরিত্রের এমন কদর্য্য পরিচয়ের কিম্বদন্তী মহাভারত প্রণয়নকালে ঘুণাক্ষরেও প্রচলিত থাকিত, তবে শিশুপালের তিরস্কার বাক্যে তাহা অবশ্য সন্নিবেশিত হইত। শিশুপাল কৃষ্ণের যতগুলি দোষ দেখাইয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি গুরুতর হইত। যদি ইহার কিছুমাত্র প্রবাদ প্রচলিত থাকিত, অদ্বিতীয় কাব্যকুশল মহাভারতের কবি কখনই তাহা ছাড়িতেন না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজগোপীর কথা একেবারে অমূলক। পরম পবিত্র কৃষ্ণচরিত্র এ দোষে দুষ্ট নহে।

তবে কথাটা আসিল কোথা হইতে? ভাগবতকার ইহা প্রথম প্রচার করিয়াছেন। আবার রহস্যের কথা এই যে, ভাগবতকার সাধারণতঃ ব্রজগোপীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাগবতে রাধিকার নাম গন্ধও নাই; সে আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকারের সৃষ্টি।

এখন এই বহুতত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ কবি ও দার্শনিকেরা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এমন কদর্য্য কথার সৃষ্টি করিলেন কেন? কথাটা অনেকবার বুঝান হইয়াছে। বুঝিলে কথাটা আদৌ কদর্য্য নয়। কুমার-সম্ভবের উমা যা, এই রাধাও তাই। ঈশ্বরানুসারিণী ঈশ্বরময়ী ঐশিক সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধা বহিঃপ্রকৃতি। ঈশ্বর জগতে এবং জগৎ ঈশ্বরে। প্রতি জড়পিণ্ডের প্রতি পরমাণুতে ঈশ্বর আছেন।

এবং প্রতি জড়পিণ্ডের প্রতি পরমাণু ঈশ্বরে আছে। ঈশ্বর জগতে রত, জগত ঈশ্বরে রত। রম+ক্ত=রত। তাই কৃষ্ণ রাধারমণ।* এই রাধা জগৎ। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন। জগদীশ্বর বলিলে যাহা বুঝায়, রাধানাথ বলিলে তাহাই বুঝায়। তবে রাধানাথের ভিতর একটা অনন্ত পবিত্র অনির্ব্বচনীয় প্রেম আছে, যাহা শুধু জগদীশ্বরে বুঝায় না। ঈদৃশ রাধাবল্লভকে আমরা প্রণাম করি। এ রাধাবল্লভকে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকলেই প্রণাম করিতে পারে। এ রাধাকৃষ্ণের উপাসনার সঙ্গে পৌত্তলিকতার কোন সম্বন্ধই নাই। এ উপাসনার পুত্তল জগৎ আর জগতের অন্তরাত্মা। সে দুই পুত্তল সকলের সমক্ষেই বর্ত্তমান আছে। তবে যে তুলসী চন্দন দিবার জন্য পাদপদ্ম খুঁজিয়া না পায়, সে পুত্তল গড়ুক—আপত্তি করিয়া কাজ নাই।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরোপাসনা।

(সাকার ও নিরাকার)

[৭২ পৃষ্ঠার পর]

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? এ সম্বন্ধে সকল আস্তিকই স্বীকার করেন যে, তিনি নিরাকার। সুতরাং কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞান করিলে, ঈশ্বরের মহিমার খর্ব্ব করা হয়।

---

* রাধন, সাধনে প্রাপ্তৌ তোষে পূজনে। যিনি ঈশ্বর সাধিকা, ঈশ্বরপ্রাপ্তা, ঈশ্বরে তুষ্টা, ঈশ্বরপূজাকারিণী, তিনিই রাধা বা রাধিকা।

শুধু তাহাই কেন, উপাসক ভ্রান্ত পথের পথিক হন। যদি আমি কালী-রূপকে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করি, তবে যখন কালী-রূপ অন্তরে অনুভব করিতে পারিব, তখনই আমি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়াছি এই বোধ হইবে। ঈশ্বরসম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা-জ্ঞান আর থাকিবে না, সুতরাং আমার আকাঙ্ক্ষা সেইখানেই শান্ত হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রকারগণ যখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া গিয়াছেন,তখন আমি যদি ঈশ্বরকে কালী-রূপাত্মক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, তবে আমি সত্যপথে যে বেশী অগ্রসর হইতে পারিলাম না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এরূপ সাকার উপাসনায় যে কোন ফল নাই, তাহা আমি বলি না। তবে এরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারা যায় না ইহা নিশ্চিত।

যদি কেহ স্ফটিককে হীরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং হীরক-লাভে চারি দিক্ অন্বেষণ করিতে থাকেন, তবে তিনি স্ফটিক পাইয়াই হীরক পাইয়াছি জ্ঞান করিবেন এবং উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই স্ফটিক তাঁহার অনেক উপ-কারে আসিতে পারে বটে,কিন্তু তিনি যথার্থ হীরকলাভে বঞ্চিত রহিলেন। কেবল সাকারকে কেন, কোন সগুণ পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকিব। ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি কেবল রূপের অতীত নহেন, তিনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি গুণ এবং ভক্তি দয়া আদি গুণেরও অতীত। ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলি না যে, আজ কাল যাঁহারা

নিরাকার উপাসক নামে খ্যাত, তাঁহারা সকলেই নিরাকারের উপাসনায় ঠিক পথে চলিতেছেন। ঈশ্বর নিরাকার দয়াময়, ইহা বিশ্বাস থাকাতে কোন কামনাসিদ্ধি জন্য সেই নিরাকারকে অতি ভক্তিভাবে ডাকিলেই ঈশ্বরোপাসনা হইল না। কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লালসা অন্তরে না থাকে, তবে কোন উপাসনাই ঈশ্বরোপাসনা নহে। ভক্তি-বৃত্তির চর্চ্চায় মানসিক উপকার যাহা হইবার সম্ভাবনা, এই উপাসক সেই উপকার পাইবেন। ফলে ইহার বেশী আর কিছুই হইবে না।

তবে যখন ইহা বুঝিব, নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভজন্য আমাদের ভক্তি আদি মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে কোন সাকার অবলম্বন ব্যতীত সেই সকল বৃত্তি স্ফুরণের চেষ্টা করি, তখন তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতিভেদে দুই প্রকার নামে বিভক্ত। যখন সেই ঈশ্বরকে নিরাকার জানিয়া তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞানজন্য কোন সাকার চিন্তারূপ পথ অবলম্বন করা যায়, তখন তাহাকে সাকার উপাসনা বলে এবং যখন কোন সাকার চিন্তাব্যতিরেকে ঈশ্বরোপাসনা করা হয়, তখন তাহাকে নিরাকার উপাসনা বলে। আমরা এই প্রবন্ধে যে সাকার বা নিরা-কার উপাসনার দোষ গুণ বিচার করিব, তাহা এই উপরি-উক্ত অর্থে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে।

সাকার-উপাসনা-পদ্ধতি হিন্দু-শাস্ত্র-বিহিত। হিন্দুশাস্ত্র-কারগণ বলেন যে, যত দিন আমরা মায়ার অধীন থাকিব,

যত দিন ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তত দিন নির্গুণ ঈশ্বরসম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে সক্ষম নহি; কেন না ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না। সেই জন্য নির্গুণ ঈশ্বরের সগুণ উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন রূপ উপাসনা হইতে পারে না। আজকালকার নিরাকার-উপাসকগণ যে সগুণ উপাসক, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাকার-উপাসক রূপের সাহায্যে ভক্তিভাব উদ্রেক করেন। নিরাকার-উপাসক না হয় কতকগুলি স্তোত্র গান দ্বারা তাঁহাদের ভক্তি-ভাব উত্তেজিত করেন। রূপ ও শব্দ দুইই বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়। একটি দর্শনেন্দ্রিয়ের অপরটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের। প্রভেদ ত এই। তবে নিরাকার-উপাসক দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপের সাহায্য লইয়া উপাসনা করিতে এত পরাঙ্মুখ কেন?

ইহার এক কারণ আছে। হিন্দুসমাজের আজকালকার অবস্থা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। সাকার উপাসনা দ্বারা নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় সমাজের অবনতির সহিত সাধারণ জনের সাকার পদার্থকেই ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহা প্রার্থনীয় নহে। এই জন্য ধর্ম্মসংস্কারকগণের মধ্যে মধ্যে ইহা উপদেশ দিতে হইয়াছে যে, উপাসনার জন্য যদিও রূপাদি ধ্যান করিতে হয়, কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর নিরাকার। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। কিন্তু আমি যাহাকে সাকারোপাসনা বলিতেছি, তাহা যে নিন্দনীয়, তাহা কেহ বলিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। সাকারকে ঈশ্বর

জ্ঞান করিবে না ইত্যাদি উপদেশের ফল আবার দাঁড়াইয়াছে যে, একেবারে সাকার কথাতেই অশ্রদ্ধা। উপাসনা কালে সাকার চিন্তা করা আর উপাসনা-ভ্রষ্ট করা, অনেকের কাছে একই কথা দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক গোঁড়ামী সকল সময়ই খারাপ। গোঁড়ামী থাকিলে বিচার শক্তির দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। আজকালকার নিরাকার-উপাসক গোঁড়ামী ছাড়িয়া যদি একবার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি কর্ণেন্দ্রিয় সাহায্যে ঈশ্বরের যে উপাসনা করেন, তাহা সাকার-উপাসকের রূপ শব্দাদির সাহায্যে সেই নির্গুণ কারণের উপাসনা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। উভয়েরই উপাসনা স্থূল উপাসনা। উভয়েই স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপাসনায় রত।

তবে যদি কেহ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে উপাসনা করেন, তিনি স্থূল উপাসক অপেক্ষা বেশী অগ্রগামী হইয়াছেন, ইহা আমি স্বীকার করি।

আমার বিবেচনায় উপাসনার পদ্ধতি স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম ভেদে তিন নামে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্থূল, শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত যিনি উপাসনা করিতে পারেন না, তিনি স্থূল উপাসক। স্থূল শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীরস্থ এবং কারণ শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপাসনা সূক্ষ্ম উপাসনা। এবং যিনি কেবলমাত্র কারণ শরীর অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারই উপাসনা অতি সূক্ষ্ম। আর যে উপাসক নিজের আত্মার সহিত উপাস্য আত্মার যোগ করিয়া আছেন, তিনি মায়াপাশ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন।

উপাসনা পদ্ধতি আচার সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণভেদে তিন প্রকার। আবার বিচার-শক্তি, প্রেম, ইচ্ছাশক্তি অন্তঃকরণের এই তিন প্রকার বৃত্তিভেদে জ্ঞানপ্রধান, ভক্তিপ্রধান এবং কর্ম্মপ্রধান এই তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। এই সব বিষয় পরবারে বলিব।

কৃঃ মুঃ

দেশেলাইএর স্তব।

নমামি বিলাতি অগ্নি—দেশেলাইরূপী,
চাঁচাছোলা দেহখানি, শিরে কালো টুপি!
যেন বা ডিপুটী খাঁটি একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বিঁড়ে—রাগে প্রাণভরা!

নমামি গন্ধকগন্ধ—মাথাটী গোলালো,
সর্ব্বজাতি-প্রিয়দেব, গৃহ কর আলো!
শান্ত সভ্য অতি ধীর শুয়ে যতক্ষণ,
গা ঘেঁষিলে চটে লাল্—গৌরাঙ্গ যেমন!

নমামি সর্ব্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্য্যবিঘ্ন-বিনাশন, শ্যালক টীকার!
নিদ্রিতের গুপ্তচর, রাঁধুনীর প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিরে পীঠস্থান!

নমামি খদ্যোৎশিখা তিমির-হরণ,
লালেতে নীলের আভা দিব্য দরশন!
পোয়াতির প্রিয়বঁধু, তরুণীর অরি,
বিরাজ, রে দিয়াকাটি, কত রূপ ধরি!

প্রণমামি অগ্নিশিখ শুভ্র দেশেলাই,
সাহেব গোলাম তব, সাবাস্ বাদসাই!
সোণা টীন্ রূপা তামা বাঁধা তব গায়,
লাটের পকেটে ফেরো, লেডির ঝাঁপায়!

নমামি অদম্যতেজ বরষা-দমন,
আঁচড়ে কিরণধর সখের দহন!
আধা জলে বিনা ফুঁয়ে বিনা চখে জল,
দিয়াকাটি, তোর প্রেমে মাগীরা পাগল!

উনিশ শতাব্দী সূর্য্য কাষ্ঠের চকমকি,
তোমার চমকে বিশ্বকর্ম্মা গেছে ঠকি!
বন, জল, বিল, খাল, যেথা সেথা যাই,
শিরে ভাঁটা শাদাকাটি দেখি সেই ঠাঁই!

নমামি ভাস্কররূপী দারু-দেশেলাই,
কড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে ঘরে তারা পাই!
পয়সা যোড়া বাক্স-বাঁধা ক্ষুদ্র প্রভাকর
ঘরে ঘরে আলো করে ধরণী উপর!

নমামি নমামি দেব স-অগ্নি ইন্ধন,
তোমার প্রসাদে হয় সাগরে রন্ধন!

সভ্য জগতের তুমি সোহাগের বাতি,
চুরুট ভক্তের মোক্ষ পদার্থ বিলাতি!

নমামি ফর্‌ফরশব্দ "ফস্ফর"-বেষ্টন,
ধনি-মানি-জ্ঞানি-বন্ধু, কাঙ্গালের ধন!
সন্ধ্যার সোণার কাটি, জোছনার ছবি,
সাবাস্ বিলাতি বুদ্ধি বাক্সে বাঁধা রবি!

নমামি কিরণদণ্ড কোপনস্বভাব,
রাজগৃহ খড়োঘরে সমান প্রভাব!
সিন্ধুজলে, পথে, ঘাঠে, গাড়ী, ঘোঁড়া, রেলে,
সকলে তোমায় খোঁজে সূর্য্যশশী ফেলে!

ভিকারী কুটীরে সুখী, ভীরুতে সাহসী,
তোমা পেয়ে খঞ্জ খাড়া, প্রাচীনা ষোড়শী!
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি মানবতারণ,
দিয়াকাটি, তোর গুণ কে করে কীর্ত্তন!

নমামি কলির দেব আগুনের শলা!
নমামি সুখর্ব্বদেহ খড়্‌কে মোমে গলা!
নমামি অনলযষ্টি অবনী-বিহারী,
দেশেলাই, প্রণমামি অন্ধকারহারী!
তোর গুণে, দিয়াকাটি, মুগ্ধ জগজ্জন,
প্রণমামি দেশেলাই দেবের ইন্ধন!

সীতারাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক খুব বড ফর্দা জায়গায়, নগরের বাহিরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। বন্দী সেখানে আসিবার আগেই লোক আসিতে আরম্ভ হইল। অতি প্রত্যুষে,—তখনও গাছের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় নাই—অন্ধকারের আশ্রয় হইতে নক্ষত্র সব সরিয়া যায় নাই, এমন সময়ে দলে দলে পালে পালে জীবন্ত মানুষের কবর দেখিতে লোক আসিতে লাগিল। একটা মানুষ মরা, জীবন্তের পক্ষে, একটা পর্ব্বাহের সমান। যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাঠ প্রায় পূরিয়া গিয়াছে, অথচ নগরের সকল গলি, পথ, রাস্তা হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর মত মনুষ্য বাহির হইতেছে। শেষ সে বিস্তৃত স্থানেও স্থানাভাব হইয়া উঠিল। দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনুমানের মত আসীন—যেন লাঙ্গূলাভাবে কিঞ্চিৎ বিরস;—কোথাও বাদুড়ের মত দুল্যমান, দিনোদয়ে যেন কিঞ্চিৎ সরস। পশ্চাতে, নগরের যে কয়টা কোটাবাড়ী দেখা যাইতেছিল, তাহার ছাদ মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, আর স্থান নাই। কাঁচা ঘরই বেশী,—তাহাতেও মই লাগাইয়া, মইয়ে পা রাখিয়া, অনেকে চালে বসিয়া দেখিতেছে। মাঠের ভিতর কেবল কালো মাথার সমুদ্র—ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কেবল মানুষ আসিতেছে, ঠেসিতেছে, জমাট বাঁধিতেছে, সরিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আবার মিশিতেছে। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া,

দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি মারামারি আরম্ভ করিল। হিন্দু মুসলমানকে গালি দিতে লাগিল, মুসলমান হিন্দুকে গালি দিতে লাগিল। কেহ বলে, "আল্লা!" কেহ বলে, "হরিবোল!" কেহ বলে, "আজ হবে না ফিরে যাই।" কেহ বলে, "ঐ এয়েছে, চেয়ে দেখ্।" যাহারা বৃক্ষারূঢ়, তাহারা কার্য্যাভাবে গাছের পাতা, ফুল, ফল এবং ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিম্নচারীদিগের মাথার উপর ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, যেখানে যেখানে বৃক্ষ, সেইখানে সেইখানে তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ কোন গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র উপদ্বীপের মত তাহা প্রায় জনশূন্য। দুই চারি জন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় যোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া কেবল এক জন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখ মুখ ফুলিয়াছে; বেশভূষা বড় আলুথালু—যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কিন্তু এখন আর কাঁদিতেছে না। যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে,

"ঠাকুর! এখনও কিছু দেখা যায় না!"

বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি উপর হইতে বলিল,

"না।"

"তবে বোধ হয়, নারায়ণ রক্ষা করিলেন।"

পাঠক চিনিয়া থাকিবেন, যে এই স্ত্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরে, স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। বৃক্ষশাখা ঠিক তাঁর উপযুক্ত স্থান নহে, কিন্তু তর্কালঙ্কার মনে করিতেছিলেন, "আমি ধর্ম্মাচরণ-নিযুক্ত, ধর্ম্মের জন্য সকলই কর্ত্তব্য।" তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যে পথে শ্রীকে নগর হইতে প্রান্তরে আসিতে হইবে, সেই পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্রীকে দেখিয়া, উপযাচক হইয়া তাহার সহায় হইয়াছিলেন। শ্রী তাঁহাকে চিনিত, তিনিও শ্রীকে চিনিতেন। সে পরিচয়ের কারণ পরে জানা যাইতে পারে।

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, "নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমার সে ভরসা আছে। তুমি উতলা হইও না। কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় হয় নাই বোধ হইতেছে। কতকগুলা লালপাগড়ি আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি।"

শ্রী। কিসের লাল পাগড়ি?

চন্দ্রচূড়। বোধ হয়, ফৌজদারি সিপাহী।

বাস্তবিক দুই শত ফৌজদারি সিপাহী সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া, সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেমন যেমন দেখিতে লাগিলেন, চন্দ্রচূড় সেইরূপ শ্রীকে বলিতে লাগিলেন। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল,

"কত সিপাহি ?"

চন্দ্র। দুই শত হইবে।

শ্রী। আমরা দীন দুঃখী—নিঃসহায়। আমাদের মারিবার জন্য এত সিপাহী কেন ?

চন্দ্র। বোধ হয়, বহুলোকের সমাগম হইয়াছে শুনিয়া, সতর্ক হইয়া ফৌজদার এত সিপাহী পাঠাইয়াছেন।

শ্রী। তার পর কি হইতেছে ?

চন্দ্র। সিপাহীরা আসিয়া, শ্রেণী বাঁধিয়া, প্রস্তুত কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজি, আর সেই ফকির।

শ্রী। দাদা কি করিতেছেন ?

চন্দ্র। পাপিষ্ঠেরা তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়াছে।

শ্রী। কাঁদিতেছেন কি ?

চন্দ্র। না। নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ। মূর্ত্তি বড় গম্ভীর, বড় সুন্দর।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না ? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। দেখিবার সুবিধা আছে। তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার ?

শ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠিতে জানি না।

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সময়, মা ?

শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি সরল ডাল ছিল। সে ডালটি উঁচু হইয়া উঠিয়া না গিয়া, সোজা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। হাত খানিক গিয়া, ঐ ডাল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই দুই ডালের উপর দুইটি পা দিয়া, নিকটস্থ আর

একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার বড় সুবিধা। চন্দ্রচূড় শ্রীকে ইহা দেখাইয়া দিলেন। শ্রী, লজ্জাত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

প্রথম দুই একবার চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। তার পর, কি কৌশলে কে জানে, শ্রী ত জানে না—সে সেই নিম্ন ডালে উঠিয়া, সেই যোড়া ডালে যুগলচরণ রাখিয়া, আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইল।

তাতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে শ্রী দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে সম্মুখদিকে পাতার আবরণ ছিল না—শ্রী সেই অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়া রূপবতী, বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশি মধ্যে বিরাজ করিতেছে; প্রতিমার ঠাটের মত, চারিদিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে; চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না, এ মূর্ত্তিমতী বনদেবী কিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া, নিকটস্থ জনতা বাত্যাতাড়িত-সাগরবৎ, সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। আপনার অবস্থার প্রতি তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। অনিমিক্-লোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল-ধারা পড়িতেছিল। এমন সময়ে শাখান্তর হইতে চন্দ্রচূড় ডাকিয়া বলিলেন, "এদিকে দেখ! এদিকে দেখ! ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে?"

শ্রী, দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে। যোদ্ধৃ-বেশ, অথচ নিরস্ত্র। অশ্বিনী বড় তেজস্বিনী, কিন্তু লোকের ভিড় ঠেলিয়া আগুইতে পারিতেছে না; অশ্বিনী নাচিতেছে, দুলিতেছে, গ্রীবা বাঁকাইতেছে, কিন্তু তবু বড় আগু হইতে পারিতেছে না। শ্রী চিনিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম।

এদিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিবৃত্ত হইল। শাহসাহেব বলিলেন,

"কিয়া দেখ্‌তে হো! কাফেরকো মাট্টী দেও।"

কাজি সাহেব ভাবিলেন। কাজি সাহেবের সে সময়ে সেখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা শুনিয়া শক করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই কর্ত্তা। তিনি বলিলেন,

"সীতারাম যখন বারণ করিতেছে, তখন কিছু কারণ আছে। সীতারাম আসা পর্য্যন্ত বিলম্ব কর।"

শাহ সাহেব অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অগত্যা সীতারাম পৌঁছান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। গঙ্গারামের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

সীতারাম কাজি সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রণতমস্তকে শাহ সাহেবকে বিনয় পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজি সাহেবকে তদ্রূপ করিলেন। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেমন, রায় সাহেব! আপনার মেজাজ সরীফ্!"

সীতারাম। অলহম্-দল্-ইল্লা। মেজাজে মবারকের সম্বাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

কাজি। খোদা নফরকে যেমন রাখিয়াছেন। এখন এই উমর, বাল সর্ফেদ, কাজা পৌঁছিলেই হয়। দৌলত খানার কুশল সম্বাদ ত?

সীতা। হুজুরের একবালে গরিব খানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?

কাজি। এখন এখানে কি মনে করিয়া?

সীতা। এই গঙ্গারাম—বদবখত্—বেতমিজ, যাই হৌক আমার স্বজাতি। তাই দুঃখে পড়িয়া হুজুরে হাজির হইয়াছি, জান বখ্‌শিশ্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি। সে কি? তাও কি হয়?

সীতা। মেহেরবান ও কদরদান সব পারে।

কাজি। খোদা মালেক। আমা হইতে এ বিষয়ের কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরমানা দিবে। জান বখ্‌শিশ্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি সাহেব, ফকিরের মুখ পানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িল। কাজি বলিলেন,

"সে সব কিছু হইবে না। কবরমে কাফেরকো ডারো।"

সীতা। দুই হাজার আসরফি দিব। আমি যোড় হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির।

কাজি ফকিরের মুখ পানে চাহিল, ফকির নিষেধ করিল, সে কথাও উড়িয়া গেল। শেষ সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিল। তাও না। পাঁচ হাজার; তাও না। আট হাজার—দশ হাজার, তাও না। সীতারামের আর নাই।

শেষ সীতারাম জানু পাতিয়া, করযোড় করিয়া, অতি কাতর স্বরে বলিলেন,

"আমার আর নাই। তবে, আর অন্য যা কিছু আছে, তাও দিতেছি। আমার তালুক মুলুক, জমা জেওরাত, বিষয় আশয়, সর্ব্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ও তোমার এমন কে, যে উহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেছ?"

সীতা। ও আমার যেই হৌক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্ব্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম।

কাজি। হিন্দুর ধর্ম্ম যাহাই হৌক, মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার বড়। এ ব্যক্তি মুসলমান ফকিরের অপমান করিয়াছে, উহার প্রাণ লইব—তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার আর অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম, জানু পাতিয়া, কাজি সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাস্পগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,

"কাফেরের প্রাণ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইলে এ প্রায়শ্চিত্ত হয় না? আমি এই কবরে নামিতেছি—আমাকে মাটী চাপা দিউন—আমি হরিনাম করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব—আমার প্রাণ লইয়া এই দুঃখীর প্রাণদান করুন। দোহাই তোমার, কাজি সাহেব! তোমার যে আল্লা আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর! ধর্ম্মাচরণ করিও। আমি প্রাণ দিতেছি—বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণদান কর।"

কথাটা নিকটস্থ হিন্দু দর্শকেরা শুনিতে পাইয়া হরিধ্বনি

দিয়া উঠিল। করতালি দিয়া বলিতে লাগিল, "ধন্য রায়জী! ধন্য রায় মহাশয়! জয় কাজিসাহেবকা! গরিবকে ছাড়িয়া দাও।"

যাহারা কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই, তাহারাও হরিধ্বনি শুনিয়া হরিধ্বনি দিতে লাগিল। তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। কাজি সাহেবও বিস্মিত হইয়া সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এ কি বলিতেছেন, রায় মহাশয়! এ আপনার কে যে, ইহার জন্য আপনার প্রাণ দিতে চাহিতেছেন?"

সীতা। এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়, কেন না এ আমার শরণাগত। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে। রাজা ঔশীনর, আপনার শরীরের সকল মাংস কাটিয়া দিয়া একটি পায়রাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আমাকে গ্রহণ করুন—ইহাকে ছাড়ুন।"

কাজি সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাইতেছে। নিলে সরকারি তহবিলের কিছু সুসার হইবে। দশ হাজার আসরফি লইয়া, এই হতভাগাকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা দুইটাকেই এক কবরে পুতি। আপনি কি বলেন?"

কাজি। তোবা! আমি তাহা পারিব না। সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই—বিশেষ এ ব্যক্তি মান্য, গণ্য ও সচ্চরিত্র। সে হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই, মনে জানিত যে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ সাহেবের সঙ্গে কাজি সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া, সে যোড়হাত করিয়া কাজি সাহেবকে বলিল,

"হুজুরের মর্জি মবারকে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু এ গরিবের প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুনিতে হয়। একের অপরাধে অন্যের প্রাণ লইবেন, এ কোন্ সরায় আছে? সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমার প্রাণদান দিবেন—আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা, স্বয়ং চন্দ্রচূড় ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। এক জন জমাদার শুনিয়া বলিল, "পাকৃড়ো উস্কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাকৃড়ান বড় শক্ত কথা। সে কাজ হইল না।

এদিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীবন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজি সাহেবকে বলিলেন,

"এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজি সাহেব সেই রূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামার সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারি বেড়ি হাতকড়ি সব তাহার জিম্মা, সেই উপলক্ষে সে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর কিছু

গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্ম্মকার মহাশয় চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিলেন।

তখন ফকির বলিল, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন্।"

শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ি পায়ে থাকিবে কি? সরকারি বেড়ি নোক্‌সান্ হইবে কেন? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া যায় না। আর বদমায়েসেরও এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি আর বেড়ি যোগাইতে পারিতেছি না।" শুনিয়া কাজিসাহেব বেড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ি খোলা হইল।

শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিল। তার পর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন; ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বিনী অশ্বিনী আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল।

যত ক্ষণে একবার বিদ্যুৎ চমকে, তত ক্ষণে এই কাজ সম্পন্ন হইল। দেখিয়া, সেই লোকারণ্য মধ্যে তুমুল হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। সিপাহীরা "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাতে একটা ভারী গোলযোগ উপস্থিত হইল। বেগবতী অশ্বিনীর সম্মুখ হইতে লোকে ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল, গঙ্গারাম পথ পাইতে লাগিল, কিন্তু সিপাহীরা পথ পাইল না। তাহাদের সম্মুখে লোক জমাট বাঁধিয়া দাঁড়া-

ইল। তখন তাহারা হাতিয়ার চালাইয়া পথ করিবার উদ্যোগ করিল।

সেই সময়ে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, কালান্তক যমের ন্যায় কতকগুলি বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষ, একে একে ভিড়ের ভিতর হইতে আসিয়া, সারি দিয়া তাহাদের সম্মুখে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও সিপাহী আসিল। দেখিয়া আরও ঢাল শড়কীওয়ালা হিন্দু আসিয়া তাহাদের পথ রোধ করিল। তখন দুই দলে ভারী দাঙ্গা উপস্থিত হইল।

দেখিয়া, সক্রোধে কাজি সাহেব সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এ কি ব্যাপার?"

সীতা। আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

কাজি। বুঝিতে পারিতেছ না? আমি বুঝিতে পারিতেছি, এ তোমারই খেলা।

সীতা। তাহা হইলে আপনার কাছে নিরস্ত্র হইয়া, মৃত্যু-ভিক্ষা চাহিতে আসিতাম না।

কাজি। আমি এখন তোমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিব। এ কবরে তোমাকেই পুঁতিব।

এই বলিয়া কাজি সাহেব কামারকে হুকুম দিলেন, "ইহা-রই হাতে পায়ে ঐ হাতকড়ি, বেড়ি লাগাও।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইলেন—ফৌজদার সাহেব যাহাতে আরও সিপাহী লইয়া স্বয়ং আইসেন, এমন প্রার্থনা জানায়। ফৌজদারের নিকট লোক গেল। কামার আসিয়া সীতারামকে ধরিল। সেই বৃক্ষারূঢ়া বনদেবী শ্রী তাহা দেখিল।

এদিকে গঙ্গারাম কষ্টে অথচ নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া লোকারণ্য

হইতে নিক্রান্ত হইলেন। কষ্টে, কেন না আসিতে আসিতে দেখিলেন যে, সেই জনতামধ্যে একটা ভারী গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কোলাহল ভয়ানক হইল, লোকসকল সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। তাঁহার অশ্ব এই সকলে অতিশয় ভীত হইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অশ্বারোহণের কৌশল গঙ্গারাম তেমন জানিতেন না; ঘোড়া সামলাইতেই তাঁহাকে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল যে, তিনি আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না যে, কোথায় কি হইতেছে। কেবল "মার! মার!" একটা শব্দ কানে গেল।

লোকারণ্য হইতে কোন মতে নিক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া, এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিলেন, দেখিবেন, কি হইতেছে। দেখিলেন, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান—আর এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢাল শড়কীওয়ালা। হিন্দুরা বাছা বাছা যোয়ান, আর সংখ্যাতে বেশী। মুসলমানেরা তাহাদিগের কাছে হটিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা "মার মার" শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

এই মার্ মার্ শব্দে আকাশ, প্রান্তর, কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে লড়াই করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, যে লড়াই না করিতেছে, সেও মার মার শব্দ করিতেছে। মার্ মার্ শব্দে হিন্দুরা, চারি দিক্ হইতে চারি দিকে ছুটিতেছে। আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিলেন, যাহারা এই মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন! চণ্ডীর হুকুম, মার্! মার্! জয় চণ্ডিকে!"

গঙ্গারাম ভাবিলেন, "এ কি এ?" তখন দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিলেন, মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডী মূর্ত্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"—অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে—দর্পিত পদভরে যুগল শাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমাময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে—যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার্! মার্! শত্রু মার!" শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে—"মার্—শত্রু মার্! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু—আমার শত্রু—মার! শত্রু মার!" উত্থিত বাহু, কি সুন্দর বাহু! স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণ কুন্তলের শোভা! সকল হিন্দু সেই দিকে চাহিতেছে, আর "জয়চণ্ডিকে!" বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যে যথার্থই বুঝি চণ্ডী অবতীর্ণা—তার পর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিলেন, শ্রী!

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। অল্পকালমধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিলেন, এক জন ভারী লম্বা যোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল।

আরও দেখিলেন, পশ্চাৎ আর এক জন শড়কীওয়ালা সাহ সাহেবের কাটামুণ্ড, শড়কীতে বিঁধিয়া উঁচু করিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল। গঙ্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিলেন।

(ক্রমশঃ)

বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমম্।

"অগ্নিমীলে"। অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি কি রূপ তাহা বলা হইতেছে। "পুরোহিতং"। অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি হোম-কার্য্য সম্পন্ন করেন, এই জন্য অগ্নিকে পুরোহিত বলা হই-তেছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ পুরোহিত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা যদি একটুখানি ব্যঙ্গ মার্জ্জনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, আধুনিক পুরোহিতদিগের সঙ্গে অগ্নির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে; যজ্ঞীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার করেন।

"যজ্ঞস্য দেবং"। অগ্নি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি—দিব্ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। "যজ্ঞস্য দেবং" যিনি যজ্ঞে দীপ্যমান।

ঋত্বিজং। ঋত্বিক্ বলে যাজককে। তখনকার এক একটী

বৈদিক যজ্ঞে ষোল জন করিয়া ঋত্বিক্ প্রয়োজন হইত। চারি জন হোতা, চারি জন অধ্বর্য্যু, চারি জন উদ্গাতা, আর চারি জন ব্রহ্মা। যাহারা ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিত,তাহারা হোতা। যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকেরা অধ্বর্য্যু। আর যাঁহারা সামগান করেন, তাঁহারা উদ্গাতা। যাঁহারা কার্য্য-পরিদর্শক, তাঁহারা ব্রহ্মা।

হোতারং। হোতৃগণ ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন। অগ্নি হবিরাদি বহন করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, এই জন্য অগ্নি হোতা। "ঋত্বিজং হোতারং" সায়নাচার্য্য ইহার এই অর্থ করেন যে, অগ্নি ঋত্বিকের মধ্যে হোতা।

রত্নধাতমম্। ধাতমম্ ধারয়িতারম্। যিনি রত্ন দান করেন, তিনি রত্নধাতম। অগ্নি যজ্ঞফলরূপ রত্ন প্রদান করেন, এই নিমিত্ত অগ্নি রত্নধাতম।

এই একটী ঋক্ সবিস্তারে বুঝাইলাম। এই সূক্তে এমন নয়টী ঋক্ আছে। অবশিষ্ট আটটী এইরূপ সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

"অগ্নি পূর্ব্বঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন। ২।

যাহা দিন দিন বাড়িতে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবত্তা আছে, সেই ধন অগ্নির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্নরহিত এবং তুমি যাহার সর্ব্বোতোভাবে রক্ষাকর্ত্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণের নিকট গমন করে। ৪।

যিনি আহ্বান-কর্ত্তা, যজ্ঞকুশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের

শ্রেষ্ঠ এবং সত্যস্বরূপ, সেই অগ্নিদেব দেবগণের সহিত আগমন করুন। ৫।

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর, হে অঙ্গির! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। ৬।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন রাত্রে ও দিবসে ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে সমীপস্থ হই। ৭।

তুমি যজ্ঞসকলের জ্বলন্ত রাজা, সত্যের জ্বলন্ত রক্ষাকর্ত্তা, এবং স্বগৃহে বর্দ্ধমান, (তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমরা তোমার সমীপস্থ হই)। ৮।

হে অগ্নে! পিতা যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও; মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের সন্নিহিত থাক।৯।*

---

* মূল এই সঙ্গে দিলাম। প্রথম ঋক্ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবান্ এহ বক্ষতি। ২।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমং। ৩।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪।

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ
দেবো দেবেভিরাগমৎ। ৫।

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ। ৬।

উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্ধিয়া বয়ম্
নমো ভরন্ত এমসি। ৭।

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপমৃতস্য দীদিবিং

অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য অতি দুরূহ কথা আছে; বুঝিবার চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল—তাও দ্বিজাতির পক্ষে। এজন্য আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম। লোকে বলে, একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিব। সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় সূক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন ঋকের দেবতা, বায়ু, ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু; শেষ তিনটি ঋকের দেবতা, মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে "মিত্রাবরুণৌ।" মিত্র কে তাহা পরে বলিব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নাম মাত্র নাই। আবার, আধুনিক হিন্দুর কাছে যে সকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নামমাত্রও বেদে পাওয়া যাইবে না।

তৃতীয় সূক্তের দেবতাও অনেকগুলি। ১—৩ ঋকের দেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বেদে তাঁহাদের নাম "অশ্বিনৌ"। ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র; ৭—৯ ঋকের দেবতা "বিশ্বেদেবাঃ।" আধু-

---

বর্দ্ধমানং স্বে দমে। ৮।
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে। ৯।

বাঙ্গলা অনুবাদ যাহা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ ঋক্ লেখকের; অন্য ঋক্গুলির অনুবাদ কোন বন্ধু হইতে উপহার প্রাপ্ত।

নিক হিন্দু ইহাদিগের নামও অনবগত। ১০—১২ ঋকের দেবতা সরস্বতী।

চতুর্থ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই অধিক। ৪ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুতেরাও আছেন। মরুতেরা বায়ু হইতে ভিন্ন। সে প্রভেদ পরে বুঝাইব।

দ্বাদশের আবার অগ্নিদেবতা। ইন্দ্রের পর ঋগ্বেদে অগ্নির স্তবই অধিক।

ত্রয়োদশ সূক্ত "আপ্রী" সূক্ত। আপ্রীসূক্তের বিনিয়োগ পশুযজ্ঞে। ঋগ্বেদে মোট দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। এই আপ্রী-সূক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সূক্তের ১২টি ঋকে অগ্নির দ্বাদশ মূর্ত্তির স্তব করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ সূক্তের অনেক দেবতা, যথা বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদ্গণ।

পঞ্চদশে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা। সায়নাচার্য্য বলেন, ঋতুরাই ইহার দেবতা। ষোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা। সপ্তদশে ইন্দ্র, বরুণ। অষ্টাদশের এক দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। তিনি কে? সে বড় গোলযোগের কথা। আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তদ্ভিন্ন দক্ষিণা ও সদাসস্পতি বা নারশংস বলিয়া এক দেবতা আছেন। ঊনবিংশ সূক্তের দেবতা অগ্নি, মরুৎ।

এক অধ্যায়ের দেবতার তালিকা দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই-লাম। বৈদিক দেবতা কাহারা, তাহা পাঠককে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে, সব দেবতার নাম আছে, অবশ্য এমত নহে। কিন্তু পাঠক দেখি-লেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার

পূজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক, গণেশ, ইহাঁরা কেহই নাই। আমরা ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুকে খুব মতে পাইব; আর শিবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপতিকে পাইব। লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগুলির বৈদিকত্বের ও মৌলিকত্বের ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাবি দাওয়া থাকে থাকুক, বেদ-কর্ত্তা ঋষিদিগের কাছে তাঁহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি?

বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে ত শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি, বেদে আছে, দেবতা মোটে তেত্রিশটী। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, ৩৪ সূক্তের, ১১ ঋকে ঋষি অশ্বীদিগকে বলিতেছেন, "তিন একাদশ (১১×৩=৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।" ১।৪৫।২ ঋকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "তেত্রিশটিকে লইয়া আইস" ঐরূপ ১।১৩৯।১১ ও ৩।৬।৯ ও ৮।২৮।১ ও ৮।৩০।২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।৪ ঋকে ঐরূপ আছে। কেবল ঋগ্বেদে নয়, শতপথব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটিমাত্র দেবতার কথা আছে।

এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাসুন্দরের ভাটের কথায় দেওয়াই উচিত—

"এক মে হাজার লাখ মেয় কহা বনায়কে।"

ঋগ্বেদের ৩।৯।৯ ঋকে আছে, "ত্রীণি শতা ত্রিসহস্রাণি অগ্নিন্ ত্রিংশচ্চ দেবাঃ নব চ অসপর্য্যন্।" তিন শত, তিন

সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা। তেত্রিশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ লাগে *।

তার পর জিজ্ঞাস্য এই তেত্রিশটি দেবতা কে কে? ঋগ্বেদে সে কথা নাই, থাকিবার কথাও নয়। তবে শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেণীবিভাগ এই রূপ। দ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসু। "আদিত্য" "রুদ্র" এবং "বসু" বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা জাতিবাচক মাত্র।

এই হইল একত্রিশ। তার পর এ ছাড়া "দ্যাবা পৃথিবী" এই দুটি লইয়া তেত্রিশটি। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে ধরিয়া ৩৩টি গণা হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উহাদিগের নাম নির্দ্দেশ আছে। যথা

আদিত্য। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।

রুদ্র। অজ, একপদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর।

বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস।

(ক্রমশঃ)

---

* তবু ঋষি ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই।

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকে শতগুণ, সহস্র গুণ, দশ গুণ ও তিন গুণ করিয়াছেন। লোকে কোটি গুণ করিয়াছে। এই "তিন" পাঠক ছাড়িবেন না। তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের চরমে পৌঁছিতে পারিবেন। সে কথা পরে হইবে।

ঈশ্বরোপাসনা।

(সাকার ও নিরাকার)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আগ্রহচিত্তে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার চেষ্টার নামই ঈশ্বরোপাসনা। কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার অভিলাষে কোন ভ্রান্ত-পথের পথিক হন, তবে তাঁহার উপাসনা কথনই প্রশংসনীয় নহে। যদি কেহ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্য তন্ত্রাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া কপালকুণ্ডলার কাপালিকের ন্যায় আচরণ অবলম্বনে উপাসনা করেন, তবে তিনি যে কত দূর ভ্রান্ত এবং তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি যে কতদূর নিন্দনীয়, তাহা বোধ হয়, বেশী বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক হিন্দু-সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতি প্রশংসনীয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঘৃণাজনক।

সুতরাং এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যায়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্ট ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মেরই অন্তস্তলে এক মাত্র সার কথা এই পাওয়া যায় যে, যাহাতে মানব-চিত্তের পূর্ণ স্ফুরণ হয় এবং সেই স্ফুরণজন্য পুরুষ নিত্য সুখ লাভ করিতে পারেন, তাহাই সেই নিত্য পদার্থ ঈশ্বরকে জানিবার একমাত্র পথ। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্যক্ বিকাশ না হইলে সঙ্গীত-মাহাত্ম্য বুঝা যায় না, সেইরূপ চিত্তের সম্যক্ বিকাশ না

হইলে সেই অনন্ত শক্তির যে সঙ্গীত লহরীতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে, সেই সঙ্গীত-মাহাত্ম্য কেহই বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না। এই জন্যই সকলকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিতে চাও, তবে যাহাতে মানব-চিত্তের সম্যক্ বিকাশ হয়, সেই চেষ্টা কর এবং ঐ চেষ্টা-কেই আমরা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি।

কোন এক জন ঋষি তাঁহার এক জন ইংরেজ শিষ্যকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "Live up to your highest ideal of true manhood." অর্থাৎ তুমি যাহাতে যথার্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ কল্পনা করিতে পার, সেই আদর্শা-নুযায়ী কার্য্য কর এবং আপনাকে সেই উন্নতাবস্থায় তুলিতে ক্রমাগত চেষ্টা কর। যিনি এই উপদেশ-বাক্য মত কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনিই ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

চিত্রবিদ্যা শিখিতে গেলে প্রথমে আমার কল্পনায় যাহা সুন্দর, চিত্রপটে সেই চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়; ক্রমে চিত্রবিদ্যায় যত নিপুণতা জন্মিতে থাকে, ততই পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিকতর সুন্দররূপ কল্পনা করিবার ক্ষমতা জন্মে; এবং সেই ক্ষমতা বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপ চিত্র পটে আঁকিতে চেষ্টা জন্মে। এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারাই যেমন যথার্থ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা হয়, চিত্তের স্ফুরণ রূপ বিদ্যা সম্বন্ধেও সেই রূপ। এই বিদ্যায় শিক্ষানবীশ মনুষ্যের যত দূর উন্নতাবস্থা কল্পনা করিতে পারেন, তত দূর উন্নত হইবার চেষ্টা করুন। এই রূপ চেষ্টা করিতে করিতে চিত্ত যখন কতক পরিমাণে মার্জ্জিত হইবে, তখন অধিকতর উন্নতাবস্থা কল্পনা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

এখন তিনি আপনাকে সেই অবস্থায় তুলিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা চিত্ত যতই ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ততই ঈশ্বরের জ্যোতিঃ চিত্তে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিবে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান ততই পরিষ্কার হইতে থাকিবে। ক্রমে যখন চিত্তের পূর্ণস্ফুরণাবস্থা জন্মিবে, তখনই যথার্থ ঈশ্বর কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমি এখন বৌদ্ধ হই আর তুমি এখন বৈষ্ণব হও, উন্নতাবস্থার চরম আদর্শ সম্বন্ধে এখন তোমাতে আমাতে প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যদি যথার্থ বৌদ্ধ হই, অর্থাৎ বুদ্ধচরিত্রানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা করি, আর তুমি যদি যথার্থ বৈষ্ণব হও, অর্থাৎ কৃষ্ণ-চরিত্রানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিতে থাক, তবে আমরা উভয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইব যে, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের আর বড় মতভেদ নাই। কেন না ঈশ্বরের বিমল জ্যোতিঃ নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনুষ্যের যে অবস্থা হয়, তাহাই মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত আদর্শ। সেই আদর্শ এক বই দুই হইতে পারে না। তবে মানবচিত্ত অজ্ঞান-মলায় বিভিন্নরূপ হওয়াতেই সেই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন লোকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়।

কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মেই এইরূপ একটি না একটি আদর্শ ধরিয়া চিত্ত মার্জ্জন করিবার শিক্ষা দিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শস্বরূপ, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের যিশু, বৌদ্ধগণের বুদ্ধদেব এবং শৈবগণের পক্ষে শিব, এইরূপ মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ। যদি কোন বৈষ্ণব প্রত্যহ কৃষ্ণপদে তুলসী চন্দন দেওয়াকেই বিষ্ণুপূজা জ্ঞান করেন, কিন্তু কৃষ্ণের উন্নত চিত্তানুযায়ী নিজের চিত্ত গঠিত করিতে

চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহার পূজায় কোন ফল নাই। আর যে খ্রীষ্টিয়ান প্রতি রবিবারে গির্জায় গিয়া গান করেন, কিন্তু যিশুর ন্যায় মহৎ হইবার চেষ্টা না করেন, তবে যিশু তাঁহাকে কিরূপে উদ্ধার করিবেন জানি না।

যাঁহাকে ভক্তি করা যায়, তাঁহাকেই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। যাহাকে ভালবাসি না, তাহার অনুকরণে মন যায় না। এই জন্যই সকল ধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে, কোন একটি উন্নত আদর্শে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া সেই আদর্শ সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা করিবে। এইরূপ আদর্শ-চিন্তাই সাধারণতঃ উপাসনা নামে খ্যাত।

সাকার-উপাসক হিন্দুগণের দেব দেবী এইরূপ এক একটি আদর্শ মাত্র। আর নিরাকার উপাসকের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বরও এইরূপ একটি আদর্শ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর হিন্দুদের কাছে একটি দেবতা-স্বরূপ। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং সগুণ উপাস্য আদর্শকে ঈশ্বর না বলিয়া দেবতা বলাই সঙ্গত।

বাস্তবিক হিন্দুরা সাকার বা সগুণ দেব দেবীকে কখনই আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল এবং অশরীরী। তবে সেই

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিনঃ।
উপাসনানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা॥"

এখন দেখ, সাকার উপাসক হিন্দু পৌত্তলিক, কি তুমি নিরাকার উপাসক খ্রীষ্টিয়ান্ পৌত্তলিক। হিন্দুরা আদিকারণে কখন কোন গুণ পর্য্যন্ত আরোপ করিতে চান না, কিন্তু তুমি খ্রীষ্টিয়ান্ অব্যক্ত অনাদি সেই কারণে সামান্য মনুষ্যের দয়া

দাক্ষিণ্যাদি গুণ আরোপ করিতে চাও। তুমি যখন ঈশ্বরে ঐরূপ দয়াদি গুণ আরোপ করিলে, তখন তুমি ঈশ্বরকে একটি সজীব পুত্তলস্বরূপ বলিলে না ত কি? যদি বল, সগুণ না ভাবিলে ত উপাসনা করা যায় না। আমিও তাই বলি যে, যাহা সগুণ নয়, তার বিষয় চিন্তা করা যায় না; আর সেই জন্যই হিন্দুরা দেব দেবীর কল্পনা করিয়া থাকেন; এবং সকল সময়েই স্মরণ রাখেন যে, তাঁহাদের উপাস্য দেবতার রূপ গুণাদি কেবল কল্পনা-কল্পিত মাত্র। যখন ঈশ্বরোপাসনার জন্য সকলকেই উন্নত অবস্থার একটি না একটি আদর্শ মনে মনে গড়িয়া সেই বিষয় চিন্তা করিতে হইল, তবে সেই আদর্শের রূপ-কল্পনায় কোন উপকার আছে কি না?

উপাস্য দেবতার হাত আছে, পা আছে, মুখ আছে, চোক আছে ইত্যাদি ভাবিতে পারিলেই উপাস্য দেবের রূপ চিন্তা হয় না। যথার্থ রূপ কাহাকে বলে, তাহা দেখা যাউক।

কেবলমাত্র নাসাকর্ণাদির সমষ্টি লইয়াই মানুষের রূপ নহে। সমস্ত দেহ বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হইতে যে এক ছটা নির্গত হয়, যে ছটা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কোন বাক্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্তরে নানারূপ ভাবের উদ্রেক করে, তাহাই যথার্থ মানবের রূপ; অথবা রূপের সার ভাগ। যখন মাতা তাহার শিশুর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তখন কি সে তাহার মুখ চোক কান একটি একটি করিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হয়? শিশুর সেই হাসি হাসি মধুমাখা সেইটি যাহার নাম রূপ, তাহাই দেখিয়া মুগ্ধ হয়। মনুষ্যের অন্তরস্থ ভাবসমূহ প্রস্ফুটিত হইলেই তাহা বাহ্যশরীরে এক রকমে প্রকাশিত হয়। শান্ত পুরুষের শান্ত ভাব, মুখের শান্ত-শ্রী দেখিলে

বুঝা যায়। এইরূপ যাহাকে শ্রী বলে, তাহার নাম রূপ। যিনি যথার্থ উপাসক, তিনি ইষ্টদেবের রূপ ধ্যানকালে ইষ্টদেবের যে রূপ, যে শ্রী তাঁহাকে মোহিত করিয়াছে, সেই রূপ অন্তরে উদিত করিবার চেষ্টা করেন। এবং রূপ অন্তরে উদিত হইলে, সুন্দর ভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই অর্থে নারায়ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী শ্রী (লক্ষ্মী) কল্পিত হইয়াছে। নহিলে, সত্য সত্য তাঁহার একটা গৃহিণী নাই।

এরূপ রূপ-চিন্তার ফল কি? জননী যদি গর্ভাবস্থায় কোন সুন্দর রূপ অনবরত চিন্তা করেন, তবে গর্ভস্থ শিশু অনেকটা সেই রূপের অনুযায়ী হয়। প্রকৃতির যে নিয়মে এক জনের চিন্তা হেতু তাহার গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে, সেই নিয়মের বলে যে স্বয়ং সেই রূপ অহরহঃ চিন্তা করে, তাহার নিজের স্বভাবের কি কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইষ্টদেবের চিত্তের উন্নত ভাব অনুকরণের চেষ্টাই উপাসনা। যে ভাব সুন্দর (যাহা সুন্দর, তাহাই উন্নত) সেই ভাব অন্তরে ক্রমাগত উদিত করিবার চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ অবিরাম অভ্যাস দ্বারা মানব নিজে সেই সুন্দর ভাব-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। চিন্তা দ্বারা যে এই রূপ ফল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। হয় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে কিম্বা কোন রূপ ধ্যান কিম্বা কোন গন্ধ স্পর্শাদির অনুভব দ্বারা সাধারণ সকল উপাসকই তাঁহাদের আন্তরিক ভাব উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আজকাল যাঁহারা নিরাকার উপাসক বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যার্থ, অর্থাৎ শব্দের অর্থ মনোমধ্যে আলোচনা দ্বারা অন্তরে সুন্দর ভাব উদিত করিবার চেষ্টা

করেন, কিন্তু হিন্দু-উপাসক বাক্য, রূপ সঙ্গীত, গন্ধ ইত্যাদি সকলেরই সাহায্য লইতে হানি বোধ করেন না।

উপাসনার আসল প্রয়োজন অন্তরে সুন্দর ভাব উদিত করা। কিন্তু কেবলমাত্র বাক্যের সাহায্যে পূর্ণরূপে সেই ভাব উদিত হওয়া সম্ভব নয়। নিজের মনে যে ভাব উদিত হইয়াছে, সকল সময় তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; আর যে ভাব উদিত হয় নাই, বাক্য দ্বারা অন্তরে তাহা পূর্ণ রূপে উদিত করা অনেক সময় কত দূর অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু রূপের সাহায্যে পূর্ণ সুন্দর ভাব অন্তরে উদিত করিতে পারা যায়।

সে ভাব কি কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যায়? রূপে যে ভাব উদিত করিতে পারে, বা সঙ্গীতে যে ভাব উদিত করিতে পারে, বাক্য দ্বারা সেরূপ পূর্ণ-ভাব কথনও উদিত করিতে পারা সম্ভব নয়। অভিনীত নাটকে এবং কেবল পঠিত নাটকে যে তফাৎ, সাকার ও নিরাকার উপাসনায় সেই তফাৎ

রূপচিন্তা দ্বারা সুন্দরের, অর্থাৎ উন্নত-ভাবসম্পন্ন, জনের ভাবসমূহ অন্তরে পূর্ণরূপ বিকাশিত করিতে পারা যায়, ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু রূপ-চিন্তা কথাটা বড় সোজা কথা নয়. এটা যেন সকলের স্মরণ থাকে। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয় যাহাদের স্ফুরিত হয় নাই, সঙ্গীত দ্বারা তাহাদের আন্তরিক বৃত্তি স্ফুরিত হওয়া সম্ভব নয়, সেইরূপ যাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয় ভোঁতা, যাঁহারা রূপ-মাহাত্ম্য বুঝেন না, তাঁহারা রূপচিন্তা দ্বারা ইষ্টদেবের উপাসনা করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের নিরাকার উপাসনা ব্যতীত আর গতি নাই। কিন্তু

এরূপ নিরাকার উপাসক রূপোন্মত্ত সাকার উপাসক অপেক্ষা উন্নত না অবনত?

আর যিনি রূপ-মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন, যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় কিছু না কিছু স্ফুরিত, তাঁহাকে ইষ্টদেবের রূপ-কল্পনা করিতেই হইবে। আমি যাহাতে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহা রূপেই হউক বা শব্দেই হউক বা গন্ধেই হউক বা আন্তরিক গুণ সমূহেই হউক, সেই সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশিতে আমার উপাস্য দেবকে গড়িব, ইহা নিশ্চয়। কেন না যাহা সুন্দর, তাহাই উন্নত। যদি কেহ আমায় নিষেধ করেন যে, তোমার উপাস্য দেবের তুমি রূপ-কল্পনা করিও না, আর আমি যদি যথার্থ রূপের সৌন্দর্য্যগ্রাহী হই, তবে আমার মন আমাকে ভিতর হইতে বলিয়া দিবে যে, তুমি কাহারও কথা শুনিও না, তুমি যাহাতে সৌন্দর্য্য দেখ, তাহা লইয়া তোমার সুন্দরকে গঠিত কর।

উন্নতাবস্থার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা যখন বলিব, তখন দেখাইব যে, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় ভোঁতা করিয়া রাখা যথার্থ উন্নতাবস্থার লক্ষণ নহে। তবে এমন যদি কেহ থাকেন, যাঁহার দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সম্যক্ স্ফুরিত হইয়া অন্তরেন্দ্রিয়ে লয় পাইয়াছে, এরূপ জনের পক্ষে তাঁহার ইষ্টদেবের রূপ-কল্পনা নিষ্প্রয়োজনীয়। তিনিই সূক্ষ্ম উপাসক এবং তিনিই যথার্থ নিরাকার-উপাসক। এবং আজকালকার যে নিরাকার উপাসনা ধর্ম্ম-মন্দিরে দেখিতে পাই, তাহা উক্তরূপ নিরাকার উপাসনার ভেঙান মাত্র।

আমি যে সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া এত কথা বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই হিন্দু-

দের সাকার উপাসনার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইষ্ট-দেবের রূপ চিন্তা করা একটা মহাপাপ স্থির করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম-গুরু পাদরী মহাশয়গণের সংসর্গেই অনেকের ঐরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টিয়ানদের গির্জায় যিশুর ছবি পর্য্যন্ত রাখা নাকি নিষিদ্ধ। কি জানি যদি পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে, কি জানি যদি কেহ ভ্রমক্রমে যিশুর পবিত্র মূর্ত্তি একবার মনোমধ্যে ভাবিয়া ফেলে তবেই ত সর্ব্বনাশ। খ্রীষ্টিয়ানদের এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে সাকার উপাসনা উঠাইয়া দিতে চান। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কুফল বই সুফল হওয়া ত সম্ভব দেখি না। রূপ-ধ্যান হিন্দু-উপাসনা-পদ্ধতির একটি প্রধান এবং সুন্দর অঙ্গ, তাহার উচ্ছেদে ত কোন উপকার দেখি না। তবে দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা হেতু হিন্দু-সমাজে যে পৌত্তলিকতা-দোষ জন্মিয়াছে, তাহা যদি নিরাকরণ করিতে চাও, তবে দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, তাহা সমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা কর। তাহা না করিয়া যদি রূপ-চিন্তা ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে উঠাইতে চাও, তবে তোমাদের চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নয়। অল্পবুদ্ধি যুবকগণ সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে গিয়া অনেক সময় স্বভাব-সুলভ-চপলতা বশতঃ কুপথ-গামী হইয়া থাকে, এই জন্য কি সমাজ হইতে সঙ্গীত-চর্চ্চা উঠাইতে চাও? আর উঠাইতে চাহিলেই কি তোমাদের চেষ্টা সফল হইবে? আজ কত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে যে রূপ-ধ্যান-প্রথা চলিয়া আসিতেছে, আজ তুমি পাশ্চাত্যগণের অনুকরণে দুদিনে কি তাহার উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবে? কখনই না। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে সেই জন্য এই কথা বলিতে

চাই যে, সমাজে সাকার উপাসনা নিবন্ধন যে যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা কর, সাকার কথাতেই একেবারে অশ্রদ্ধা নাই করিলে ।

বাস্তবিক একটু বুঝিয়া দেখিলে হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতি অপেক্ষা সুন্দর অন্যরূপ উপাসনা-পদ্ধতি দেখা যায় না। ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম্ম মধ্য হইতে একটি ছোটখাট পূজা-পদ্ধতি লইয়া ইহা দেখাইতে চাই। দেখ, শিব-উপাসক কি পদ্ধতিতে শিবপূজা করিতেছেন। প্রথমে স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া দেহবিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিলেন। সরল ভাবে উপবেশন করিয়া "বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ, সম্মুখে নমঃ শিবায় নমঃ" প্রথমে এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিলেন। এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হইল দেখা যাউক। ইষ্টদেবের মহিমা-সম্বন্ধে যাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন-ভক্তিভাবে সেই গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া উপাসক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। 'যেন আমার উপাসনার ফল অচিরে ফলে' একান্ত চিত্তে এই সিদ্ধি-কামনা অন্তরে থাকায় উপাসক সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিলেন। এই দুই জনকে নমস্কারে উপাসক তাঁহার ভক্তি-বৃত্তি এবং ইচ্ছা-বৃত্তির প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখ, উপাসকের সিদ্ধি-কামনা কেন? অন্য কোন কারণে নয়, উর্দ্ধস্থ সেই ব্রহ্ম এবং অধঃস্থ তাঁহার অনন্ত শক্তি অনন্তের বিষয়ে জ্ঞান লাভ জন্যই এই সিদ্ধি-কামনা। এই জন্য উপাসক ব্রহ্ম ও অনন্তকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবকে নমস্কার করতঃ তাঁহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুদের প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতিই এইরূপ দেখা

যায় যে, তাঁহাদের উপাসনা কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে করিতে যখন তাঁহার পূর্ণভাব অন্তরে উদিত হইবে, তখন উপাসক মানস-পূজা আরম্ভ করেন। মানস-পূজা অর্থাৎ "সোহহং" সেই ইষ্টদেবই আমি; এই রূপ চিন্তা দ্বারা আপনাকে ইষ্টদেবের ন্যায় উন্নতভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। "সেই আমি" এই চিন্তা দ্বারা নিজের অহংজ্ঞান নিজের রূপে না রাখিয়া, নিজের ভাবসমূহে না রাখিয়া, ইষ্টদেবের রূপ ও মহিমায় সেই অহংজ্ঞান অর্পিত করিবার চেষ্টা করিতে হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মে শিক্ষা দেয় কি? এইরূপ মানস-পূজার পর বাহ্যজ্ঞান হইলে উপাসক পাদ্য, অর্ঘ্য নৈবেদ্যাদি ইষ্টদেবে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বাহ্য পূজা করেন।

কল্পনা-কল্পিত রূপ মহিমাদি ধ্যান ও মানস-পূজাদি ব্যাপার সুন্দর হইলেও চাল ছোলার নৈবেদ্য লইয়া ইষ্টদেবে উপহার দেওয়া যে একটি কুসংস্কারের ফল, তাহার ত সন্দেহ নাই; অনেকে এইরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলি যে, হিন্দুদের উপাসনার এই অংশটুকু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। হিন্দু-উপাসক নিজের অন্ন পানীয় দ্রব্য পর্য্যন্ত ইষ্টদেবে' সমর্পণ না করিয়া গ্রহণ করেন না। হিন্দু-উপাসক যে অন্ন পানাদি গ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহাদের নিজের আসক্তি পরিতৃপ্তির জন্য যেন না হয়; যেন সেই অন্নপানাদি-জনিত শক্তি কেবল দেব-কার্য্যেই ব্যয় হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশই নৈবেদ্য প্রদানের যথার্থ অর্থ। যখনই আমি অন্নপানীয়াদি ইষ্টদেবে অর্পণ করিতে যাইব, তখনই আমার স্মরণ হইবে, এই অন্নপানীয় দ্বারা আমি যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শান্তি করিব, তাহা যেন কেবল দেবকার্য্য

সাধনোদ্দেশেই করি। উপাসক এরূপ বাসনা অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে চান, এই জন্যই তাঁহার প্রাত্যহিক নৈবেদ্য নিবেদন। এখন দেখ, হিন্দুদের এই প্রথা কত দূর সুন্দর।

এই রূপে হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতি যতই আলোচনা করিয়া দেখা যায়, ততই সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং হিন্দু-দের উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া বরং সমাজের অবনতির সহিত উক্ত উপাসনা-পদ্ধতি যেরূপ মলিন হইয়া পড়িয়াছে, সেই মলিনতা ঘুচাইতে সকলে চেষ্টা করুন। তবেই সমাজের যথার্থ উপকার হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

কাঙালিনী।

আনন্দময়ীর আজি আগমন,
  আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
  দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
উৎসবের হাসি-কোলাহল
  শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা,

নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
  তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
  দেখিবারে আনন্দের খেলা

বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;

চারি দিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন!

কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—

কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন!

হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে,
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে!

তাই বুঝি আঁখি ছল ছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা,
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো এ কেমন ধারা!
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন!"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়া
"আমি ত ওদের কেহ নই!
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন!"

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ!
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ!

ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে!

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশী,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশী!

আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নেই; স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার!
শূন্যহাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কি দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রু-জল আছে!

অনাথা ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস!

বেদের দেবতা।

(বেদশীর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ)

আমরা বেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠককে দেখাইব, বেদে কি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে। আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে বেদে কোন্ দেবতাদের উপাসনা আছে? ঋগ্বেদসংহিতা বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাই, আমরা এখন ঋগ্বেদসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সময়ে বেদের অন্যান্যাংশের দেবোপাসনার স্থূল মর্ম্ম যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। এখন, আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে আছে যে, দেবতা তেত্রিশটি, কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণীদিদিদিগের গল্পে গল্পে তেত্রিশ কোটি হইয়াছে।

তার পর দেখিয়াছি যে, সেই তেত্রিশটি দেবতা, শতপথ ব্রাহ্মণে (ইহাও বেদ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা, (১) আদিত্য, (২) রুদ্র, (৩) বসু। তার পর মহাভারতে এই তিন শ্রেণীর দেবতার যেরূপ নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি।

ঋগ্বেদের সঙ্গে ইহার কিছু মিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ভিতর নাই। ঋগ্বেদে কতকগুলি আদিত্যের নাম আছে বটে,

এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্বয় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু, এমন কথা নাই। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়।

(১) মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, সবিতা ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে ঋগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড ইঁহাদিগের কোন প্রাধান্য নাই।

(২) আর কয়টির, অর্থাৎ মিত্র, সূর্য্য, বরুণ, সবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দেবতারাও ঋগ্বেদসংহিতায় বড় প্রবল।

অগ্নি, বায়ু, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অশ্বীদ্বয়, সোম।

(৩) বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে।

(৪) ত্রিত, আপ্ত্য, অহিব্রধ্ন ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বর বুঝায়—বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম।

(৬) তদ্ভিন্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধান—অদিতি ও ঊষা।

(৭) সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধীষণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, রাকা, সিনি-বালী গুঙ্গূ, শ্রদ্ধা ও শ্রী, এই কয় দেবীও আছেন। তদ্ভিন্ন পরি-চিতা সকল নদীগণও স্তুত হইয়াছেন।

এক্ষণে, আগে আদিত্যদিগের কথা কিছু বলিব। আদিত্য

শব্দে এখন সচরাচর সূর্য্য বুঝায়। দ্বাদশ আদিত্য বলিলে অনেকেই বারটি সূর্য্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারটি মাস বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এরূপ প্রয়োগও আছে। যাঁহারা অমরকোষের ছত্র দুই চারি পড়িয়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, "দেব" ইহার প্রতিশব্দ মধ্যে "আদিতেয়" শব্দটি ধরা হইয়াছে। আদিতেয়, আদিত্য, একই। এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক আদিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। দিতি, যাহার বন্ধন আছে, সীমা আছে, খণ্ডিত বা ছিন্ন। অদিতি, যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, অছিন্ন, সীমা নাই, যে অনন্ত; *The Infinite.*

এই জড় জগৎ সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব, সূর্য্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে উৎপন্ন; অদিতি অনন্ত, তাই অদিত দেবমাতা; দেবতারা আদিত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা যে অদিতি, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণেতিহাসেই, বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেব শিষ্যদিগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, এবং উপধার্ম্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। তবে বৃক্ষটীতে এখন অনেক বানরের বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা আছে, সময়ান্তরে সে কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বলিতেছি,

তাহা এই :—পৌরাণিকেরা বুঝিয়াছিল যে, এই অনন্ত,—অনন্ত, কাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপরম্পরা—এই অদিতি ;(*The infinite in time,space an dexistence*) ইহাই সর্ব্বপ্রসূতি। সর্ব্বপ্রসূতি বলিয়া যাহা তেজঃপুঞ্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্তিমান, যাহা মহৎ, যাহা বলবান্—আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ মরুৎ পর্জন্য, সকলেরই প্রসূতি। তাই অদিতি দেব-মাতা। কিন্তু ঋগ্বেদে অদিতির এতটা বিস্তার নাই। ঋগ্বেদে অদিতি অনন্ত বটে, কিন্তু সে অনন্ত আকাশ। আকাশ অনন্ত; আকাশ অদিতি। তাই বেদে অদিতি কেবল সূর্য্যাদি আদিত্যদিগের মাতা। অদিতি যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে ;—যথা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ৩ঋকে"যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ"--ইত্যাদি।

এখানে অদিতির বিশেষণ "দ্যৌঃ" শব্দ। দ্যৌঃ শব্দে আকাশ।*

অদিতি একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী ইহা বলিয়াছি ; কিন্তু দেখিতেছি, ইনি আকাশ মাত্র। ইহাঁকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক ঋগ্বেদের দেবতারা, হয়,

---

* শতপথ ব্রাহ্মণে আছে "ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ" এখানে যদিও পৃথিবীকে অদিতি বলা হইয়াছে, সে অনন্তার্থে। অথর্ব্ব বেদে পৃথিবী হইতে অদিতির প্রভেদ করা হইয়াছে। যথা, "ভূমির্মাতা অদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরীক্ষম্।" এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও অদিতি স্পষ্টই আকাশ।

(১) আকাশ, যথা অদিতি, দ্যৌস্, বরুণ, (ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন) ইন্দ্র, পর্জ্জন্য।

(২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিত্র, সবিতা, পূষা, বিষ্ণু।

(৩) নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, রুদ্র।

(৪) নয়, অন্তবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উষা, অশ্বীদ্বয়।

(৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা, বায়ু, মরুদ্গণ।

(৬) নয়, সৃষ্টিকর্ত্তা, যথা প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা।

(৭) ত্বষ্টা, যম, প্রভৃতি দুই চারিটিমাত্র এই শ্রেণীর বাহিরে।

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?

(কৃষ্ণচরিত্র)

কৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনায় প্রথমেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়। অথচ মহাভারতাদিতে কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। যদি ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তবে কৃষ্ণ, সামান্য মনুষ্যমাত্র। তাহা হইলে, কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা

কালে সামান্য মনুষ্যের চরিত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি, ইহাই বুঝিতে হইবে। ঐশিক লক্ষণ তাহাতে খুঁজিয়া মাথা ঘুরাইবার প্রয়োজন করিবে না। আর যদি বুঝি যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব নহে, তবে অতি সাবধানে, সভয়ে আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিতে হইবে। অতিশয় সশঙ্কে বিনীত ও ভক্তিভাবে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ, যাঁহাতে সর্ব্বভূত জাত, লীন, স্থিত, তাঁহার কোন লক্ষণ ইহাতে দেখি কি না। যিনি বুদ্ধির অতীত, বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বড় সাবধানে, সভয়ে, তাঁহাকেই সহস্র সহস্র প্রণতি পূর্ব্বক, সেই পবিত্র ভূমে প্রবেশ করিতে হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে, আমাদিগের খ্রীষ্টিয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের স্থূল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যীশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে। আমাদিগের দেশের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক না হইয়াও দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্ব্বিত-চর্ব্বণে ভক্তিমান্। তাঁহারাই কৃষ্ণের প্রধান শত্রু। এই জন্যই আমরা কৃষ্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার পূর্ব্বে এই কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না; এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ

বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তিনাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর নির্গুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নির্গুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস, যে, এই ভাবুকও পণ্ডিতগণ ও আমার মত নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি না, কেননা আমাদের সে শক্তি নাই।* মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শন শাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু "চতুষ্কোণ গোলক" মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হর্বর্ট স্পেন্‌সর এতকাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া

* "Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us."—Mansel, Metaphysics p. 384.

সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ("Something higher than Personality") তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাই না। এমন বকমারিতে কাজ কি?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকার?

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং শক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে, নিরাকার হইয়াও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দ্দেশ কর কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতে চাও না? যিনি এই জড় জগৎকে আকার *প্রদান* করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, ও বলেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার জগৎ শাসনের জন্য, জগতের হিতজন্য, মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া,

বহ্বায়াসে দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ;—গর্ব্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তনপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমারাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরেরও বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত,—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (Manifestation) এ সকল তেমনি তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাঁহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্যজীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অসুরবধ অসুরবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথাবটে। যিনি অনন্ত শক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস, শিশুপালও যে, একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মা বিশেষের নিধন। আসল

কথাটা, ভগবদ্‌গীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে ঃ—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। "ধর্ম্ম-সংরক্ষণ" কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয় ? ধর্ম্ম কি ? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে ?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য, ও চরিতার্থতা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনু-শীলন সাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্ম্ম সাপেক্ষ। অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্মপালন (Duty) বলা যায়।

মনুষ্য কতকটা নিজরক্ষা, ও বৃত্তিসকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্ম্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারী-রিক বৃত্তিশূন্য ; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না ; কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্ম পরিণত হয়, তাহা জানে না ; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী

সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি ?

এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যও এই প্রকার।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥
কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥
যদ্‌যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
স্বয়ং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মনি ॥২২॥
যদিহ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকান্ কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥"

গীতা, ৩ অ।

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করেন ; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান অনুবর্ত্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই,

তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি *। যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদায় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ির কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া, এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে পর্য্যাপ্তও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও প্রয়োজনও নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেই গুলি জগৎ-রক্ষা ও পালন পক্ষে পর্য্যাপ্ত এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার আর উন্নতি হইতে

* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন।

পারে না। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি, এবং এই গতিই জগৎ-কর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্ত্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্ত-ক্ষেপণের বা কার্য্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ও ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য্য আছে,—উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল, ধর্ম্মের উন্নতি। ধর্ম্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়ম-ফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে যে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যেসকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বর-কৃত হইলেও তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক জগতে কোন কাজ হইতে কখন দেখা যায় নাই। এজন্য এসকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। পূর্ব্বপক্ষটা বড় খাঁটি নহে, কিন্তু বিচারস্থলে তাহার ন্যায্যতা স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিয়া আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খৃষ্ট অবতারের এরূপ

অনেক কথা আছে। কিন্তু খৃষ্টের পক্ষ সমর্থনের ভার খৃষ্টান-দিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এই রূপ কার্য্য ভিন্ন অবতারত্বের উপা-দান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান্ পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। সময়ান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখা-ইব। সত্য বটে এই সকল অবতার পুরাণে কীর্ত্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস, ভণ্ডামি ও নষ্টামি স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এবং রামচন্দ্রেরও সে পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে*।

আমি কেবল এই কৃষ্ণাবতারেরই ঈশ্বরত্ব অঙ্গীকার করি-তেছি। ইহা বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতি প্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতি

* তবে এক হিসাবে সন্দেহ নাই।

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃসত্ত্বনিধের্দ্বিজ।
যথাবিদাসিনাঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥
ঋষয়ো মনবো দেবাঃ মনুপুত্রাঃ মহৌজসাঃ
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়স্তথা।"

মৎস্যপুরাণে।

প্রক্ষেপের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূলগ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং এখন যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতি প্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।

তার পর অবিশ্বাসী বলিবেন, ভাল, মানিলাম, ঈশ্বর অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণ যে ঈশ্বরাবতার, তাহার প্রমাণ কি? সে কথা পরে বিচার্য্য।

সীতারাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলা গুলি লইয়া, সসৈন্যে ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। গোলা গুলির কাছে ঢাল সড়কি কি করিবে? বলা বাহুল্য যে, নিমেষমধ্যে সেই যোওয়ানের দল অদৃশ্য হইল। যে নিরস্ত্র বীর পুরুষেরা তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া লড়াই কতে করিতেছি বলিয়া কোলাহল করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা ত বারণ করিয়াছিলাম?" এই বলিয়া আর পশ্চাদ্দৃষ্টি না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাহারা দাঙ্গার কোন সংস্রবে ছিল না, তাহারা 'চোরা গোরুর অপরাধে কপিলার বন্ধন' সম্ভাবনা দেখিয়া, সীতারাম ও গঙ্গারামকে নানা বিধ গালিগালাজ করিয়া আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক পলাইতে লাগিল।

অতি অল্পকালমধ্যে সেই লোকারণ্য অন্তর্হিত হইল। প্রান্তর যেমন জনশূন্য ছিল, তেমনি জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্চ্ছিতা, ভূতলস্থা, শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন,

"তুমি যে আমার ঘোড়া চুরি করিয়া পালাইয়াছিলে, সে ঘোড়া কি করিলে? বেচিয়া খাইয়াছ?"

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না। ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়াছি—ধরিয়া দিতেছি।"

সীতা। ধরিয়া, তাহার উপর আর এক বার চড়িয়া, পলায়ন কর।

গঙ্গা। আপনাদের ছাড়িয়া?

সীতা। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না।

গঙ্গা। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি যাইব না।

সীতা। তুমি বড় নদী পার হইয়া যাও। শ্যামনগর চেন ত?

গঙ্গা। তা চিনি না?

সীতা। সেইখানে অতি দ্রুতগতি যাও। সেই খানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "আমি এখন ফৌজদারের কাছে যাইব—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

গঙ্গারাম সীতারামের কথা শুনিয়া না হউক, ভ্রূকুটি দেখিয়া নিঃস্তব্ধ হইল। এবং সীতারাম কিছু ধমক চমক করায় ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে গেল।

এদিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর মূর্চ্ছিতা শ্রীকে "ঝাড় ফুঁক" করিতেছিলেন। যদি সভ্য ভাষায় বলিতে হয়, বল মেস্মেরাইস্ করিতেছিলেন। পরে শ্রী, যে কারণেই হউক, চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। তার পর এদিক ওদিক চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

সে কিছু দূর গেলে সীতারাম চন্দ্রচূড়কে বলিলেন, "আপনি ওঁর পিছু পিছু যান। ওঁর যাহাতে রক্ষা হয়, সে ব্যবস্থা করিবেন। আপনাকে বেশী বলিতে হইবে না।"

চন্দ্র। আর তুমি এখন কি করিবে?

সীতা। আপনাকে কিছু বলিতে পারি না, কেন না আপনার কাছে যাহা বলিব, তাহা ঘটনাক্রমে যদি মিথ্যা হয়, তবে বড় পাপ হইবে। অতএব কিছুই বলিব না। আপনি শ্যামপুরে গমন করুন। যদি জীবিত থাকি, সেইখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

শুনিয়া চন্দ্রচূড়, বিষণ্ণমনে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। গুরু শিষ্য, পরস্পরকে ভাল চিনিতেন। সুতরাং চন্দ্রচূড় কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

সকলেই চলিয়া গেল। মাঠে আর কেহ নাই। কেবল একা সীতারাম—সেই বৃক্ষমূলে, যে ডালের উপর চণ্ডীমূর্ত্তি শ্রী দাঁড়াইয়া, রণজয় করিয়াছিল, সেই ডাল ধরিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া সীতারাম একা। আমাদের সকলেরই কখনও কখনও এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন এক মুহূর্ত্তের দ্বারা সমস্ত জীবন শাসিত হয়। সীতারামের তাই হইল। ভাবিতেছিলেন, এ কাণ্ড কি? কেন

হইল? কে করিল? ভাল হইয়াছে কি? ইহার কারণ কি? উপায় কি? কিসের লক্ষণ?

যে দিকে সীতারাম মনশ্চক্ষু ফিরান, সেই দিকে দেখিতে পান, মুসলমানের অত্যাচার!

সুরাসুর মনে পড়িল। বৃত্র, সম্বর, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ, বলি, প্রহ্লাদ, বিরোচন—কে মারিল? কেন মরিল? কেনই বা হইল? কেনই বা মরিল?

তাহার পর রাক্ষস—মানুষ, ইহাদের কথা মনে পড়িল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, অলম্বুষ, হিড়িম্ব, বক, ঘটোৎকচ, দন্তবক্র, শিশুপাল, একলব্য, দুর্য্যোধন, কংস, জরাসন্ধ, কে মারিল? কেন মরিল? নহুষ কেন অজগর হইল?

শেষ মনে মনে স্থির হইল, সেই দুর্দ্দমনীয় মানসিক স্রোতের প্রক্ষিপ্ত সার এই পাইলেন—দেব। দেব—অর্থে ধর্ম্ম।

তখন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সীতারামের মনের ভিতর উপস্থিত হইল। যেমন আলোক দেখিতে দেখিতে চোখ্ বুজিলে, তবু অন্ধকারের ভিতর একটু রাঙ্গা রাঙ্গা ছায়া দেখা যায়, প্রথমে মনে হয়, ভ্রম মাত্র, তার পর বুঝা যায় যে, সব ভ্রম নয়, সত্য আলোকের ছায়া—সীতারাম সেই রকম একটু রাঙ্গা ছায়া দেখিলেন মাত্র। তার পর, যেমন, বনস্থ ভূপতিত পত্ররাশি মধ্যে প্রথম যেন একটু খদ্যোতোন্মেষবৎ অগ্নি দেখা যায়, বড় ক্ষীণ বটে, কিন্তু তবু আলো, তেমনি আলো বলিয়া, সীতারামের বোধ হইল। হায়! হৃদয়ের ভিতর আলো কি মধুর! কি স্বর্গ! অথবা স্বর্গ ইহার কাছে কোন্ ছার! যে একবার, আপনার হৃদয়ে আলো দেখিয়াছে, সে আর ভুলে না! জগতের সার সুখ প্রতিভা। প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।

জোনাকির মত তেমনি একটা আলোক, সীতারাম, আপনার হৃদয়মধ্যে দেখিলেন। যেমন বনতলস্থ শুষ্ক পত্ররাশি মধ্যে সেই খদ্যোতবৎ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, ক্রমে একটু একটু করিয়া বাড়ে, ক্রমে একটু একটু করিয়া জ্বলে, সীতারামও আপনার হৃদয়ে তাই দেখিলেন। দেখিলেন, ক্রমে অনেক শুষ্ক পত্র ধরিয়া গেল,ক্রমে সেই অন্ধকার বন আলো হইতে লাগিল। ক্রমে সে শ্যামল পল্লবরাশি শ্যামলতা হারাইয়া উজ্জ্বল হরিৎ প্রভা প্রতিহত করিতে লাগিল,—ফুলে, ফলে, পাতায়, লতায়, কাণ্ডে,দণ্ডে,উজ্জ্বল জ্বালা কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে সব আলো—শেষ ঘোর দাবানল, সব অগ্নিময়, শত সূর্য্য-প্রকাশ! তখন সীতারাম বুঝিলেন, হৃদয়ের সে আলোটা কি। বুঝিলেন, হৃদয়ে সহসা যে প্রভাকর উদিত হইয়াছে, তাহার নাম—

হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন!

বুঝিলেন, এই সূর্য্যে সকল অন্ধকার মোচন করিবে।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সীতারাম বুঝিবামাত্র ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। প্রতিভা কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ধৈর্য্য রক্ষা করে! প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করিয়া, বলিলেন, "এই বাহু! ইহাতে কি বল নাই? কে এমন তরবারি ধরিতে পারে? কাহার বন্দুকের এমন লক্ষ্য! কাহার মুষ্টিতে এত জোর! এ রসনায় কি বাগ্দেবীর প্রসাদ নাই? কে লোকের এমন মন হরণ করিতে পারে! আমি কি কৌশল জানি না—"

সহসা যেন সীতারামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। হৃদয়ের আলো একেবারে যেন নিবিয়া গেল। "এ কি বলিতেছি!

আমি কি পাগল হইয়াছি! আমি কি করিতেছি! আমি কে! আমি কি! আমি ত একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা—সমুদ্র-তীরের একটি বালি! আমার এত দর্প! এই বুদ্ধিতে হিন্দু-সাম্রাজ্যের কথা আমার মনে আসে! ধিক্ মনুষ্যের বুদ্ধিতে!”

তখন সীতারাম কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অনন্ত, অব্যয়, নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্ব্ব জীবের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বা-দৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন,“তিনিই বল! তিনিই বাহু-বল! তিনিই ধর্ম্ম! ধর্ম্মচ্যুত যে বাহু-বল, তাহা পরিণামে দুর্ব্ব-লতা। সীতারাম তখন বুঝিলেন, ধর্ম্মই হিন্দু-সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের উপায়।

সীতারামের হৃদয়, অতিশয় স্নিগ্ধ, সন্তুষ্ট ও শীতল হইল।

তখন প্রান্তর পানে চাহিয়া সীতারাম দেখিলেন, মাঠ, অশ্বারোহী মুসলমান-সেনায় ভরিয়া গিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান সেনা নির্গমনের পূর্ব্বেই ফৌজদারের হুজুরে, সম্বাদ পৌঁছিয়াছিল যে,বিদ্রোহীরা পলাইয়াছে। অতএব এক্ষণে যুদ্ধার্থে সেনা নির্গত না হইয়া কেবল বিদ্রোহীর ধৃতার্থ অশ্বা-রোহী সেনাগণ নির্গত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সেনা প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও না দেখিয়া,কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে, ধাবমান হইতেছিল। তাহারই এক জন সীতারামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল,

“তোম্ কোন্?”

সীতা। মনুষ্য।

সিপাহী। সো তো দেখ্‌তে হেঁ। নাম কিয়া তোমারা।

সীতা। কি কাজ্ বাপু তোমারা নামে?

সিপাহী। তোম্ বদমাস্।

সীতা। হবে।

সিপাহী। খানাবদোষ।

সী। অসম্ভব নহে।

সি। ডাকু হো?

সী। বোধ হয় কি?

সি। চোট্টা হোগে।

সী। দিল্লীর বাদশাহের চেয়ে?

সি। কিয়া বোলো?

সী। বলি তুমি আমার দিক্ করিতেছ কেন?

সি। তোম্‌কো গিরেফ্‌তার কোরেঙ্গে?

সী। আপত্তি কি?

সি। চল্।

সী। কোথায়?

সি। ফাটক্ মে।

সী। চল। কিন্তু তুমি ত ঘোড়ায়। আমি হাঁটিয়া তোমার সঙ্গে যাইব কি প্রকারে?

সি। কদম কদম আও।

সিপাহী সাহেব কদম কদম চলিলেন। সীতারাম সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সিপাহী একজন পাইকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে হুকুম দিলেন যে, "এই ব্যক্তি চোর, ইহাকে ফাটকের জমাদ্দারের কাছে পঁহুছাইয়া দিবে।"

ইন্দ্র।

এখন আমরা কতক কতক জানিয়াছি, ঋগ্বেদে কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা আছে। আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করি, তবে সে কথার সবিশেষ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন, ইন্দ্রাদির কথা বলি।

এই ইন্দ্রাদি কে? ইন্দ্র বলিয়া যে এক জন দেবতা আছেন, কি বিষ্ণু বলিয়া দেবতা এক জন আছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? কোন মনুষ্য কি তাঁহাদের দেখিয়া আসিয়াছে? তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে অনেক পাকা হিন্দু বলিবেন যে, "হাঁ অনেকেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছে। সেকালে ঋষিরা সর্ব্বদাই স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন। এবং তাঁহারাও সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এ সকল কথা পুরাণ ইতিহাসে আছে।" বোধ হয়, আমাদিগকে এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে না। কেন না আমাদিগের অধিকাংশ পাঠকই এ সকল কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদিগের সহিত রাজর্ষিরা এবং মহর্ষিরা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীলা করিতেন, তাঁহাদিগের চরিত্র বড় চমৎকার। কেহ গুরুতল্পগামী, কেহ চোর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া নন্দন-

কাননে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ অভিমানী,কেহ স্বার্থপর,কেহ লোভী,—সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্ব্বল, কখন অসুর কর্ত্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্ত্তৃক দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কর্ত্তৃক পরাজিত, কখন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মানবদিগের অভিশাপে বিপদ্‌গ্রস্ত, সর্ব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন। এই কি দেব-চরিত্র? ইহার সঙ্গে এবং নিকৃষ্ট মনুষ্য-চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি? এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এ সকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর একটা গূঢ় তাৎপর্য্য আছে: তাহা পরম রমণীয় এবং মনুষ্যের উন্নতিকর। সেই কথাটী ক্রমে পরিস্ফুট করিব বলিয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধগুলি লিখিতেছি। সেই কথা বুঝিবার জন্য আগে বোঝা চাই, এই সকল দেবতা কোথা হইতে পাইলাম।

অনেকে বলিবেন, বেদেই পাইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদেই বা তাঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? বেদ-প্রণেতারা তাঁহাদিগকে কোথা হইতে জানিলেন? পাকা হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে বলিবেন, কেন বেদ ত অপৌরুষেয়! বেদও চিরকাল আছেন, দেবতারাও চিরকাল আছেন, সুতরাং তাঁহারাও বেদে আছেন। অপর কেহ বলিবেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ পাকা হিন্দুর সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বেদ যে ঋষি-প্রণীত অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত, এ কথা বেদেই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে।

এ কথায় যাঁহারা বুঝিবেন না তাঁহাদিগকে বুঝাইবার আর উপায় নাই।

বেদ যদি ঋষি-প্রণীত হইল, তবে বিচার্য্য এই যে, ঋষিরা ইন্দ্রাদিকে কোথা হইতে পাইলেন। তাঁহারা ত বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদিকে দেখিয়াছি। সে কথা পুরাণ ইতিহাসে থাকুক, ঋগ্বেদে নাই। অথচ তাঁহারা ইন্দ্রাদির রূপ ও গুণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। খবর পৌঁছিল কোথা হইতে? ইন্দ্রাদি কি, এ কথাটা বুঝিলেই সে কথাটাও বোঝা যাইবে। এবং আরও অনেক কথা বোঝা যাইবে।

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ইহাঁর ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে? কে নাম রাখিল? মনুষ্যে না তাঁর বাপ মায়ে? "তাঁর বাপ মায়ে," এমন কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বাপ মা আছেন, এ কথা ঋগ্বেদে আছে। তবে তাঁর বাপ মা কে, সে বিষয়ে ঋগ্বেদে বড় গোলযোগ। ঋগ্বেদে অনেক রকম বাপ মার কথা আছে। ঋগ্বেদে এক স্থানে মাত্র তিনি আদিত্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু শেষ পৌরাণিক তত্ত্ব এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি অদিতি ও কশ্যপের পুত্র। পুরাণেতিহাসে তাঁহার এই পরিচয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অদিতি ও কশ্যপ—ইন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় কি তাঁহার ঐ নাম রাখিয়াছিলেন?

আগে বুঝিয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র অদিতি এবং কশ্যপের সন্তান কেন হইলেন? অদিতি কে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি—তিনি অনন্ত প্রকৃতি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার উপর দুই এক জন বিলাতী পণ্ডিতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক বাবুর মনঃপূত হইবে। এই জন্য

নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত, দ্বিতীয়তঃ মাক্ষমূলরের মত উদ্ধৃত করিলাম।*

এই ত গেল দেবতাদিগের মা। এখন দেবতাদিগের বাপ কশ্যপের কিছু পরিচয় দিই। এখানে সাহেবদিগের সাহায্য পাইব না বটে, কিন্তু বেদের সাহায্য পাইব। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ। এ অর্থ বেদেও লেখে, আজিও অভিধানেও লেখে। এখন, কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম কূর্ম্ম। আবার কূর্ম্ম

---

* আচার্য্য রোথ বলেন—

"Aditi, Eternity or the Eternal, is the element which sustains and is sustained by the Adityas. This conception, owing to the character of what it embraces, had not in the Vedas been carried out into a definite personification, though the beginnings of such are not wanting. *** This eternal and inviolable principle in which the Adityas live and which constitutes their essence is the Celestial Light."

মুর সাহেব কৃতানুবাদ।

২। মাক্ষমূলর বলেন—

"Aditi, an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth beyond the clouds beyond the sky."

Translations from the Rig-Veda. I. 230.

সায়নাচার্য্যের মত ভিন্ন প্রকার, কিন্তু তিনিও জানেন যে অদিতি চৈতন্য-যুক্তা দেবী বিশেষ নহেন। তিনি বলেন "অদিতিং অখণ্ডনীয়াং ভূমিং দিতিং খণ্ডিতাং প্রজাদিকাং।" কেহ কেহ অদিতিকে পৃথিবী মনে করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে সে কচ্‌কচিতে আমাদের কাজ নাই—বৈদিক ঋষিরা তাহার দায়ী।—অতএব যে করিয়াছে, সেই কূর্ম্ম। কূর্ম্ম হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্ত্তা আবার কশ্যপ হইল কেন না—কূর্ম্ম কশ্যপ একার্থবাচক শব্দ। যিনি সকল করিয়াছেন, যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বলিয়া অভিহিত, তিনি কূর্ম্ম, তিনিই এই কশ্যপ। এখন বেদ হইতে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

"স যৎকূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্যাঃ ইতি।"

শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।৪।১।৫

ইহার অর্থ—

"কূর্ম্ম নামের কথা বলা যাইতেছে।—প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন, (অকরোৎ) করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম্ম। কশ্যপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কূর্ম্ম। এইজন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ।"

অতএব প্রজাপতি বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তার উপর উপন্যাসকারেরা, উপন্যাস বাড়াইয়াছে।

অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা হইল। সকল বস্তুর বাপ মা যে, ইন্দ্রেরও বাপ মা সেই প্রকৃতি পুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ নহে; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন, সাংখ্য তখন হয় নাই। প্রকৃতি অনন্তসত্তা *—পুরুষ আদি কারণ। যখন বাপ-

* পাঠকের স্মরণ থাকে যেন প্রথমে অদিতি অনন্তসত্তা বা প্রকৃতি

মার এরূপ পরিচয় পাইলাম, তখন এরূপ বুঝা যায়, যে ইন্দ্রও বুঝি একটা শরীরী চৈতন্য না হইবেন—প্রকৃতিতে ঐশী শক্তির বিকাশ মাত্র হইবেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের নামেই সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। নামটা, অদিতি ও কশ্যপ তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময়ে রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। আমরা যাঁহাকে ইন্দ্র বলি, তাঁহার গুণ দেখিয়াই ইন্দ্র নাম রাখিয়াছি। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর "র" প্রত্যয় করিয়া "ইন্দ্র" শব্দ হয়। অতএব, যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, অদিতি ও আকাশ দেবতা। আকাশকে দুইবার পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা কিছুই অসম্ভব নহে *। বরং আরও আকাশ-দেবতা আছে—থাকাও সম্ভব। যখন আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ অদিতি; যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র; যখন আকাশকে আলোকময় ভাবি, তখন দ্যৌঃ। এমনই আকাশের আর আর মূর্ত্তি আছে। সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমে দেখাইব।

নহেন—প্রথমে অদিতি অনন্ত আকাশ মাত্র। "অনন্ত" ইতিজ্ঞান, প্রথমে আকাশ হইতে জন্মিয়া পরিণামে সমস্ত সত্তায় পৌঁছে।

* মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ ইহাও বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ "অদিতি" এবং আকাশ "ইন্দ্র" বলিয়া কল্পিত হয়, তখন ইহাদিগের মাতা পুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হয় নাই। ঋগ্বেদে তিনি অদিতির পুত্রদিগের মধ্যে গণিত হন নাই; কেবল এক স্থানে মাত্র ইন্দ্র ঋগ্বেদে আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সে সূক্তটিও বোধ হয় আধুনিক।

আমরা যদি এই কথা মনে রাখি যে, বৃষ্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। এখন বুঝিতে পারি, ইন্দ্রই কেন বজ্রধর, আর কেহ কেন নহে। যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই বজ্রপাত করেন।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, কতকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে কিছুই অসম্ভব নাই, কেন না সংহিতা সঙ্কলিত গ্রন্থ মাত্র। নানা সময়ে, নানা ঋষি কর্তৃক প্রণীত না হয় দৃষ্ট মন্ত্রগুলির সংগ্রহ মাত্র। অতএব তাহার মধ্যে কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, কোনটি পরবর্ত্তী অবশ্য হইবে। যে সূক্তগুলি আধুনিক, তাহাতে ইন্দ্র শরীরী, চৈতন্যযুক্ত দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন বটে, তখন ইন্দ্রের উৎপত্তি ঋষিরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সূক্তগুলিতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে আকাশ, এ কথা ঋষিদের মনে আছে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

"অবর্দ্ধন্নিন্দ্রম্মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা" ১০।৭৩.১

অর্থাৎ যখন তাঁহার ধনাঢ্যা মাতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন মরুতেরা তাঁহাকে বাড়াইলেন। এস্থলে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

"ইন্দ্রস্য শীর্ষং ক্রতবো নিরেকে" ১০।১১২।৩

এখানে সূর্য্যালোকে আকাশ আলোকিত হইবার কথা সূচিত হইতেছে এবং ইন্দ্রকে "হরিশিপ্র" "হরিকেশ" "হরিশ্মশ্রু" "হরিবর্পা" "হিরণ্ময়" "হিরণ্যবাহু" ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা আকাশে সূর্য্যালোকজনিত কাঞ্চনবর্ণ সূচিত

হইতেছে। বর্ষণকালীন মেঘ সকল বায়ুর উপর আরোহণ করিয়া চলে, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বাতাসের ঘোড়ার উপর চলেন "যুবানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ" ১০।২২।৪।৬। ইন্দ্রের বজ্রের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে "সমুদ্রে অন্তঃ শয়তে উদ্না বজ্রো অভীবৃতঃ" ৮।৭৯।৯। বজ্র অন্তঃসমুদ্রে জলকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া শুইয়া থাকে। এখানে অন্তঃসমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ, আর জল অর্থে অন্তরীক্ষের বায়বীয় পদার্থ। অথর্ব্ব বেদে ইন্দ্রের জাল আছে "অন্তরীক্ষম্ জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশোমহীঃ।" অথর্ব্ববেদ ৮।৫। অর্থাৎ অন্তরীক্ষটা ইন্দ্রের জাল আর পৃথিবীর দিক্ সকল জালের দণ্ড বা বাঁশ—এ জাল আকাশেরই।

এরূপ উদাহরণ খুঁজিলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও যোগাইতে পারিব। এক্ষণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উপন্যাস আছে, তাহার দুই একটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। এ সকল উপন্যাস অধিকাংশ অসুরবধ সম্বন্ধে। আধুনিক বৈয়াকরণেরা অসুর শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন যে, "অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে ইতি অসুরঃ।"

যদিও এই ব্যাখ্যা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব্দ একার্থবাচক ছিল, তথাপি শেষাবস্থায় দেবদ্বেষীদিগকেই যে অসুর বলা হইত, ইহা যথার্থ। যখন বেদে পড়ি যে, বৃত্র নমুচি শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রের দ্বেষক ছিল এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে বজ্রদ্বারা বধ করিলেন তখন অনেক স্থানেই বুঝিতে পারি যে,এই সকল অসুর বৃষ্টির বিঘ্ন মাত্র,বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র! আকাশ বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন, অমনি সে অসুরেরা মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্রে

বৃত্র মরে। "বজ্রেণ হত্বা নিরাপঃ সসর্জ" "বজ্রেণ খানি অতৃণৎ নদীনাং" "ইন্দ্রো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহীহাচ্ছ সমুদ্রং" এমন কথা অনেক পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ২ ঋকে আছে যে, বাশ্রাঃ ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ" "বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, তদ্রূপ গো সকল হাম্বারব করিয়া সত্বর বৎসের নিকট গমন করে।

এই সকল কথার মর্ম্ম এই যে, বৃত্রাদি অসুর বধ হইলেই জল ছোটে। অতএব অসুর-বধ আর কিছুই নহে—বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। সচরাচর দেখা যায় যে, গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রাঘাত হয়, এই জন্য বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র অসুর বধ করেন। কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, "হিমেন অবিধ্যদর্ব্বুদং" ৮।৩২।২৬, (হিমেন, হিমের দ্বারা অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বলি তদ্দ্বারা)। শুষ্ককালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময়ে শিল (hail) পড়ে। পুনশ্চ "অপাম্ ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্র উদবর্ত্তয়ৎ" ৮।১৪।১৩ জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক উদ্বর্ত্তন করিলেন। বড় বৃষ্টির চোটে অসুরটা মারা গেল।

অতএব নমুচি বৃত্র শম্বর অহি প্রভৃতি অসুরেরা বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই যে নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহারা পুরাণেতিহাসের অনেক মাল মসলা যোগাইয়াছে।

ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণেতিহাসের উপন্যাস সকল কি প্রকারে রচিত হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি। অহল্যার গল্প সকলেই

জানেন। কথিত আছে, ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাকে হরণ করেন এবং ঋষির শাপে তাঁহার অঙ্গ সহস্রধা বিকৃত হয়। তাহার পর আবার ঋষিবাক্যে সেই বিকার সহস্র চক্ষে পরিণত হয়। উপন্যাসটা শুনিতে অতি কদর্য্য এবং এইরূপ উপন্যাসের জন্যই হিন্দুশাস্ত্র লক্ষ গালি খাইয়াছে। আর এই সকল উপ-ন্যাসই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত অভক্তির কারণ হইয়াছে! ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহেবেরাও—অন্যে নয়, মূর, মাক্ষমূলার, লাসেন প্রভৃতি,পড়িয়া শুনিয়া স্থির করিয়া-ছেন যে,লাম্পট্যপ্রিয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা লাম্পট্যপ্রিয়তা বশতঃই, ইন্দ্রাদি দেবতাকে লম্পট বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে।

কিন্তু কথাটা বড় সোজা। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ কিন্তু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায়? সাহেবেরা কি দেখিতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? সহস্র তারাযুক্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। কথাটা আমি নূতন গড়িতেছি না— অনেক সহস্র বৎসরের কথা। প্রাচীন গ্রীসেও এ কথা প্রচলিত ছিল। তবে আমরা বলি, ইন্দ্র সহস্রাক্ষ; তাহারা বলে, আর্গস শতাক্ষ। *

পাঠক বলিতে পারেন, তাহা হউক, কিন্তু অহল্যার কথাটা আসিল কোথা হইতে? সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে।

---

* "Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its earlier mythic meaning, there are often sufficient grounds for an attempt to restore it. * * * * For instance the Greeks had still present to their thought the meaning of Argos Panoptes, Io's hundred eyed-all seeing guard, who was slain by Hermes and changed into a peacock, for Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven itself, even as the Aryan Indra—the Sky —is the "thousand eyed."

Tylor's Peremitive Culture. p. 230 Vol. I.

অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না—কঠিন, অনু-র্ব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এই জন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন। কুমারিল্লভট্ট এ উপন্যা-সের আর একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নোটে* উদ্ধৃত করি-লাম। উপরি-কথিত ব্যাখ্যাগুলির জন্য লেখক নিজে দায়ী।

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঝিয়া থাকিবেন যে, হিন্দুধর্ম্মের ইন্দ্রাদি দেবতা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং পুরা-ণেতিহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আসিয়াছে। বেদের অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু বলিব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী আকাশ মাত্র, কিন্তু ইহাতে কি জগ-দীশ্বরের শক্তি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না? যদি আমি আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখ দুঃখের বিধানকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার উপাসনা করি, যদি তাই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ইন্দ্র! ধন দাও, গোরু দাও, ভার্য্যা দাও, শত্রুসংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু

---

*সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈর্বাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণহেতুত্বাজ্জীর্যত্যাস্মাদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।"

ইহার অর্থ। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্যহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতা অহল্যাজার। ব্যভিচার জন্য নহে। বঙ্গ-দর্শন ১২৮১—৪৬৮ পৃঃ।

যদি আমার মনে থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের বর্ষণ শক্তির বিকাশস্থল; যে অনন্ত কারুণ্যের গুণে পৃথিবী বৃষ্টি পাইয়া শীতলা, জলশালিনী, শস্যশালিনী, জীবশালিনী হয়, সেই কারুণ্যের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী প্রতিমা, তবে তাহাকে ভক্তি করিলে, পূজা করিলে, ঈশ্বরের পূজা করা হইল। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; তবে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি কিসে? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার শক্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া। যেখানে সে শক্তি দেখিব, সে পরিচয় পাইব, সেইখানে তাঁহার উপাসনা করিব, নহিলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে না। আর যদি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি সুখের হয়, তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শক্তিমান্, তাহার উপাসনা করিতে হয়। যদি এ সকলের প্রতি ভক্তিমান্ না হইব, তবে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি-গুলি লইয়া কি করিব? এ উপাসনা ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে। এগুলি বাদ দিয়া যে ঈশ্বরোপাসনা, যে পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্ম্মে এ উপাসনা আছে। ইহা হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। তবে দুর্ভাগ্য বশতঃ ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের বিকৃতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সুখদুঃখের বিধাতা, অথচ ইন্দ্রিয়-পরবশ, কুকর্ম্মশালী, স্বর্গস্থ একটা জীবে পরিণত করিয়াছি। হিন্দু ধর্ম্মের সেইটুকু এখন বাদ দিতে হইবে—হিন্দু ধর্ম্মে যে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ঈশ্বর বিশ্বরূপ; যেখানে তাঁহার রূপ দেখিব, সেইখানে তাঁহার পূজা করিব। সেই অর্থে ইন্দ্রাদির উপাসনা পুণ্যময়—নহিলে অধর্ম্ম।

পঞ্চভূত।

(হিন্দুমত সমর্থন।)

এই জড় জগৎ যে যে সামান্য উপাদানে গঠিত, তাহা স্থির করিতে গিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোমকে পাঁচটি সামান্য উপাদান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সেই সামান্য উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ৬৮টি সামান্য উপকরণে এই জড় জগৎ রচিত। এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ত তাঁহাদের ভ্রম দেখিতেছি না, সুতরাং আধুনিকের বিশ্বাস যে প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে পাঁচ ভূতের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের জড় জগতের উপাদান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। তাঁহারা যে ক্ষিতিকে একটি সামান্য উপাদান বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা ৬৮ টি এলিমেণ্ট-গঠিত। অপ্ অক্সিজন হাইড্রোজনের সমষ্টিতে প্রস্তুত তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। তেজ ত পদার্থই নহে; এই সব নানা কারণে প্রাচীন পণ্ডিতদের উপর লোকের শ্রদ্ধা হীন হইতেছে।

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ তর্ক করেন, তাঁহাদের এই কথা বলিতে চাই যে, কপিলাদি যে সমস্ত ঋষিগণ পঞ্চ ভূতের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা চিন্তাশীলতায় উন্নত বই অবনত ছিলেন না। তাঁহারা কিরূপ চিন্তা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া পঞ্চ ভূতকে জড় জগতের সামান্য উপকরণ স্বরূপ স্থির করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে

অনুসন্ধান না করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তাঁহাদের কথার আপাতবৈষম্য দেখিয়াই তাঁহাদিগকে মূর্খ স্থির করা যুক্তি-সঙ্গত হয় না।

ঘরে একখানি গালিচা বিছান রহিয়াছে। আমি এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বল দেখি কত রকম সূতায় এই গালিচাখানি নির্ম্মিত? সে দেখিল পশমের সূতা, পাটের সূতা এবং তুলার সূতা এই তিন রূপ সূতায় গালিচা নির্ম্মিত, সুতরাং সে উত্তর দিল যে, তিন রকম সূতায় এই গালিচা নির্ম্মিত। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, রাঙ্গা কাল হলিদা ইত্যাদি দশ রকম সূতায় গালিচা নির্ম্মিত। সুতরাং যে বলিয়াছে যে, গালিচা তিন প্রকার সূতায় নির্ম্মিত, তাহাকে যদি একেবারেই ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করি, তবে বাস্তবিক মূর্খ কে?

বাস্তবিক যে রূপ বিভাগপ্রণালী অবলম্বনে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ জড় জগতের কারণ অনুসন্ধানে রত ছিলেন এবং যেরূপ প্রণালী অবলম্বনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, উভয় পথ সম্পূর্ণ পৃথক্। বহির্জ্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরস্পরের সহিত যে রাসায়নিক আকর্ষণ আদি সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহাকেই বিভাগ প্রণালীর মূল (Fundamentum Divisionis) ধরিয়া অনুসন্ধান করা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ, কিন্তু বহির্জ্জগতের পদার্থ সমূহের অন্তর্জ্জগতের সহিত যে সম্বন্ধ থাকাতে আমার পক্ষে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বিভাগ-প্রণালীর মূল ধরিয়া অন্বেষণ করা প্রাচীন পণ্ডিতগণের অবলম্বনীয় পথ। সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, এবং আধুনিক বিজ্ঞানে যাহা বলিতেছে, তাহাতে আপাতপ্রতীয়মান বৈষম্য দেখিয়াই প্রাচীন কথার অগ্রাহ্য করা একেবারে উচিত নহে।

এক্ষণে প্রাচীন মুনিগণ কি অর্থে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখা যাউক। আমরা আজ কাল যাহাকে মাটী জল তেজ বায়ু বা আকাশ বলি, পঞ্চ মহাভূত অর্থে তাহা বুঝায় না। আমরা যাহাকে মাটী বলিয়া বুঝি, তাহাও ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিতে গঠিত। যা কিছু স্থূল জড় পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, সকলেই এই পাঁচ মহাভূতের মিশ্রিত অবস্থা। হিন্দুশাস্ত্র মাত্রেই পঞ্চভূত সম্বন্ধে এই কথা পাওয়া যায়। যদি সকল জড় পদার্থই পঞ্চ ভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন, তবে অবিমিশ্র ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম কাহাকে বলে?

সাংখ্য শাস্ত্রমতে শব্দগুণ সমন্বিত আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই বায়ুর গুণ স্পর্শ, বায়ুর বিকারে তেজ উৎপন্ন হয়, সেই তেজের গুণ রূপ, তেজের বিকারে অপ্‌ উৎপন্ন হয়; সেই অপের গুণ রস এবং সেই অপের বিকারে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। সেই ক্ষিতির গুণ গন্ধ।

ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মতে প্রত্যেক স্থূল জড় পদার্থই যাহা রূপরসাদি পঞ্চ গুণ জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, এরূপ পাঁচটি উপাদান লইয়া গঠিত। একের গুণ,—গন্ধ, শাস্ত্রকারগণ মতে ইহারই নাম ক্ষিতি। অন্যের গুণ—রস, ইহারই নাম অপ্‌। অপরের গুণ—রূপ, ইহারই নাম তেজ। আর একটির গুণ—স্পর্শ, ইহারই নাম বায়ু এবং শেষ উপাদানটির গুণ—শব্দ, ইহারই নাম আকাশ।

হিন্দু শাস্ত্র সমূহ মতে প্রত্যেক স্থূল পদার্থই এই পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে গঠিত। অবিমিশ্র-ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম একটি একটি পৃথক্‌রূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করা কেবল

যোগযুক্তাত্মা যোগী জনেরই আয়ত্তাধীন। এই কথাটী প্রমাণ জন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"ক্ষিত্যপ্‌তেজোনিলখে সমুত্থিতে।
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে॥
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥"

তন্ত্রে যে সমস্ত যোগের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, যোগী প্রথমে ক্ষিতিতত্ত্বের উদ্ভাবন করিবেন। পরে সেই গন্ধগুণাত্মক ক্ষিতিতত্ত্ব অপ্‌তত্ত্বে লীন করিবেন। সেই অপ্‌তত্ত্ব তেজে এবং তেজস্তত্ত্ব বায়ুতে এবং বায়ুতত্ত্ব শব্দগুণাত্মক আকাশতত্ত্বে লীন করিয়া শব্দ-ব্রহ্মে-যুক্তাত্মা হইবেন।

শাস্ত্রোক্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজাদির অর্থ মাটী জল আগুন ব্যতীত যদি আর কিছু না হয়, তবে শাস্ত্র সমূহের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকলের অর্থই নাই। এবং এরূপ অর্থশূন্য বাক্য শাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া মূর্খতার পরিচয় দেওয়া শাস্ত্রকারগণের কখনই উদ্দেশ্য নহে।

পরিদৃশ্যমান্ জগতের সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান আছে, তাহা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জন্মিয়াছে। এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের রূপ রসাদি গুণ সকল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় এবং সেই সমস্ত গুণের আধার বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানটিই দ্রব্যজ্ঞান। প্রাচীন পণ্ডিতগণ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ এই ভিন্ন ভিন্ন গুণের ভিন্ন ভিন্ন আধার আছে বলেন, যথা গন্ধ গুণের আধার ক্ষিতি, রস গুণের

আধার অপ্, রূপ গুণের আধার তেজ, স্পর্শ গুণের আধার বায়ু এবং শব্দ গুণের আধার আকাশ। সমস্ত স্থূল জড় পদার্থই এই পাঁচ প্রকার দ্রব্যের সমষ্টিতে গঠিত, তবে কোন পদার্থে একের আধিক্য এবং কোনটিতে বা অপরের আধিক্য দেখা যায়। যথা উদ্ভিদ এবং জীব শরীরের স্থূল অংশ যাহা অল্পমাত্র বিকৃত হইলেই গন্ধ উদ্ভূত হয়, তাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক আছে। জল এবং উদ্ভিদের রস ইত্যাদি যাহা রসনার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই বিকৃত হওত আমাদের রসানুভব করায়, তাহাতে অপ্ পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে। যাহা না থাকিলে দ্রব্যের গন্ধগুণ থাকে না, তাহারই নাম ক্ষিতি; ক্ষিতি অর্থে মাটী নহে। যাহা না, থাকিলে দ্রব্যের রস গুণ থাকে না, তাহার নাম অপ্; যাহা না থাকিলে দ্রব্যের রূপ গুণ থাকে না, তাহার নাম তেজ; যাহা না থাকিলে দ্রব্যের স্পর্শ গুণ থাকে না, তাহার নাম বায়ু। (সাধারণতঃ আমরা বায়ু অর্থে যাহা বুঝি, তাহার সহিত পঞ্চভূতের মরুতে এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক আছে, যে বাতাস সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা তাহার গন্ধ রস বা রূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তাহার স্পর্শের উপর নির্ভর করে)। এবং যাহা না থাকিলে দ্রব্যের শব্দজ্ঞান জন্মে না, তাহারই নাম আকাশ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা বার্ত্তা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি নিবন্ধনই দ্রব্যের রূপরসাদি ভিন্ন ভিন্ন গুণ; সুতরাং ক্ষিতির অর্থ যদি এরূপ হয় যে—যাহা না থাকিলে দ্রব্যের গন্ধজ্ঞান জন্মায় না, তাহার নাম ক্ষিতি; তবে ক্ষিতিকে স্বতন্ত্র এক দ্রব্য না বলিয়া শক্তিবিশেষ বলাই যুক্তিসঙ্গত হয়।

ইহার উত্তর দিতে গেলে দ্রব্য (Matter) ও শক্তি এই দুই কথায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই বা কি বুঝেন এবং প্রাচ্য বিজ্ঞানই বা কি বুঝেন, তাহার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে এবং সে অনেক কথা, সুতরাং সে কথা এখন থাক্।

ক্ষিতিকে যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শক্তি বলিতে চান বলুন, তাহাতে বেশী ক্ষতি নাই; কিন্তু এই শক্তি কিরূপ, তাহাও ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রাচীন যোগিগণের প্রথম আলোচ্য পদার্থই এই পঞ্চ ভূত। যে যে শক্তি জন্য বা যে যে পদার্থ জন্য দ্রব্যের গন্ধাদি গুণ, সেই সেই শক্তির বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়াই সাংখ্য-যোগীর প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন ইলেক্‌ট্রিসিটি নামক পদার্থ বা শক্তি জন্য মেঘে বিদ্যুৎ খেলে, এই কথা বলিলেই তাড়িৎ শক্তি সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ যে শক্তি বশতঃ দ্রব্যের গন্ধ. তাহার নাম ক্ষিতি এই কথা বলিলেই ক্ষিতি তত্ত্ব সম্বন্ধে সব বুঝা হইয়াছে, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না।

ষ্টটগার্ডের ডাক্তার ইয়গার সাহেব গন্ধের হেতু যে পদার্থ, তৎসম্বন্ধে কতক পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর জীবনে উক্ত পদার্থ সারস্বরূপ। ডাক্তার ইয়গার এই পদার্থের ওডোরিজেন নাম দিয়াছেন। আমরা ক্ষিতি শব্দে যাহা বুঝা যায় বলিয়াছি, এই ওডোরিজেন শব্দেও তাহাই বুঝায়। ডাক্তার ইয়গারের মতে প্রত্যেক জাতীয় জীব-শরীরে এক রকম গন্ধদ্রব্য আছে, যাহা অন্য জাতীয় জীবশরীরস্থ গন্ধদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। মনুষ্যের শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য অন্যান্য পশু-শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু এক জন মনুষ্যের শরীরের গন্ধ অন্য মনুষ্যের শরীরের গন্ধ হইতে পৃথক্ হইলেও

এক রকম। মনুষ্যের রক্তে কোন দ্রাবক দিলে যেরূপ গন্ধ পাওয়া যায়, অন্য জীবের রক্তে দ্রাবক ঢালিলে সে রকম গন্ধ পাওয়া যায় না। খানিকটা রক্ত লইয়া তাহাতে কোন দ্রাবক ঢালিয়া দিয়া কেবলমাত্র গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা কোন্ জন্তুর রক্ত তাহা ঠিক করিতে পারা যায়। কেবল রক্ত কেন শরীরস্থ যে কোন অংশ লইয়া এবং তাহাতে কোন দ্রাবক ঢালিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সব স্থলেই একই রকমের গন্ধ পাওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা কোন্ জন্তুর শরীরের অংশ পরীক্ষা করা যাইতেছে, তাহা বুঝা যায়। এই সব দেখিয়া ডাক্তার ইয়গার বলেন যে, যে বিশেষ গন্ধদ্রব্য জীবশরীরে দেখা যায়, তাহাই জীবের জীবনের প্রধান কারণ। জীবশরীরে যে বিশেষ গন্ধদ্রব্য আছে, তাহা অন্ন আদি যে সকল দ্রব্য দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতেছে, তাহার গন্ধ হইতে পৃথক্। যে জীব এক রকম আহারে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ আহার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিলে তাহার শরীরের সেই বিশেষ গন্ধ যেমন তেমনই থাকে। সুতরাং এই গন্ধ অন্নপানীয়াদির গন্ধজনিত নহে। জীব জন্মকাল হইতেই সেই বিশেষ গন্ধদ্রব্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই গন্ধের সহিত যে সকল পদার্থের গন্ধের মিল আছে, তাহা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইতর জন্তুগণ গন্ধদ্বারা কোন্ দ্রব্য তাহাদের প্রাণধারণের উপযোগী এবং কোন্ দ্রব্য নয়, তাহা বুঝিয়া লয়।

বাইওলজিষ্ট্‌রা বলেন যে, জীবশরীরে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ নামে যে পদার্থ আছে, তাহাই আমাদের জীবনের কারণ; কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম উদ্ভিদশরীরেও যেরূপ, জন্তুগণের শরীরেও সেই-

রূপ এবং মনুষ্যশরীরেও ঠিক সেই রকম; অর্থাৎ রাসায়নিক এলিমেণ্ট সব প্রোটোপ্লাজমে সমান আছে, এবং তাহাদের আকৃতি আদিও সমান। তবে এক রকম প্রোটোপ্লাজম হইতে গাছ আর এক রকম হইতে মানুষ জন্মে কি রূপে? এ সম্বন্ধে বাইওলজিষ্ট্‌রা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু ডাক্তার ইয়গার বলেন যে, প্রোটোপ্লাজম সকল রাসায়নিক এলিমেণ্ট সম্বন্ধে এবং আকৃতি আদিতে পরস্পর বিভিন্ন না হইলেও এক জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম অন্য জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম হইতে বিভিন্ন। এক জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম যে গন্ধদ্রব্য-সমন্বিত,অন্য জাতীয় জীবের প্রোটো-প্লাজম সে গন্ধদ্রব্য-সমন্বিত নয়। এবং এই জন্যই একটি হইতে একরূপ জীব এবং অন্যটী হইতে অন্যরূপ জীব জন্মিয়া থাকে। এই সব কারণে তিনি দেখাইতে চান যে, তিনি যাহাকে (Odorigen) বলেন এবং প্রাচ্য পণ্ডিতগণ যাহাকে ক্ষিতি বলিয়াছেন, তাহা জীব-জীবনের সার ভাগ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ফুরণদ্বারা এক জাতীয় গন্ধ দ্রব্যের সহিত অন্য জাতীয় গন্ধ দ্রব্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ কাহার সহিত কাহার মিল আছে এবং কাহার সহিত কাহার মিল নাই,এই সমস্ত অনু-সন্ধান করিলে যে, জগতের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সামান্য সামান্য পশু সকল রোগ উপস্থিত হইলে গন্ধের সাহায্যে ঔষধ বাছিয়া লয়, কিন্তু আজকালকার ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য হতভাগ্যগণ ঔষধের গুণ জানিবার জন্য জন্তুগণের শরীরে তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়া অকাতরে কত কত জন্তুর প্রাণ সংহার করিতেছেন। ধিক্ এমন সভ্যতায়!

ডাক্তার ইয়গার যেমন ক্ষিতিতত্ত্বকে জীবের জীবনের সার স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ উহাকে ধাতু আদির সার ভাগ স্বরূপও বলেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক প্রত্যেক ধাতুর যে এক বিশেষ বিশেষ গন্ধ আছে, সেই জন্যই এক প্রকার ধাতু সর্ব্বদাই একই আকারে দানা বাঁধে এবং অন্য প্রকার ধাতু অন্যরূপ আকারে দানা বাঁধিয়া থাকে।

ডাক্তার ইয়গার যেমন ক্ষিতিতত্ত্বকে পদার্থ সমূহের সারাংশ স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, আর্য্যশাস্ত্রকারগণও সেইরূপ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পাঁচটিকেই জড় জগতের সারাংশ স্বরূপ স্থির করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি।

সম্মুখে র'য়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে
ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।

প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতি সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে
ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।

কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,
আসিবে যাইবে, হায়,
সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালবাসা।

তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম কানন,
তখনো রে কত লোকে
কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।

নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে
না-জানি ভাবিবে কা'রে!
না-জানি সে কি কাহিনী—কি সুখ—কি স্মৃতি!

দূর হতে আসিতেছে—শুন কান পেতে—
কত গান,'সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে!
কত যৌবনের হাসি,
কত উৎসবের বাঁশী,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে!

কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্ম্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল
ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস!

ওই দূর খেলাঘরে খেলাই'ছ কা'রা!
উঠেছে মাথার' পরে আমাদেরি তারা।
আমাদেরি ফুলগুলি
সেথাও নাচি'ছে দুলি,
আমাদেরি পাখীগুলি গেয়ে হল সারা!

ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা,
হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গণা!
আমাদের পানে, হায়,
ভুলেও ত নাহি চায়,
মোদের ওরা ত কেউ ভাই বলিবে না!

ওই সব মধু মুখ অমৃত-সদন,
না-জানি রে আর কা'রা করিবে চুম্বন!
সরমময়ীর পাশে
বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা ত শুনাব না প্রাণের বেদন!

আমাদের খেলাঘরে কা'রা খেলাইছ!
সাঙ্গ না হইতে খেলা
চ'লে এনু সন্ধে বেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙ্গে কোথা ফেলাইছ!

হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
মাটীতে কাটিয়া রেখা
কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন!

সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসি টুকু ফুটিয়া উঠিত!
তাই রে মাধবীলতা
মাথা তুলেছিল হোথা;

ভেবেছিনু চিরদিন রবে মুকুলিত।
কোথায় রে—কে তাহারে করিলি দলিত!

ওই যে শুকান ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
উহার মরম কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যে দিন ফুটেছিল,
নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত অনিলে!

ওই যে শুকায় চাঁপা প'ড়ে একাকিনী,
তোমরা ত জানিবে না উহার কাহিনী!
কবে কোন্ সন্ধেবেলা
ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবী রাগিণী!

যা'রে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চ'লে, সেত নেই আর!
একটু কুসুমকণা
তা ও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার!
কত সুখ, কত ব্যথা,
সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার!

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে যুগ যুগান্তর!

আদি ব্রাহ্ম সমাজ

ও

"নব হিন্দু সম্প্রদায়।"

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম, "একটি পুরাতন কথা।" বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্ন স্বাক্ষরকারী লেখক তাহার-লক্ষ্য।

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এপর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য।

তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্র বাবু আদি

ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখক-দিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লিখি-তেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্ব্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।

গত শ্রাবণ মাসে, "নবজীবন" প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গ-দর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালা-

গালির রকমটা দেখিয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া একটু নাড়া চাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—"র"। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।

নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম্ম—যে হিন্দু ধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড় পড়তায় মাসে একটা। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

প্রথম। তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটী প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার

প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয়। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় "নূতন ধর্ম্ম মত" ইতি-শীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা—সমালোচিত নহে—তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে তাহা জানি না, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। উহাতে "নাস্তিক" "জঘন্য কোমত মতাবলম্বী" ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক যিনিই হউন, বড় উদার-প্রকৃতি। তিনি উদারতা প্রবৃক্ত, ইংরেজেরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" প্রবন্ধ লেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন "যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্ম ধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসনা নহে। ঐ

ধর্ম্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গ দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গ দেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।" (তত্ত্ববোধিনী—ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা) ইহার পরে আবার নূতন হিন্দু ধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম. নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ, তত্ত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্য ভারতে. বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে,ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি, ইনি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের এক জন ভৃত্য—নাএব কি কি আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইহাঁর কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতেছি।

"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসন পত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষ রূপে আলোচনা কর—কাহারও অনুবাদের

প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন; বেবার, মেক্‌সমূ-লার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিওর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরি করিও না।"* নব্য ভারত—ভাদ্র, ২২৫ পৃষ্ঠা।

এখন, এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই, তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হই-য়াছে। গালি গালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়া বাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—"অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।" আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছো-হাটার ভাষা এতদূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা

* কৈলাস বাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তিনি জানিয়াছেন যে প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই তাঁহার লক্ষ্য। ২২৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা তাহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপত্রেও সে কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্র বাবু বলেন, যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন।

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে, কি আমাদের দেশের মুখ্য * লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতী—অগ্রহায়ণ—৩৪৭ পৃঃ)

সর্ব্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। হয় ত পাঠক

*বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন?

জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল! কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে, লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, "তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর।" কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই খানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্য্যন্ত; তার পর আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, "কোন খানেই মিথ্যা সত্য হয় না: শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণ স্বরূপ "একটি আদর্শ হিন্দু-কল্পনা" সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া

দেখিবেন, যে "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক জন সন্ধ্যা আহ্নিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাঁহার বাড়ী তাহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিয়াছি, "আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" ইহাতে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তার পর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?

এই দুইটি কথা "অসত্য" বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্ত্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকের বাক্য-বলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত, যে আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতি-বাদ করিতেছি, বলিয়া এত কথা বলিলাম।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। স্থূল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। "যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়।" এ কথার কোন অর্থ আছে কি? যদি বলা যায়, "একটা চতুষ্কোণ গোলক।" তবে অনেকেই বলিবেন, এমন

কথার অর্থ নাই। যদি রবীন্দ্র বাবু আমার উক্তি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না—আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে। ইহা অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া, ইহার উপর বক্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন।

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি, যাহাতে লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই অর্থটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গালিই তাঁহার উদ্দেশ্য—সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিবেন, "এমন কোন চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" ঠিক কথা, কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ করি নাই। মহাভারতীয় একটি কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি কি, রবীন্দ্র বাবু তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন, যে আমার কথার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন, "অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব? তুমি ত কোন নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।" কাজটা রবীন্দ্র বাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার পর, অনেক বার রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবার অনেক ক্ষণ ধরিয়া কথা বার্ত্তা হইয়াছে। কথাবার্ত্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই

হইয়াছে। এত দিন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি। রবীন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলে, অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন, অর্জ্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জ্জুন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কি না। অর্জ্জুন বলিলেন, না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া, অর্জ্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জ্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে "সত্য" রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে "সত্য"-চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তার পর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্ম্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে—সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে

করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি? না হয়, একটু বুঝাই।

রবীন্দ্রবাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত "সত্য". "মিথ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, *Truth*, মিথ্যা, *Falsehood*। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। "সত্য" "মিথ্যা" প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজি কথা আছে—"*Troth*"। ইহাই *Truth* শব্দের প্রাচীনরূপ। এখন, *Truth* শব্দ *Troth* হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ শব্দটিও এখনও আর বড় ব্যবহৃত হয় না। *Honour*, *Faith*, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাহা *Truth*—রবীন্দ্রবাবুর Truth তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না।

এক্ষণে রবীন্দ্রবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জ্জুনের উচিত ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে, যে আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন,—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে মত হয়; তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।

এ অর্থে "সত্য" "মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না, ভরসা করি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি কথার অর্থ তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না।

রবীন্দ্র বাবু, "সত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি—বরং আরও বশী গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকচি বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্য্যও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম।

এখন রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, "যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া,

আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি—তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল—আদিব্রাহ্ম-সমাজকে জড়াইতেছ কেন?” এই কথার উত্তরে, যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচি বিগর্হিত, যাহা Personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে, অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই! অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্র বাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্ম্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদিব্রাহ্মসমাজকে জড়ানতে, আমার কোন দোষ আছে কি না, বিচার করুন।

তাই, আদি ব্রহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার

একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ বিসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে, বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, অবশ্য করিবেন।

উপসংহারে, রবীন্দ্র বাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ, এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরে-

জির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক "Lie direct" সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্য্যতঃ সমুদ্র প্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে কালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, "Lie direct", সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না।* দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এই টুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এ টুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এইজন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

*দেবি চৌধুরাণীতে প্রসঙ্গ ক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি—১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

ধৰ্ম্ম এবং সাহিত্য।

আমি প্রচারের এক জন লেখক। তাহা জানিয়া, প্রচারের এক জন পাঠক, আমাকে বলিলেন, "প্রচারে অত ধৰ্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমোদের কথা না থাকিলে পড়িতে পারা যায় না।"

আমি বলিলাম, "কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় সীতারাম নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে।"

তিনি বলিলেন, "ঐ একটু সীতারাম বৈ ত নয়।"

তিন ফৰ্ম্মা প্রচার, তাহার কখন এক ফৰ্ম্মা সীতারাম, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও অপ্রচুর! তার পর তিন ফৰ্ম্মার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে কতকটা ভরিয়া যায়, ধৰ্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, যাঁহাদিগকে ধৰ্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধৰ্ম্ম কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে?

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। আপনা আপনি উত্তর স্থির করিলে তাঁহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া সে রূপ উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমরা তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারি।

সাধারণ ধৰ্ম্মশিক্ষকের দ্বারা ধৰ্ম্ম যে মূৰ্ত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থা-

পিত হইয়াছে, তাহা অপ্রীতিকর বটে। এ দেশে আধুনিক ধর্ম্মের আচার্য্যেরা যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেন, তাহার মূর্ত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম। গ্রীষ্মকালে, অতিশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফ জল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইল! জ্বর-বিকারের রুগ্ন শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি ঔষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোঁটা ব্রাণ্ডী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম্ম গেল!* আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট্ বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, তাহাকে সেই ব্রহ্মচর্য্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম্ম থাকে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্ম্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্ম্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণ-পতনে উপার্জ্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা। অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন, এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, ইহা সঙ্গত বটে।

যাঁহারা "শিক্ষিত" অর্থাৎ যাঁহারা ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাঁহারা এটাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানেন না, কিন্তু তাঁহারা আর

* অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি ঔষধ খান না।

এক বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা ইংরেজির সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটাও শিখিয়াছেন। সেজন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্ম্মে পরিপ্লুত। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম্ম নাম হইলে সেই ধর্ম্মই মনে করি। কিন্তু সে আর এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই খ্রীষ্টানের পরমেশ্বরকে মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর, এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বিশ্বসংসারের রাজা বটে, কিন্তু এমন প্রজাপীড়ক অত্যাচারী বিচারশূন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে না। তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্যকে অনন্তকাল-স্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক। নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক—যদি সে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ না করে। যে কখন খ্রীষ্ট নাম শুনে নাই, সুতরাং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। *যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে,তার সেই হিন্দু জন্ম তাহার দোষ নহে,* পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দোষ, তথাপি সে দোষে সে গরিবের অনন্ত নরক। যে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বর-কৃত জন্ম দোষে তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ এই যে,ইনি রাত্রি দিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপসঙ্কল্প করিল। যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্ম্মের আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া দিন কাটায়। পৃথিবীর কোন সুখই তাহাদের কাছে

আর সুখ নহে। যাঁহারা এই পৈশাচিক ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে যে তাঁহাদের গায়ে জ্বর আসিবে, ইহা সঙ্গত।

সাধারণ-ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধর্ম্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের এত অননুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্ম্মের সহজ মূর্ত্তি যেরূপ মনোহারিণী, সকল ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্মালোচনাতেই অধিক অনুরাগ সম্ভব। আমারও বিশ্বাস যে, জগতে তাহাই হইয়া থাকে; কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগুলি ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু খ্রীষ্টিয়ানের দোষে তাঁহাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূর্ত্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে,—আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি. ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে?

যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা

একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভা বড় খাটো হইয়া যায়।

পাঠক বলিলেন, "এ কথা সত্য হইতে পারে না, কেন না আমার নাটক নবেল পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই। কই, ধর্ম্ম প্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না।" ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এজন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কেন না তাহাতেই সুখ। সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী

হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এই রূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন সুখই লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্ম্মালোচনার যে অসীম, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয়, যে ধর্ম্ম-মন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও কর্কশ তত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত করি। অতএব আপাততঃ ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার প্রতি অনাদর করা অনুচিত।

গ্রাম্য কথা,—২য় সংখ্যা।

ধর্ম্ম-শিক্ষা।

I. THEORY.

"পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু।"

ছেলে। সে কাকে বলে, বাবা?

বাপ। এই যত স্ত্রীলোক পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয়।

ছেলে। তারা সবাই আমার মা?

বাপ। হাঁ বাবা, তা বৈ কি।

ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হলো, বাবা?

বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! পড়।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।"

ছেলে। অর্থ কি হলো, বাবা?

বাপ। পরের সামগ্রীকে লোষ্ট্রের মত দেখ্‌বে।

ছেলে। লোষ্ট্র কি?

বাপ। মাটীর ঢেলা।

ছেলে। বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়—মাটীর ঢেলার আর দাম কি?

বাপ। তা নয়। পরের সামগ্রী মাটীর মত দেখ্‌বে—নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।

ছেলে। বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখ্‌লে হয় না?

বাবা। ছি বাবা! তোমার কিছু হবে না দেখ্‌ছি। এখন পড়।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

ছেলে। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কি, বাবা?

বাপ। এই, আপনার মত সকলকে দেখ্‌বে।

ছেলে। তা হলেই ত হলো। যদি পরকে আপনার মত ভাবি, তা হলে পরের সামগ্রীকে আপনারই সামগ্রী ভাব্‌তে হবে, আর পরের স্ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাব্‌তে হবে।

বাপ। দূর হ! পাজি বেটা, ছুঁচো বেটা। (ইতি চপেটাঘাত)

II PRACTICE.

(১)

কাদম্বিনী নামে কোন প্রৌঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অধীতশাস্ত্র সেই বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ছেলে। বলি, মা!

কাদম্বিনী। কেন, বাছা! আহা ছেলেটির কি মিষ্ট কথা গো! শুনে কান জুড়ায়।

ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটি পয়সা দে না, মা!

কাদম্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা!

ছেলে। দিবিনে বেটি? মুখপুড়ী! হতভাগি! আঁটকুড়ি!

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে!

ছেলে। দিবিনে বেটি! (ইতি প্রহার এবং কলসী-ধ্বংস)

(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত)

বাপ। এ কি, রে বাঁদর?

ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমনি করেছি—"মাতৃবৎ পরদারেষু।" কই মাগি—বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলি নে?

(২)

ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল, যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান করা ভার, ছেলে দোকান লুঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে। গোয়ালা আসিয়া ক্ষীর ছানা সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল।

বাপ, তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। ছেলে বলিল, "মার কেন, বাবা!"

বাপ। মার্‌ব না? তুই পরের সামগ্রী লুটে পুটে আনিস্।

ছেলে। বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই ঢিল কুড়িয়ে জমা করেছি—পরের সামগ্রী ত ঢিল।

(৩)

সরস্বতী পূজা উপস্থিত। বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, "যা, একটা ডুব দিয়ে এসে অঞ্জলি দে—নহিলে খেতে পাবিনে।"

ছেলে। খেয়ে দেয়ে বিকেলে অঞ্জলি দিলে হয় না?

বাপ। তাও কি হয়? না খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয়, রে পাগল?

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জলি আর বছর একেবারে দিলে হয় না? এবার বড় শীত।

বাপ। তা হয় না—সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে কি বিদ্যা হয়?

ছেলে। একটা বছর কি ধারে বিদ্যা হয় না?

বাপ। দূর, মূর্খ! যা ডুব দিয়ে আস্‌গে যা। অঞ্জলি দেওয়া হ'লে দুটো ভাল সন্দেশ দেব এখন।

"আচ্ছা" বলিয়া ছেলে নাচিতে নাচিতে ডুব দিতে গেল। বড় শীত—তেমনি বাতাস—জল কন্‌কনে। তখন ছেলে, ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘাটে একটা পাঁচ বছরের বাগ্‌দীর ছেলে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া, গোটা দুই চুবানি দিল। তার পর, তাকে জল হইতে তুলিয়া টানিয়া বাপের কাছে ধরিয়া আনিল। বলিল, "বাবা! নেয়ে এসেছি।"

বাপ। কই বাপু,—কই নেয়েছ?

ছেলে। এই যে বাগ্‌দী ছোঁড়াটাকে চুবিয়ে এনেছি।

বাপ। বড় কাজই করেছ—তুই নেয়ে এসেছিস্ কই?

ছেলে। বাবা, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"-ওতে আমাতে কি তফাৎ আছে? ওর নাওয়াতেই আমার নাওয়া হয়েছে। এখন সন্দেশ দাও।

পিতা বেত্রহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন। পুত্র পলাইতে পলাইতে বলিতে লাগিল, "বাবা শাস্ত্র জানে না।"

কিছুপরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন, যে সে ওপাড়ায় শিরোমণি ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আবার এ কি করেছিস্?"

ছেলে। কি করি বাবা! তুমি ত ছাড়্‌বে না—বেত মারিবেই মারিবে। তাই আপনা আপনি সেই বেত খেয়েছি।

পিতা। সে কি রে বেটা?—আপনা আপনি কি? শিরো-মণি ঠাকুরকে মেরেছিস্ যে?

ছেলে। বাবা—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে কি আমি তফাৎ দেখি?

পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলেকে আর লেখা পড়া শিখাই-বেন না।

সীতারাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার শ্রীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাহাকে লইয়া এক নিভৃত ক্ষুদ্র বাটিকা মধ্যে গমন করিলেন, বলিলেন,

"আইস, বাছা! এখানে বড় জাগ্রত কালী আছেন, প্রণাম করিয়া যাই। তিনি মঙ্গল করিবেন।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রী দেখিলেন, গৃহ বড় নিভৃত, তাহার এক ঘরে এক কালী মূর্ত্তি, ফুল বিল্বপত্রে অর্দ্ধেক ঢাকা পড়িয়া আছেন। গৃহে কেহ নাই, কেবল এক অশীতিপর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। তিনিই দেবীর অধিকারিণী। চন্দ্রচূড়কে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল,

"তর্ক বাবা যে গো?"

চন্দ্র। কেমন মা! মার পূজা চলিতেছে কেমন?"

অশীতিপর বৃদ্ধার শ্রবণেন্দ্রিয় বড় তীক্ষ্ণ নহে। সে শুনিল, "তোমার বোন্‌পো আছে কেমন?" উত্তরে বলিল, "আজও জ্বর সারে নাই, তার উপর পেটের ব্যামো, মা কালী রক্ষা করিলে হয়।" চন্দ্রচূড় এই রূপ দুই চারিটা কথাবার্ত্তা বৃদ্ধার সঙ্গে কহিবাতে শ্রী বুঝিল—বুড়ী ঘোর কালা। চন্দ্রচূড় তখন শ্রীকে বলিলেন, "এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ঘরে তুমি আজ কাল থাক। তার পর গঙ্গারাম সুস্থির হইলে, আমি তোমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইব। তোমার নিজ বাড়ীতে এখন একা থাকিবে কি প্রকারে? বিশেষ মুসলমানের ভয়।"

শ্রী। ঠাকুর! মুসলমানের এ দৌরাত্ম্য কত কাল আর থাকিবে? শাস্ত্রে কি কিছু নাই?

চন্দ্র। কিছু না, মা। এ শাস্ত্রের কথা নয় মা। হিন্দুর গায়ে বল হইলেই হইল।

শ্রী। ঠাকুর! হিন্দুর গায়ে বলের কি অভাব? এই ত এখনই দেখিলেন?" বলিতে বলিতে শ্রী, দৃপ্তা সিংহীর মত ফুলিয়া উঠিল।

চন্দ্র। যা দেখিলাম মা, সে তোমারই বল—এমন কি আবার হইবে?

দৃপ্তা সিংহী লজ্জায় মুখ অবনত করিল। আবার মুখ তুলিয়া বলিল,

"হিন্দুর গায়ে বলের এত অভাব কেন? কত লোকের বলের গল্প শুনি।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় শ্রীর অলক্ষ্যে, শ্রীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "বেশ বাছা, বেশ! আমার মনের মত মেয়ে তুমি। আমিও সেই কথাটা ভাবিতেছিলাম।" প্রকাশ্যে বলিলেন,

"হিন্দুর মধ্যে বলবান্ কি নাই? আছে বৈ কি। কিন্তু তাহারা মুসলমানের মুখ চায়। এই দেখ সীতারাম—সীতারাম না পারে কি? কিন্তু সীতারাম রাজভক্ত—বাদশাহের অনুগৃহীত—অকারণে রাজদ্রোহী হইবে না। কাজেই কে ধর্ম্ম রক্ষা করে?"

শ্রী। কারণ কি নাই?

জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রী আবার লজ্জায় মুখ নামাইল। বলিল, "আমি অবলা—আপনাকে কেন এত জিজ্ঞাসা করিতেছি, জানি

না,—আমার মার শোকে, ভাইয়ের দুঃখে মন কেমন হইয়া গিয়াছে—তাই আমার জ্ঞান বুদ্ধি নাই।”

চন্দ্রচূড় সে কৈফিয়ৎটা কানেও না তুলিয়া, বলিলেন,

“কারণ ত ঘটে নাই। ঘটিলে কি হইবে বলিতে পারি না। সীতারাম যত দিন মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার প্রাপ্ত না হয়েন, বোধ হয় তত দিন তিনি রাজদ্রোহ-পাপে সম্মত হইবেন না।”

শ্রী অনেক ক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। চাতক পক্ষী যেমন মেঘের প্রতি চাহিয়া থাকে, তত ক্ষণ চন্দ্রচূড় তাহার মুখ প্রতি সেই রূপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। শ্রী বহুক্ষণ অন্যমনা হইয়া ভাবিতেছে, সংজ্ঞালক্ষণ নাই দেখিয়া, শেষে চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন,

“মা! তবে তুমি এক্ষণে এখানে বাস কর, আমি এখন যাই।

শ্রী কোন উত্তর করিল না—কথা তাহার কানে গিয়াছে, এমনও বোধ হইল না। চন্দ্রচূড় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—প্রতিভা কখন ফুটে, কখন নিবে, কখন স্থির, কখন আন্দোলিত, চন্দ্রচূড় তাহাতে চিনিতেন, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষায় নীরবে শ্রীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। শেষ, দেখিলেন, শ্রী সুস্থিরা, প্রফুল্লমুখী, ভাস্বর-কটাক্ষবিশিষ্টা হইল। তখন বুঝিলেন, এবার মেঘ বারিবর্ষণ করিবে—চাতকের তৃষা ভাঙ্গিবে।

শ্রী, অল্প ঘোমটা টানিয়া,—অল্প সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, “ঠাকুর! এখন কি একবার সে মাঠে যাওয়া যায় না?”

চন্দ্র। কেন? সেখানে এখন বিশেষ ভয়—চারি দিকে ফৌজ বেড়াইতেছে।

শ্রী। আমি সেখানে একটা কোন বিশেষ সামগ্রী হারাইয়া আসিয়াছি—আমার না গেলেই নয়। আপনি না হয়, এই খানে থাকুন, আমি একা যাইতেছি। কিন্তু আপনি আসিলে ভাল হইত।

চন্দ্র। যে সাহস তোমার আছে, সে সাহস কি আমার নাই? চল, তোমার সঙ্গে যাইব।

তখন, শ্রী আগে আগে চন্দ্রচূড় পিছে পিছে সেই মাঠে চলিলেন। সেখানে অনেক অশ্বারোহী পদাতিক বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল—এক জন আসিয়া চন্দ্রচূড়কে ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল,

"তোম্ কোন্ হো।"

চন্দ্র। এইত দেখিতেছ—ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। যজমানের বাড়ী পার্ব্বণের শ্রাদ্ধ—তাই গ্রামান্তরে যাইতেছি। কি করিতে হইবে বল—করি।

সিপাহী। আচ্ছা, তোম্ যাও—তোম্‌কো ছোড়্ দেতেহেঁ। যেহি আবরৎ* তোমারা কোন্ লগ্‌তী।

চন্দ্র। না বাপু—ও আমার কেহ হয় না।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় শ্রীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। জানেন, এখন শ্রীর বুদ্ধিতে চলিতে হইবে।

তখন সিপাহী শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"তোম্ কোন্ হো? বোল্‌কে ঘর যাও। হম্ লোগোঁকো হুকুম নেহি হৈ কে আবরৎ কে পকড়ে। স্রেফ্ এক বেওয়া কো হম্ লোগ্ ঢুণ্ড্‌তে হেঁ।"

* হিন্দিতে স্থানবিশেষে ব y মত ও ব w মত উচ্চারিত হইবে।

শ্রী। যে ঐ গাছের উপর দাঁড়াইয়া, তোমাদের দুর্দ্দশা করিয়াছিল?

সিপাহী। হাঁ—হাঁ—চণ্ডী বস্‌কী নাম হৈ।

শ্রী। চণ্ডী নাম নয়। চণ্ডী নাম হউক—আর যাই নাম হউক—আমিই সেই হতভাগিনী।

সিপাহী। (শিহরিয়া) কিয়া!!!

শ্রী। আমিই সেই হতভাগিনী।

সি। তোবা!! য়েসা মৎ বোলো মায়ি! তোম্ বহ্ নেহি। ঘর্ যাও।

শ্রী। তোমার কল্যাণ হউক—আমি ঘরে চলিলাম।

এমন সময়ে, আর এক জন সিপাহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আরে আবরৎ কো পকড়্তে হো কাহে?"

প্রথম সিপাহী দেখিল, বিপদ। যদি দ্বিতীয় সিপাহীর সঙ্গে স্ত্রীলোকটার কথাবার্ত্তা হয়, আর স্ত্রীলোকও যদি স্বীকার করে, তবে প্রথম সিপাহী বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা—প্রধান বিদ্রোহিনীকে ছাড়িয়া দেওয়ার অভিযোগ তাহার নামে হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব সেই দয়াদ্র্র সিপাহী অগত্যা বলিল,

"যেস্কি তোম্ ঢুণ্ড্তে হো সো যেহি হোতী হৈ।"

দ্বিতীয় সিপাহী। আল্লা আক্‌বর! চলো, চলো, বস্‌কী, হুজুর মে লে চলো—হম্ দোনোকে বখ্‌শিস্ মিল্‌যায়েগা।

প্রথম সিপাহী। ভাই! তোম্ লে যাও। হমারা কুছ্ কাম হৈ।

দ্বিতীয় সিপাহী এ কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল—শ্রীর ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া লইয়া চলিল। প্রথম সিপাহী বড়

বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই জনের নাম দুইটা বলা যাক—প্রথমের নাম, খয়ের আলি—দ্বিতীয়, পীর বক্স।

সিপাহীর কাছে ঘাড়-ধাক্কা খাইয়া শ্রী মৃদু হাসিল। তখন সে ডাকিয়া, চন্দ্রচূড়কে বলিল,

"ঠাকুর। যদি আমার স্বামীকে চেনেন, তবে বলিবেন, আমার উদ্ধার তাঁহার কাজ।"

শুনিয়া চন্দ্রচূড়ের চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা তুমিই ধন্যা।"

কোন পথে যাইতেছি?

যাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছি, তাহা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বর-প্রেরিত উপদেশ। তাঁহাদের কাজ বড় সোজা। অমুক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায়, আর তাহার তাৎপর্য্য এই, এই কথা বলিলেই তাঁহাদের কাজ ফুরাইল। খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, য়ীহুদী, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোম্‌ত, ব্রাহ্ম এবং নব্য হিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা এই মতের উদাহরণ স্বরূপ। ইহাঁরা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না স্বীকার করিলেন, তবে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে,

ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নহিলে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না—কিসের উপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবে? ধর্ম্মের এই নৈসর্গিক ভিত্তি কল্পিত অস্তিত্বশূন্য বস্তু নহে; যাঁহারা ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন।

উপস্থিত লেখক হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য নূতন ব্যাখ্যাকারদিগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আমি কোন ধর্ম্মকে ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করি না।* ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি। অথচ স্বীকার করি যে, সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

এই দুইটি কথা একত্রিত করিলে, পাঠক প্রথমে আপত্তি করিবেন যে, এই দুইটি উক্তি পরস্পর অসঙ্গত। হিন্দু ধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা হিন্দু ধর্ম্ম ঈশ্বরোক্ত বলিয়াই গ্রহণ করে। কেন না হিন্দুধর্ম্ম বেদমূলক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। যে ইহা মানিল না, সে আবার হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে কি প্রকারে?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, হিন্দুধর্ম্ম তাহার উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না মানিয়াও হিন্দু ধর্ম্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে।

যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে,

* যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।

হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক মূলের উপরে স্থাপিত। যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, "হিন্দু ধর্ম্ম তবে ধর্ম্মই নহে, মিথ্যা ধর্ম্ম।" আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, "ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দাও—বেদ নিত্য বা বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।"

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দু ধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্ম্মের সেই নৈসর্গিক মূল কি? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দু ধর্ম্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপিত।

প্রথমটি, অর্থাৎ ধর্ম্মের নৈসর্গিক তত্ত্ব, আমি নবজীবনে বুঝাইতেছি। দ্বিতীয়টি প্রচারে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমি নবজীবনে দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মের তিন ভাগ, (১) তত্ত্বজ্ঞান, (২) উপাসনা, (৩) নীতি। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, ঐ তিন ভাগই একে একে বুঝিয়া লইতে হয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, ইহাকেও আবার তিনটি পৃথক্ অবস্থায় অধীত করিতে হয়। (১) বৈদিক, (২) দার্শনিক, (৩) পৌরাণিক।

এই বৈদিক তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ। (১) দেবতাতত্ত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ত্ব, (৩) আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ সংহিতায়; আত্মতত্ত্ব উপনিষদে; ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়ে।

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যার গোড়ায় ঋগ্বেদ সংহিতার দেবতাতত্ত্ব। পাঠক এখন বুঝিয়াছেন যে, কেন আমরা ঋগ্বেদ সংহিতার দেবতাদিগকে লইয়া প্রচারে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছি।

পূর্ব্ব কয় সংখ্যার কয়টি বৈদিক প্রবন্ধে আমরা যাহা বলি-

য়াছি, তাহার মধ্যে ভরসা করি, পাঠকদিগের স্মরণ আছে। যথা, (১) বেদে বলে দেবতা মোটে তেত্রিশটি। অনেক আধুনিক দেবতা এই তেত্রিশটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন যে, তাঁহাদের উপাসনা এখন আর প্রচলিত নাই।

(২) সে তেত্রিশটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্য্য, নয় অগ্নি, নয় অন্য কোন নৈসর্গিক পদার্থ। তাঁহারা লোকাতীত চৈতন্য, অথবা এখানে যাঁহাকে দেবতা বলি—সে রূপ দেবতা নহেন।

(৩) ঐ নৈসর্গিক পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার বর্ণনা-গুলি ক্রমে বৈদিক এবং পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

(৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মহিমার পরিচায়ক এবং নিজেও মহান্ বা সুন্দর, অতএব সে সকল বস্তুর ধ্যানে ঈশ্বরে ভক্তি, এবং চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। এই অর্থে বৈদিক উপাসনা বিধেয়।

এই চারিটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ তত্ত্বের প্রমাণ এবং উদাহরণ স্বরূপ আমি অদিতি ও ইন্দ্রের কিছু বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু আর আর বৈদিক দেবতাগুলির প্রত্যেককে এইরূপ সশরীরে পরিচিত না করিলে, এই দেবতা-তত্ত্ব প্রমাণীকৃত বা প্রাঞ্জল হইয়াছে, এমত বিবেচনা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরুণাদির পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু সকলেরই তত সবিস্তারে পরিচয় আবশ্যক হইবে না। আবশ্যক হইলে দিব। দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত হইলে ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

পাঠককে এত দূরে আনিয়া আমরা কোন্ পথে যাইতেছি,

তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিতে পারেন।

বরুণাদি।

আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অদিতি* আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। বৃ ধাতু আবরণে। যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি, তখন তিনি অদিতি, যখন আকাশকে বৃষ্টিকারী ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে সর্ব্বাবরণকারী ভাবি, তখন আকাশ বরুণ।

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন. তিনি জলেশ্বর। ঋগ্বেদেও তিনি স্থানে স্থানে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাহার কারণ বেদে পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।† কিন্তু প্রাচীনকালে তিনি যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, গ্রীকদিগের মধ্যে Ouranos দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা অবগত আছেন যে, গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহার অনুল্লঙ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্ম্মে Ouranos আকাশ-দেবতা।

ঋগ্বেদে বরুণের বড় প্রাধান্য। তিনি সচরাচর সম্রাট্ ও

---

* এই প্রবন্ধ পড়িবার আগে, ইহার পূর্ব্বস্থিত প্রবন্ধটি পড়িলে ভাল হয়।

† যথা। "যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ পৃথীব্যামধি একাদশ স্থ। অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশ তে দেবাসো ইত্যাদি। ১, ১৩৯, ১১।

রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসকদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ ঋগ্বেদে বরুণের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরুণ ক্ষুদ্র দেবতা।

আর এক আকাশ-দেবতা "দ্যৌঃ"। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইনি গ্রীকদিগের "Zeus" এবং "Zeus pater" হইয়া রোমকদিগের Jupiter হইয়াছেন। Zeus ও Jupiter উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা। "দ্যৌঃ" এককালে আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইহাঁকে বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম "দ্যাবা পৃথিবী।" দ্যৌঃ পিতা—পৃথিবী মাতা। ইহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভবিষ্যতে বলিবার আছে। ইহারা যে আকাশ ও পৃথিবী, ইহাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না।

আর একটি আকাশ-দেবতা পর্জ্জন্য। ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন, ভূমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ইহাঁর প্রভেদ কেন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, বুঝাইতেও পারিলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, পর্জ্জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা প্রাচীন দেবতা। লিথুয়েনিয়া বলিয়া রুষ দেশের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের লোক আর্য্যবংশোদ্ভব। শুনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য। এমন কি বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ভাষা অনেক বুঝিতে পারেন। এই পর্জ্জন্যদেব, সেই প্রদেশে আজিও বিরাজ করিতেছেন। সেখানে নাম Perkunas. সেখা-

নেও তিনি বজ্রবৃষ্টির দেবতা। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদিম আর্য্যজাতি, ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় আধুনিক আর্য্য-জাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, পর্জ্জন্য তাঁহাদিগের দেবতা। ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইনি কেবল ভারত-বর্ষীয় দেবতা। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিলে তবে ইহাঁর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র পর্জ্জন্যের অনেক পরবর্ত্তী।

এক্ষণে সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলি। সূর্য্যদেবতাগুলি সংখ্যায় অনেক। যথা, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বিষ্ণু। সূর্য্যের সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। সূর্য্যকে প্রত্যহ দেখিতে পাই—তিনি কে তা জানি। অন্য সৌর দেবতাদিগের পরিচয় দিতেছি। যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী-শাখা চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তুতি আছে। তন্মধ্যে রাত্রি, উষা ও প্রাতস্তুতির পর পারম্পর্য্যের সহিত কতকগুলি সৌর দেবতার স্তুতি আছে। প্রথমে ভগ-স্তুতি। তার পর পূষার স্তুতি। তার পর অর্য্যমার স্তুতি। তার পর বিষ্ণুর স্তুতি। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণের অনুবাদের টীকায় ঐ মূর্ত্তি চারিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল—ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল—অর্থাৎ অরুণো-দয়ের পরেই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।"

"যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকাল-বর্ত্তী সূর্য্য।"

তার পর অর্য্যমা, অর্য্যমা অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লিখিতেছেন।

"পূষোদয়ের পরেই অর্কোদয় কাল—ইহার পরেই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকেই অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।"

"মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

ঋগ্বেদে পূষাকে অনেক স্থলেই "পশুপা" "পুষ্টিম্ভর" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে ভাবে এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে মূর্ত্তিতে সূর্য্য কৃষিধনের রক্ষাকর্ত্তা, পশুদিগের পাতা, পূষা সূর্য্যের সেই মূর্ত্তি। কিন্তু এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পূষা পথিকদিগের দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

যাহাই হউক, পূষা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না তিনি এক্ষণে আর হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত দেবতা নহেন।

এক্ষণে মিত্রের কথা বলি। মিত্র সূর্য্য, কিন্তু মিত্র বরুণের ভাই। বেদে যেখানে মিত্রের স্তুতি, সেই খানে বরুণের স্তুতি, —মিত্রাবরুণৌ বেদের দুইটী প্রধান দেবতা। আদিত্য শব্দ এই দুই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বরুণ আকাশ, তবে মিত্র সূর্য্য হইল কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদ-ব্যাকৃতং তে দেবা মিত্রাবরুণৌ অব্রুবন্ ইদং নো বিবা-সয়তামিতি মিত্রো অহরজনযদ্বরুণোরাত্রিং।" অর্থাৎ দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না—জগৎ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা

মিত্র বরুণকে বলিলেন—তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। মিত্র দিবা করিলেন, বরুণ রাত্রি করিলেন। ১। ৭। ১৬। ১। সায়না-চার্য্য বলিয়াছেন,"অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্য এব বরুণ ইতি উচ্যতে—স হি স্বগমনেন রাত্রির্জনয়তি।" "অস্তগামী সূর্য্যকে বরুণ বলে, তিনি আপনার গমনের দ্বারা রাত্রির সৃষ্টি করেন।" শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "অয়ং হি লোকো মিত্রঃ। অসৌ বরুণঃ।" অর্থাৎ ইহ-লোক মিত্র, পরলোক বরুণ। বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন যে, বরুণ সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, সেইখানে আলো হয়, নহিলে অন্ধকার, নহিলে বরুণ। আলো করেন মিত্র। সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্য্যজাতি মধ্যেও পূজিত। বরুণ যে গ্রীকদিগের Uranos তাহা বলিয়াছি। আবার তিনি প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন পারস্যদিগের প্রধান দেবতা অহুরমজ্দ। ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারস্যেরা সংস্কৃত স স্থানে হ উচ্চারণ করে।—যথা সিন্ধু স্থানে হিন্দু, সপ্ত স্থানে হপ্ত। তেমনি অসুর স্থানে অহুর। এখন সুরাসুর শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহা-দিগের কথার তাৎপর্য্য এই,অসুরেরা দেবতাদিগের বিদ্বেষী,*কিন্তু আদৌ অসুরই দেবতা। অসু নিশ্বাসে। অসু ধাতুর পর র প্রত্যয় করিয়া "অসুর" হয়। অর্থাৎ আকাশে সূর্য্যে পর্ব্বতে নদীতে যাঁহাদিগকে প্রাচীন আর্য্যেরা শক্তিশালী লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন,তাঁহারাই অসুর। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ "অসুর" বলা হইয়াছে। এই অহুর মজ্দ নামের

* অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে।

অহুর শব্দের তাৎপর্য্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অহুরমজ্দ বরুণ। ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ইহার আনুষঙ্গিক দেবতা মিথ্রু যে বরুণের আনুষঙ্গিক মিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ অল্পই। মিত্র সম্বন্ধে আর একটি রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে এই মিথ্রুদেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আসিয়ার পশ্চিমভাগ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বরাজ্য মধ্যে ঐ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবটি উঠিয়া গেল না। উৎসবটি শেষে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্টমাসে (Christmas) পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজি এত গাঁদাফুল ও কেকের শ্রাদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা জানুন বা না জানুন, মানুন বা না মানুন, এ উৎসব আদৌ আমাদের মিত্রদেবের উৎসব। নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।*

* The Roman winter solstice festival as celebrated on December 25 (VIII.Kal. Jan,) in connexion with the worship of the Sun-God Mithra, appears to have been instituted in this special form by Aurelian about A. D. 273, and to this festival the day owes its apposite name of Birth-day of the Unconquered Sun, "Dies Natalis Solis Invicti." With full symbolic appropriateness, though not with historical justification, the day was adopted in the Western church, where it appears to have been generally introduced in the fourth century, and whence in time it passed to the Eastern Church, as the solemn anniversary of the birth of Christ, the Christian Dies Natalis, Christmas Day. Attempts have been made to ratify this date as a matter of history, but no valid or even consistent Christian tradition vouches for it. The real origin of the festival is clear from the writings of the Fathers after its institution. In religious symbolism of the material and spiritual Sun, Augustine and Gregory of Nyassa discourse on the glowing light

আবার সেই মিত্রদেবের উৎসবই বা কি? সেটা সূর্য্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও সে উৎসব আছে—"মকর সংক্রান্তি"—যে দিন সূর্য্যের মকর রাশিতে সঞ্চার হয়। বাস্তবিক এখনকার "মকর সংক্রান্তি", আর যে দিন সূর্য্যের মকরে যথার্থ সঞ্চার হয়, সে এক দিনই নয়—মকরে প্রকৃত সঞ্চার, "মকর সংক্রান্তি" হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ "Precession of the Equinoxes." জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা করিতে পারিবেন, কত দিনে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের "মকর সংক্রান্তি" পোষ পার্ব্বণ ও "খ্রীষ্টমাস" একই। কথাটা "আষাঢ়ে" রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছু ছিদ্র নাই।

---

and dwindling darkness that follow the Nativity, while Leo the Great, among whose people the earlier Solar meaning of the festival remained in strong remembrance, rebukes in a sermon the pestiferous persuasion, as he calls it, that this solemn day is to be honoured not for the birth of Christ, but for the rising, as they say, of the new Sun.

Tylor's Primitive Culture, Vol II, p. 297—8.

টেলর সাহেব নোটে, প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সে প্রমাণগুলি বিস্তারিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা তাঁহার ঐ নোটের লিখিত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিবেন। নোটে ছয় খানি গ্রন্থের নাম আছে।

গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি।

১। রামবল্লভ বাবুর ভিক্ষা-দান।

আমি বাবাজির চেলা, এবং ভিক্ষার ঝুলির বর্ত্তমান অধিকারী। বাবাজির গোলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি ভিক্ষা করিয়া নানা রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভিন্ন আর কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমাকে সেগুলি দিয়া গিয়াছেন। আমিও খয়রাৎ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। আগে নিমুনা দেখাই।

একদা বাবাজির সঙ্গে রামবল্লভ বাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমরা "রাধে গোবিন্দ" বলিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলাম। রামবল্লভ বাবু ব্যাঙ্গ করিয়া বলিলেন,

"বাবাজি! একবার হরিনাম কর!"

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রামবল্লভ বাবু হরিনামের কি ধার ধারেন! কিন্তু হরিপ্রেমে গদ্গদ বাবাজি তখনি একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন,

"তুমি কোথায় হে! দয়াময় হরি! একবার দেখা দাও হরি!—"

গীত আরম্ভ হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার হরি কোথায়, বাবাজি?"

আমি মনে করিলাম, প্রহ্লাদের মত উত্তর দিই, "এই স্তম্ভে।" ইচ্ছা করিলাম, প্রভু স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাড়িয়া ফেলুন—নরসিংহের হস্তে

নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি। কিন্তু আমি প্রহ্লাদ নহি, চুপ করিয়া রহিলাম। বাবাজি, বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,

"হরি কোথায়! তা আমি কি জানি! জানিলে কি তোমার কাছে আসি? তাঁহারই কাছে যাইতাম।

রামবল্লভ। তবু, তাঁর একটা থাক্‌বার যায়গা কি নাই? হরির একটা বাড়ী ঘর নাই?

বাবাজি। আছে বৈ কি? তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন।

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি?

বাবাজি। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর।

বাবু। নিকট তবে কার?

বাবাজি। যাহার কুণ্ঠা নাই।

বাবু। কুণ্ঠা কি?

বাবাজি। বুঝেছি—কালেজের সাহেবেরা টাকাগুলা ঠকাইয়া লইয়াছে। আমাকে দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম। এখন, অভিধান খোল।

বাবু। ঘরে অভিধান নাই। এক জন চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাবাজি। অভিধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?

বাবু। অহো—সেই কুণ্ঠা! কুণ্ঠা—কুণ্ঠিত। যেখানে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ?* এমন স্থান কি আছে?

বাবাজি। বাহিরে নাই—ভিতরে আছে।

* বাবাজির ব্যাকরণ অভিধানে কত দূর দখল বলিতে পারি না। বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর একটি নাম। পণ্ডিতেরা বলেন, বিবিধা কুণ্ঠা মায়া যস্য স বৈকুণ্ঠঃ।

বাবু। ভিতরে—কিসের ভিতরে?

বাবাজি। মনের ভিতরে। যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে, যে, ইহ জগতের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না—যখন, চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ,—তখন তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে।

বাবু। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছু নয়—কেবল মনের অবস্থা মাত্র। তবে না বিষ্ণু সেখানে বাস করেন?

বাবাজি। কুণ্ঠাশূন্য, নির্ব্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেই খানে বাস করেন। বৈরাগীর হৃদয়ে তাঁহার বাসস্থান—এই জন্য তিনি বৈকুণ্ঠনাথ।

বাবু। সে কি? তিনি যে শরীরী। যাঁর শরীর আছে, তাঁর একটা বাসস্থান চাই।

বাবাজি। শরীরটা কি রকম বল দেখি?

বাবু। তাঁকে তোমরা চতুর্ভুজ বল।

বাবাজি। তা বটে। তাঁহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি কি আছে!

বাবু। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।

বাবাজি। একে একে। আগে পদ্মটা বুঝ। কিন্তু বুঝিবার আগে মনে কর, ঈশ্বর করেন কি?

বাবু। কি করেন?

বাবাজি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সৃষ্টি-বাদ দুই রকম আছে। এক মত এই যে, আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান সৃষ্ট করিয়া পরে তাহাকে রূপাদি

দিয়াছেন। আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর কল্পে কল্পে তাহা রূপাদিবিশিষ্ট করেন। এই দ্বিতীয়-বিধ সৃষ্টির শক্তি, জগতের কেন্দ্রে। শুনিয়াছি, সাহেবদেরও না কি এমনই একটা মত আছে।* সৃষ্টির মূলীভূত এই জগৎ-কেন্দ্র হিন্দু শাস্ত্রে নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতিমা।

বাবু। আর তিনটা?

বাবাজি। গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। শঙ্খ ও চক্র, স্থিতি-ক্রিয়ার প্রতিমা। জগতের স্থিতি স্থানে ও কালে। স্থান, আকাশ। আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই শব্দময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরূপ বিষ্ণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে।

বাবু। আর চক্র?

বাবাজি। উহা কালের চক্র। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে কাল বর্ত্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চক্রাকারে আছে। আকাশ, কাল, শক্তি ও সৃষ্টি, জগদীশ্বর চারি ভুজে এই চারিটি ধারণ করিতেছেন। এখন বুঝিলে, বিষ্ণুর শরীর নাই। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কুণ্ঠাশূন্য ভয়মুক্ত বৈরাগী, ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা বলিয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে।

বাবু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রূপ-কল্পনা কেন?

বাবাজি। সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের; তবে আবার একটা মাস্তুল খাড়া করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? পৃথিবীর সবই এইরূপ কল্পনাতে

* La Placian hypothesis.

চলিতেছে; তবে আমার মত মূর্খের ভক্তির পথে কাঁটা দিবার এত চেষ্টা কেন?

বাবু। আচ্ছা, যথার্থই যদি বিষ্ণু অশরীরী, তবে নীলবর্ণ কার? অশরীরীর অবার বর্ণ কি?

বাবাজি। আকাশের ত নীলবর্ণ দেখি—আকাশ কি শরীরী? ভাল, তোমাদের ইংরেজি শাস্ত্রে কি বলে? জগৎ অন্ধকার না আলো?

বাবু। জগৎ অন্ধকার।

বাবাজি। তাই বিশ্বরূপ বিষ্ণু নীলবর্ণ।

বাবু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্য্যও আছে—আলোও আছে।

বাবাজি। বিষ্ণুর হৃদয়ে কৌস্তভমণি আছে। কৌস্তভসূর্য্য বনমালা গ্রহ নক্ষত্রাদি।

বাবু। ভাল, জগৎই কি বিষ্ণু?

বাবাজি। না। যিনি জগতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষ্ণু। জগৎ শরীর, তিনি আত্মা।

বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর তাঁর আবার দুইটা বিয়ে কেন? বিষ্ণুর দুই পরিবার, লক্ষ্মী আর সরস্বতী।

বাবাজি। অভিধান কিনিয়া পড়িয়া দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য্য। শ্রী, রমা প্রভৃতি লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বিষ্ণু সৎ, সরস্বতী চিৎ, আর লক্ষ্মী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে প্রণাম কর্।

সর্ব্বনাশ! রামবল্লভ বাবুকে, তাঁহার স্বভবনে, "রে মূর্খ!" সম্বোধন! রামবল্লভ বাবু তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন, "মারো বদ্‌জাত্‌কো!"

আমি বাবাজির ঝুলি ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়া দুই জনে সরিয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"বাবাজি! আজিকার ভিক্ষায় পেলে কি?"

বাবাজি বলিলেন, "বদ পূর্ব্বক জন ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া যা হয়, তাই। ভিক্ষার ধনটা ঝুলির ভিতর লুকাইয়া রাখ।"

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

ঢোল কাড়া।

রামচাঁদ। ও ভাই শ্যামচাঁদ!

শ্যামচাঁদ। কি, দাদা!

রাম। ওরে সাপ রে!

শ্যাম। বাপ রে!

রাম। ওরে ঘরের ভিতর সাপ!

শ্যাম। কি দুর্দ্দৈব! কি হতভাগ্য! কি মনস্তাপ!

রাম। এখন কি করি?

শ্যাম। আমি যে ভয়ে মরি।

রাম। ওরে কালাচাঁদকে ডাক্।

শ্যাম। ও কালাচাঁদ! ও গোরাচাঁদ! ওরে সবাই ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাক্।

কালাচাঁদ। কি হয়েছে?

রাম। সাপ।

শ্যাম। বাপ!

রাম। ঘরে।

কালা। এখন কে ধরে!

শ্যাম। সাপ কি আবার ধরে? কাম্‌ড়াবে না? ধরাধরি কি?

রাম। তবে করি কি?

গোরাচাঁদ। আমি এক উপায় বলি। এখনই মনসাপূজা আরম্ভ কর। মনসা সাপের দেবতা।

শ্যাম। সেই আসল কথা।

রাম। ওরে তবে মনসা পূজো কর্। ঠাকুর সাজা।

কালাচাঁদ। বাজনা বাজা।

শ্যাম। কই বাজনা? ওরে ঢোল!

ঢোল। হাঁ! হাঁ! তাক্ তাক্সিন্! কিসের গোল?

শ্যাম। মনসা পূজো।

ঢোল। আমি বলি দশভুজো।

শ্যাম। তা হোক্, তুই বাজ্।

ঢোল। তা বাজি—আমার ত সেই কাজ। তাক্ তাক্সিন্! কাঁশী কই?

শ্যাম। ও কাঁশী!

কাঁশী। এই আসি। ঠ্যাং ঠ্যাং না ঠ্যাং না ঠ্যাং!

রাম। ওরে ঢাক!

ঢাক। হাঁ! হাঁ! ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং! কিসের জাঁক?

রাম। তুই বাজ্, ওরে কাড়া!

কাড়া। হাঁ! হাঁ! চড় চড়া!

রাম। একবার জাগিয়ে দে পাড়া।

শ্যাম। ওরে সানাই!

রাম। হাঁ!—"ব্রজ ত্যেজে, কোথা যাও, রে কানাই!"

কালাচাঁদ। একবার সবাই মিলে বাজা।

(ঘোরতর বাদ্যোদ্যম)

রাম। এসো, আমরা এই সঙ্গে নাচি।

সবাই। এসো নাচি।

(ঘোরতর নৃত্য)

রাম। বল, জয় মনসা দেবি!

শ্যাম। বল, জয় মনসা দেবি!

সবাই। বল, জয় মনসা দেবি!

রাম। আস্তীকস্য মুনেঃ মাতা মনসা দেবি নমোস্তুতে!

শ্যাম। জরৎকারোঃ মুনেঃ পত্নী মনসা দেবি নমোস্তুতে।

সবাই। মনসা দেবি নমোস্তুতে।

(ঘোরতর গণ্ডগোল—এক জন প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতিবাসী। ব্যাপার কি? এত ঢোল কাড়া কিসের?

রাম। মনসা পূজো।

প্রতি। এত রাত্রে মনসাপূজা কেন? লোকের যে ঘুম হয় না?

রাম। সাপ বেরিয়েছে। তাই মনসা পূজা করি, মা সাপের ভয় হইতে রক্ষা করিবেন।

প্রতিবাসী। তা সাপটা কি হলো?

রাম। কি হলো শ্যাম—জান?

শ্যাম। তাই ত!

কালা। সে বাজনার চোটে এতক্ষণ গর্ত্তের ভিতর গেল।

গোরা। সে গর্ত্তের ভিতরে গিয়া বাজনার চোটে ম'রে থাক্‌বে।

প্রতিবাসী। সম্ভব, কিন্তু লোকের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে, সাপটা ধর্‌লে হতো না?

রাম। বাপ রে! সাপ কি ধরে?

শ্যাম। সর্প যে বাস্তু দেবতা।

কালা। সর্প অজগর।

গোরা। সর্প বাসুকী।

প্রতিবাসী। তা হোক, কিন্তু আবার বেরোবে যে।

সবাই মিলিয়া। বেরোয় বেরোবে, আমরা ত নেচে নিলাম।

লর্ড রিপণের উৎসবের জমা খরচ।

এ উৎসবে আমরা পাইলাম কি? হারাইলাম কি? যে সঞ্চয়ী লোক, সে সকল সময়ে আপনার জমা খরচটা খতাইয়া দেখে। আমাদের জাতীয় জমা খরচটার মধ্যে মধ্যে কৈফিয়ৎ কাটিয়া দেখা ভাল। আগে দেখা যাউক, আমাদের লাভের অঙ্কে কি?

প্রথমতঃ, আমরা এ উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজভক্তি। অনেকে বলিবেন, আমাদের রাজভক্তি ছিল বলিয়াই, উৎসব

করিয়াছি। সকলেই বুঝেন যে, ঠিক তাহা নহে; অন্য কারণে এ উৎসব উপস্থিত হইয়াছে। উৎসবেই আমাদের রাজভক্তি বাড়িয়াছে। রাজভক্তি; বড় বাঞ্ছনীয়। রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ। রাজভক্তির জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে, রাজা স্বয়ং একটা ভক্তির যোগ্য মনুষ্য হইবেন। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ্ বা প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক, এতদুভয়ের কেহই ভক্তির যোগ্য ছিলেন না। এরূপ নৃশংস-চরিত্র নরনারী পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি ইংলণ্ডের উন্নতির একটি কারণ। ফ্রেড্রিকের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি প্রুষিয়ার উন্নতির একটি কারণ।

আমাদের দ্বিতীয় লাভ,জাতীয় ঐক্য। এই বোধ হয়, ঐতিহাসিক কালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা এক জাতি।

তৃতীয় লাভ, রাজকীয় শক্তি। রাজকীয় শক্তি কতকটা ঐক্যের ফল বটে, কিন্তু ঐক্য থাকিলেই যে শক্তি থাকে, এমত নহে। সকল সমাজেই, সমাজই রাজা। রাজা সমাজ শাসন করেন বটে, কিন্তু সে সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। সমাজ রাজার উপর আবার রাজা। কেবল সমাজ রাজার দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তা। যে সমাজ রাজাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিয়া থাকে, সেই সমাজেরই রাজনৈতিক শক্তি আছে। প্রকৃত রাজদণ্ড সেই সমাজেরই হাতে। আজ, লর্ড রীপণকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা।

আমাদের চতুর্থ লাভ,—এটুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ;—সমাজের কর্ত্তৃত্ব ভূম্যাধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে বুদ্ধি-বিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালায় ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কর্ত্তা। ইহা সমাজের পক্ষে

বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নতির লক্ষণ, এবং উন্নতির সোপান। এখনকার নূতন সমাজনেতৃগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সুপথে চালাইবেন, বিপ্লব না ঘটে।

এই গেল লাভের অঙ্ক জমা। এক্ষণে খরচটা দেখা যাউক।

আমাদের প্রথম ক্ষতি এই যে, এ উৎসবে দ্বেষক ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈরিতা বড় বাড়িয়া উঠিল। মুখে যিনি যাহা বলুন, তাঁহারা এ উৎসব কখন মর্জ্জনা করিবেন না। তাঁহাদের সঙ্গে আর গোল মিটিবে না। ইহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, কিছু "ষ্টীম" ছাড়া হইয়াছে, যে সঞ্চিত বলে সমাজ-যন্ত্র দ্রুতবেগে চলিবে, তাহার কিছু বেশী ব্যয় হইয়াছে। সেটা নিতান্ত মন্দও হয় নাই। বড় বেশী ষ্টীম জমিলে বিপ্লব উপস্থিত হয়।

আমাদের তৃতীয় ক্ষতি এই যে, গলাবাজির দৌরাত্ম্যটা বড় বাড়িয়া গেল। কথার ছড়াছড়ি বড় বেশী হইয়া গিয়াছে। সেটা কুশিক্ষা। একে ত বাঙ্গালী সহজেই কেবল বাক্য-বাহাদুর। তার উপর বক্তৃতা নামে বিলাতি মালের আমদানি হইয়াছে। সোণা বলিয়া সোয়াসা বিক্রয় হইতেছে। আমাদের ভয়, পাছে আপনাদের বাক্‌জালে আপনারাই জড়াইয়া পড়ি, কথার কুয়াশায় আর পথ দেখিতে না পাই; তুবড়ী বাজির মত মুখে সোঁ সোঁ করিয়া ফাটিয়া যাই।

সে যাহাই হৌক, খরচের অপেক্ষা জমা যে বেশী, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। খরচগুলি ছোট ছোট, লাভগুলি বড় বড়। উৎসবে আমরা মুনাফা করিয়াছি, এখন রেখে ঢেকে চালাইতে পারিলেই হয়। তবে লাভ কি লোক্‌সান কি, তাহা না বুঝিয়া, "বেড়ে হয়েছে! বেড়ে হয়েছে!" বলিয়া বেড়ান, জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ভাল নহে।

মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ।

মনুষ্য নিজে তাহার জ্ঞান ও বিচারশক্তি চালনা দ্বারা মনুষ্যত্বের যত দূর উন্নত অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, সেইরূপ উন্নত দশায় উঠিতে সতত চেষ্টা করিলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারিবে। সেই কল্পিত আদর্শ পুরুষের যেরূপ মুখশ্রী হইতে পারে, স্বরের যেরূপ মাধুর্য্য সম্ভব, আন্তরিক ভাব সমূহের বিকাশ যত দূর সুন্দর হইতে পারে, সেইরূপ মুখশ্রী, সেইরূপ মধুর স্বর, সেইরূপ আন্তরিক ভাব সমূহ অনবরত চিন্তা দ্বারা আপনাকে সেইরূপ মধুর স্বর, সেইরূপ মুখশ্রী ও সেই সেই সমস্ত সুন্দর ভাবসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আপনাকে উন্নত অবস্থায় তুলিতে তুলিতে যখন নিজের প্রকৃতিকে ঈশ্বরের পরা প্রকৃতির সহিত একতানে লয় করিতে পারিবে, তখনই আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ঈশ্বর কি তাহা বুঝিতে পারিবে।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের চিত্তের ভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সুতরাং পরমোন্নত পুরুষ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি যাহাকে যথার্থ উন্নত পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিব, তাহা অপর এক জনের কল্পনানুযায়ী না হইলে হইতে পারে, এই জন্য নিজের কল্পনানুযায়ী আদর্শ বর্ণনা দ্বারা কাণা হইয়া কাণাকে পথ দেখাইতে চাহি না। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষগণ মনুষ্যের যেরূপ অবস্থাকে যথার্থ উন্নত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই অবস্থা কিরূপ, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

ঈশ্বরের যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ লোককেই যথার্থ উন্নত পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন। যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন এবং আপনাতেই সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে। এরূপ জনের কাছে বর্ণ-বিচার নাই—এরূপ জনের কাছে পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, ধাতু মৃত্তিকা, দেব গন্ধর্ব্বাদি সম্বন্ধে প্রভেদ-জ্ঞান নাই—ইনিই যথার্থ অদ্বৈতবাদী। "একমেবাদ্বিতীয়ং" কথার অর্থ ইনিই বুঝিয়াছেন। ইনিই যথার্থ ব্রহ্মোপাসক।

'আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিবে' এই কথাটির ভিতর যে গূঢ় অর্থ আছে, তাহা অনেকেই বোধ হয় ভাবেন না। সমস্ত বেদের, সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা ঐ কয়টি কথায় নিহিত রহিয়াছে। যোগই বল, যাগই বল, তপস্যাই বল, আর মনুষ্যত্বই বল, সবই ঐ কয়টি কথার ভিতর রহিয়াছে।

এই জগতে সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত। পরের জন্য কয়টা লোক ভাবে? পরের জন্য লোক ভাবে না বলিয়াই জগতে সুখ এত কম। এই জন্যই সকল ধর্ম্মে শিক্ষা দেয় যে, যেমন নিজের জন্য ব্যস্ত হও, সেইরূপ পরের জন্যও ব্যস্ত থাকিও। এই শিক্ষা অতি উচ্চতর নীতি-শিক্ষা সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে যাহা শিক্ষা দেয়, তাহা উচ্চতম শিক্ষা। নিজের জন্য যেমন ভাব, পরের জন্য তেমনি ভাবিও, এই নীতিতে নিজ ও পরে প্রভেদ জ্ঞান রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে সেই

প্রভেদটুকুও রাখিতে চায় না। হিন্দুদের উন্নত দশার আদর্শ-পুরুষের কাছে আমি ছাড়া অন্য কেহ থাকা সম্ভব নয়। কেন না এই উন্নত পুরুষ 'আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ' দেখিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শপুরুষ পরের জন্য ভাবেন না, নিজের জন্য ভাবেন, কিন্তু তাঁহার সেই নিজের জন্য ভাবনা-তেই জগতের সর্ব্বভূতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়।

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং' কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিলেই দেখা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কত দূর উন্নতমনা ছিলেন। আমার আমি-জ্ঞান আমার আন্তরিক ভাব সমূহের সমষ্টি জ্ঞান। অর্থাৎ আমার দেহে আঘাত করিলে কষ্ট হয়, আমার ক্ষুধার সময় খাইতে না পাইলে কষ্ট হয়, স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিলে মন সন্তুষ্ট হয় ইত্যাদি আমার আন্তরিক সমস্ত ভাবের সমষ্টি লইয়া আমার আমি-জ্ঞান। কিন্তু এই ভাব সমূহ সাধারণ জনগণের পক্ষে বড়ই সঙ্কীর্ণ, এই জন্য সাধারণের "আমি-জ্ঞান'টিও বড় সঙ্কীর্ণ। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়া-দিতেই সাধারণতঃ এই আমি-জ্ঞান দেখা যায়। কিন্তু আমাদের আদর্শ-পুরুষের কাছে আমাদের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, এই বিশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সহিত তাঁহারও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং আমরা সাধারণে যেমন আপনাদিগকে আমাদের দেহস্থ বিবেচনা করি, তিনিও সেইরূপ আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

নিজের অহংজ্ঞান যতই বিস্তীর্ণ করিবে, ততই মনুষ্য উন্নত-দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। আমার অহংজ্ঞান কেবলমাত্র নিজের চক্ষুকর্ণনাসাদি ইন্দ্রিয়গুলিতে না রাখিয়া অন্য ভূতে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবার শিক্ষা কেবল হিন্দু-উপাসনা-প্রণালী-

তেই দেয়। হিন্দু উপাসক উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে "সোঽহং" সেই আমি, এই জ্ঞান যাহাতে জন্মায়, তাহাই অভ্যাস করিয়া থাকেন। আমার সহিত আমার হস্তপদাদি ও মনের সহিত একটি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি আমি অনুভব করিতে পারি বলিয়াই আমার হস্তপদাদি ও মনে, আমার অহংজ্ঞান জন্মিয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, আমার সহিত সমস্ত বিশ্বের ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অনুভব-শক্তির বিকাশে মানব সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবে। অমনই মানবের অহংজ্ঞান সর্ব্বভূতে জন্মিবে। আমার সহিত জগতের সেই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহারই পর্য্যালোচনায় হিন্দু-ঋষিগণ তাঁহাদের দীর্ঘজীবন যাপন করিতেন।

হিন্দু-ঋষিগণ যাহাকে যোগ বলিয়া গিয়াছেন, নিজের অহংজ্ঞানের সহিত এই জগতের যোগই ইহার অর্থ। যে ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তিতে জগৎ চলিতেছে, সেই সেই ঐশ্বরিক শক্তির ক্রিয়া মানব চেষ্টা করিলে আপনাতেই দেখিতে পান। হিন্দু-ঋষিগণ এই জন্য মনুষ্যকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আপনাতে অনুভূত উক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তির যে সুর, তাহাকে জগতের হেতুভূত শক্তি সকলের সুরের সহিত একতানে মিলন করার নামই যোগ। আমার মনের সহিত জগতের মনের, আমার বুদ্ধির সহিত জগতের বুদ্ধির এবং আমার আত্মার সহিত জগতের আত্মার একতানে মিলন করাই যোগ। এইরূপ যোগযুক্তাত্মাই আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ জ্ঞান করিতে সক্ষম।

অনেকে ভাবিবেন যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা কেবল কতকগুলা কথা সাজান মাত্র। জগতের মন, জগতের বুদ্ধি, এ সকল কথার অর্থই নাই। বাস্তবিকই যাঁহারা হিন্দুদর্শনাদিতে বীতশ্রদ্ধ, তাঁহারা ঐরূপ মনে করিবেন সন্দেহ নাই। বেদান্তে ব্যষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য এবং সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য, ব্যষ্টিভাবাপন্ন বুদ্ধি ও সমষ্টিভাবাপন্ন বুদ্ধি এই সকল কথার অর্থ যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত জগতের মন, জগতের বুদ্ধি ইত্যাদি কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

কোলাহল-পূরিত রাজধানীতে কত লোক কত প্রকারের শব্দ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী কোন শৈলশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া রাজধানীর দিকে কর্ণপাত করিলে, সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এক একটি পৃথক্ পৃথক্ শুনা না গিয়া যে একটি মাত্র হো হো শব্দ শুনা যায়, সেই শব্দটি পূর্ব্বকথিত ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সমষ্টি-ভাব। কতকগুলি সুর একতানে মিলাইয়া বাজাইলে শ্রোতা যে একটি মাত্র সুর শুনিতে পায়, সেই সুরটি ঐ ভিন্ন ভিন্ন সুরগুলির সমষ্টি-সুর। এবং ঐ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সুরকে ব্যষ্টি-সুর কহা যায়। সেইরূপ এই সমস্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভূতের চৈতন্য যিনি সমষ্টিভাবে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারেন সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য কাহাকে বলে। এই সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্যই জগতের আত্মা। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভূতের মন, ভিন্ন ভিন্ন ভূতগত ভাব সমুদায় দ্বারা ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও উন্নত পুরুষ সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমষ্টি-ভাব অনুভব করিয়া জগতের মন কি তাহা বুঝিতে পারেন এবং এই জগতের মনের সহিত নিজের মনের একতা

সম্পাদন করিয়া যথার্থ যোগযুক্তাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ উন্নত পুরুষই কৃষ্ণোক্ত আদর্শ-পুরুষ।

সমষ্টিভাব আর ব্যষ্টিভাব সম্বন্ধে আরও গুটিকত কথা বলা চাই। বেদান্তমতে সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয়ে ব্যষ্টিভাবাপন্ন হওয়াতেই এই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই কথার একম্ শব্দে যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইতেই অসংখ্য সৃষ্টি হইয়াছে। এইটি বুঝিতে পারিলেই কোন্ পথে গেলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যায়, তাহা বুঝা যায়। অর্থাৎ তাহা হইলেই এই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ভূতগত ব্যষ্টিভাবে প্রতীয়মান ভাব সমূহ, যে এক মাত্র ভাবেরই পরিব্যঞ্জক, সেই সমষ্টিভাবটি কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে।

মনে কর, আমার মনে কোন একটি সুন্দর পুরুষের রূপ সম্বন্ধে একটি ভাব আছে। আমি সেই সুন্দর পুরুষের ছবি একখানি যখন আঁকিতে যাই, তখন প্রথমে মুখ, পরে হাত, পরে পা ইত্যাদি রূপে একটির পর একটি আঁকিয়া থাকি। চিত্রাঙ্কিত এই হাত, পা, মুখ ইত্যাদি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকলই আমার অন্তরস্থ একই মাত্র যে একটি ভাব, সেই ভাব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সেই আন্তরিক ভাবটি অন্তরে সমষ্টিভাবে ছিল, কিন্তু চিত্রপটে হস্ত পদ পৃথক্ পৃথক্ সময়ে অঙ্কিত হইয়া ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলা যায়। এই জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একখানি চিত্রপট স্বরূপ; ঈশ্বরের অন্তরে এক মাত্র একটি ভাব যাহা সদাই বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সেই ভাবটিই পরিদৃশ্যমান জগতে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এই একটি মাত্র ভাব—ইহাই জগৎ সম্বন্ধীয়

ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমষ্টিভাব। এই সমষ্টিভাবের সহিত যিনি নিজের আন্তরিক ভাব একতানে মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাত্মা। তিনিই মনুষ্যের উন্নত দশার প্রকৃত আদর্শ।

বৃক্ষের শাখা পত্রাদি সমূহ বীজগত যেমন একই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াও পরস্পরের সহিত একই সম্বন্ধে গাঁথা, সেইরূপ এই জগতস্থ মনুষ্য, ইতর জন্তু, উদ্ভিদ, ধাতু, পিতৃগণ ও দেবগণও সেইরূপ একই ঐশ্বরিক ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াও একই সম্বন্ধে গাঁথা আছে। সেই সম্বন্ধটি অন্তরে অনুভব করিতে পারিলেই মনুষ আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ জ্ঞান করিতে সক্ষম হন।

মুখে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সমস্ত জীবই এক সূত্রে গাঁথা; কিন্তু মুখে বলা আর অন্তরে অনুভব করা এ দুইটি বড় পৃথক্। কথায় জানিলাম যে, সমস্ত জীবই পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে গাঁথা যে, একের সুখের উপর অন্যের সুখ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সকল জীবে দয়া প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র কথায় জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। অন্তরে যখন অনুভব করিতে পারিবে যে, সমস্ত বিশ্ব একই সূত্রে গাঁথা, যখন অন্তর হইতে অন্তরের মানুষ তোমাকে জগতের হিতের জন্য প্রেরণা করিবে, তখনই জানিও যে, উন্নতির সোপানে তুমি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছ। এইরূপ অন্তরের প্রেরণায় যাঁহারা জগতের হিতে রত হন, তাঁহারা সুখ্যাতি অখ্যাতি, মান বা লজ্জা কিছুরই উপর লক্ষ্য রাখেন না।

যদি ঈশ্বর কি জানিতে চাও, যদি উন্নত হইতে চাও, তবে যিনি—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

এরূপ জনকে আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হও।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সবিতা ও গায়ত্রী।

আকাশ-দেবতাদিগের কথা বলিয়াছি। তার পর সূর্য্য-দেবতাদিগের কথা বলিতেছিলাম। সূর্য্য-দেবতা, সূর্য্য, ভগ, অর্য্যমা, পূষা, মিত্র, সবিতা, বিষ্ণু। ইহার মধ্যে সূর্য্যের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই—চেনা জিনিষ। ভগ, অর্য্যমা, পূষা, ও মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বলিব না—পৌরাণিক তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কেবল সবিতাই আমাদের আলোচ্য।

কিন্তু সবিতাকে লইয়া বড় গোলযোগ। সূর্য্যের নাম সবিতা, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু প্রসিদ্ধ গায়ত্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সবিতা আছেন ("তৎসবিতুঃ") সেখানে তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত। অনেকেই সবিতা অর্থে জগৎস্রষ্টাকেই বুঝেন। এ কথা আমাদের বিচার্য্য। পূষা বা মিত্রের মত তাঁহাকে অপ্রচলিতের মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে পারি না—কেন না তিনি আর্য্য ব্রাহ্মণের উপর বড় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, তিনি সেই গায়ত্রীর দেবতা। গায়ত্রী কেবল তাঁরই স্তব। সুতরাং এ কথাটা

আগে মীমাংসার প্রয়োজন—তিনি কেবল একটা বৃহৎ জড়-পিণ্ড, না সর্ব্বস্রষ্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বর? আমরা নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিব। আমরা সবিতাকে সূর্য্য-দেবতা মধ্যে গণিয়াছি বটে, কিন্তু সে মতের বিরুদ্ধ কতকগুলি কথা আছে, তাহাও দেখাইতে হইবে।

"সু" ধাতু হইতে সবিতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই সবিতা অর্থ প্রসবিতা। কাহার প্রসবিতা? নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "সর্ব্বস্য প্রসবিতা।" সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা কালে "তৎসবিতুঃ" ইতি বাক্যের অর্থ করেন, "জগৎপ্রসবিতুঃ।" যদি তাই হয়, তাহা হইলে সবিতা, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও "তৎসবিতুঃ" শব্দের ব্যাখ্যা পরব্রহ্ম পক্ষে করিয়া থাকেন। বেদের এক স্থানে তাঁহাকে "প্রজাপতি" বলা হইয়াছে। আর এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, কেহই তাঁহার বিরোধী হইতে পারে না *। জলবায়ু তাঁহার আজ্ঞাকারী †। অন্য দেবতারা তাঁহার অনুযায়ী ‡। বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, অদিতি, ও বসুগণ তাঁহার স্তুতি করেন ¶। তিনি প্রার্থনার বস্তুর ঈশ্বর; আমাদের কাম্য

---

*নকিরস্ত তানি ব্রতাঃ দেবস্য সবিতুর্মিনন্তি। ন যস্য ইন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতং অর্য্যমান্ মিনন্তি রুদ্রাঃ। অস্তহি সর্ব্বশাস্তারং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ং। ন মিনন্তি স্বরাজ্যং। ২। ৩৮। ৭। ৯।—৫। ৮২। ২।

† আপশ্চিদস্যব্রতে আনিম্রগ্রা অয়ঞ্চিৎ বাতো রমতে পরিজ্মন্। ২। ৩৮। ২।

‡ যস্য প্রয়ানমন্বয়ে ইদ্যযুর্দেবাঃ। ৫। ৮১। ৩

¶ অপি স্তুতঃ সবিতা দেবো অস্তু য়ং আচিদ্বিশ্বেবসবো গৃণান্তি। অভি যং দেবী অদিতির্গৃণাতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা। অভিসম্রাজো বরুণো গৃণন্তি অভিমিত্রাসো অর্য্যমা সযোবাঃ। ৭। ৩৮। ৩,৪।

বস্তু সকল দান করেন। তিনি ভুবনের প্রজাপতি ; আকাশের ধর্ত্তা (দিবো ধর্ত্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ। ৫।৫৩।২।) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, "প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত।" সবিতা প্রজাপতি হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কথাগুলায় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই বুঝায়।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসবিতৃ শব্দ ঋগ্বেদে সূর্য্য প্রতিও এক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে (৭।৬৩।২)। ঋগ্বেদের সূক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা স্তুত হন, তখন তিনিই সকলের বড় হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং সবিতার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখিয়াও কিছুই স্থির করা যায় না। সবিতা যে সূর্য্য, এমত বিবেচনা করিবার অনেকগুলি কারণ আছে।

১। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে স্পষ্টই সূর্য্যার্থে সবিতৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, ৪ ম, ১৪ সূ, ২ ঋকে।

২। সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রূপ। সূর্য্যের মত তাঁহার কিরণ আছে (প্রসুরন্নক্তুভির্জ্জগৎ ৪ ম, ৫৩ সূ, ৩ ঋক্) সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রথ আছে, অশ্ব আছে এবং সূর্য্যের ন্যায় তিনি আকাশ পরিভ্রমণ করেন।

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই সবিতার কাল *। সায়নাচার্য্য বলেন যে, উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি সেই সবিতা, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি, সেই সূর্য্য †। অতএব এই মত পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত।

৪। সবিতা যে পরব্রহ্ম নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ

---

* তস্য কালো যদা দ্যোরপহততমস্কাকীর্ণরশ্মির্ভবতি।

† উদয়াৎ পূর্ব্বভাবী সবিতা। উদয়াস্তমধ্যবর্ত্তী সূর্য্য ইতি।

এই যে, পরব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াই স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু সবিতা অন্যান্য বৈদিক দেবতার ন্যায় সাকার। তিনি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যহস্ত, হিরণ্যজিহ্ব, হিরণ্যপাণি, পৃথুপাণি, সুপাণি, সুজিহ্ব, মন্দ্রজিহ্ব, হরিকেশ ইত্যাদি শব্দে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার বাহুর কথা অনেক বার কথিত হইয়াছে। (বাহু, কর মাত্র)

বোধ হয় এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, সবিতা, পরব্রহ্ম নহেন, জড়পিণ্ড সূর্য্য। তবে গায়ত্রীর সেই "তৎসবিতুঃ" শব্দের অর্থ কি হইল? এতকাল কি ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রীতে সূর্য্য-কেই ডাকিয়া আসিতেছে, পরব্রহ্মকে নয়? যে গায়ত্রী না জপিয়া ব্রাহ্মণকে জলগ্রহণ করিতে নাই, যে গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন, আমি পবিত্র হইলাম, আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—সে কি কেবল জড়পিণ্ড সূর্য্যের কথা, জগদীশ্বরের নহে?

ব্রাহ্মণে এমন ভাবে না। এমন ভাবিতে ব্রাহ্মণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মপক্ষে গায়ত্রীর কিরূপ অর্থ করেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধৃত করিলাম। *

* "গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার-ভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপি-চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গ-স্বরূপান্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপা-

কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাই বলুন, এইরূপ ব্যাখ্যাই কি প্রকৃত ব্যাখ্যা? গায়ত্রী সামগ্রীটা কি, তাহা বুঝিলেই গোল মিটিতে পারে।

গায়ত্রী আর কিছুই নহে, ঋগ্বেদের একটি ঋক্। তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ১৮টি ঋক্ আছে; তন্মধ্যে দশম ঋক্ গায়ত্রী। ঐ সূক্তটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, নহিলে পাঠক "গায়ত্রীর" মর্ম্ম বুঝিবেন না।

এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র। ইন্দ্রাবরুণৌ (ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে) বৃহস্পতি, পূষা, সবিতা, সোম, মিত্রাবরুণৌ (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র এই সূক্তের বক্তা (প্রণেতা) এবং ইন্দ্রাদি দেবতা ইহাতে স্তূত হইয়াছেন। ঐ স্তূত দেবতাদিগের মধ্যে সবিতা এক জন। যে ঋকটিকে গায়ত্রী বলা যায়, তাহা তাঁহারই স্তব।

সূক্তটি এই—

"ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা যুবাবতেন ন তুজ্যা অভূ'বন্।
ক্বত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ॥ ১॥

সনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোহস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষাৎ চেতঃ কেবলো নিগু'ণশ্চ॥"

অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীষঞ্জ্বশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দ্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে॥ ২॥
অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ির্ম্মরুতঃ সর্ব্ববীরঃ।
অস্মান্ বরুত্রীঃ শরণৈরবন্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ॥ ৩॥

বৃহস্পতে জুষস্ব ন হব্যানি বিশ্বদেব্য।
রাস্ব রত্নানি দাশুষে॥ ৪॥
শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজ আ চকে॥ ৫॥
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং।
বৃহস্পতি বরেণ্যং॥ ৬॥
ইয়ং তে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতির্দ্দেব নব্যসী।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে॥ ৭॥
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং।
বধূয়ুরিব যোষণাং॥ ৮॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ॥ ৯॥
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১০॥
দেবস্য সবিতুর্ব্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে॥ ১১॥
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ॥ ১২॥
সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবানামেতি নিষ্কৃতং।
ঋতস্য যোনিমাসদং॥ ১৩॥

সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।

অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ॥

অস্মাকমায়ুর্ব্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ।

সোমঃ সধস্থমাসদৎ ॥ ১৫ ॥

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং।

মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ॥ ১৬ ॥

উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।

দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ১৭ ॥

গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতং।

পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮ ॥

শেষ ৪ ঋকের ঋষি কোন কোন মতে জমদগ্নি। অস্যার্থঃ।

হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশীল এই প্রজাগণ যুবা এবং বলবান্ রিপুকর্ত্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে, যে যশঃদ্বারা সখিভূত আমাদিগকে অন্নপ্রদান করেন। ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ধনেচ্ছু মহান্ যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনা-দিগকে আহ্বান করেন। মরুদ্গণ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সহিত সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। ২। হে দেবদ্বয়! আমরা যেন সেই অভিলষিত বসু এবং সেই সর্ব্বকর্ম্ম-করণে সামর্থ্যবিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণীয় দেব-পত্নীগণ রক্ষার সহিত এবং হবনীয় সরস্বতী গোরূপ দক্ষিণার সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩। হে সর্ব্বদেবহিত বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে ধনদান করুন। ৪। হে ঋত্বিক্‌গণ! বৃহস্পতিদেবকে তোমরা স্তোত্রদ্বারা নমস্কার কর। আমরা তাঁহার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি

করিতেছি। ৫। মনুষ্যদিগের অভিমত ফলদাতা অনভিভবনীয় এবং ব্যাপ্তরূপ বরেণ্য বৃহস্পতিকে নমস্কার কর। ৬। হে দীপ্তিমন্ পূষন্! এই নূতন স্তুতি আপনার উদ্দেশে কীর্ত্তন করিতেছি। ৭। হে পূষন্, স্তুতিকারক আমার এই স্তুতি গ্রহণ করুন এবং স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া অন্ন ইচ্ছাকারিণী ও হর্ষকারিণী এই স্তুতি গ্রহণ করুন, যেমন স্ত্রীকামী পুরুষ স্ত্রীকে গ্রহণ করে। ৮। যে পূষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯। সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। ১০। অন্ন ইচ্ছা করিয়া আমরা স্তুতির সহিত সবিতৃদেবের এবং ভগদেবের দান প্রার্থনা করি। ১১। নেতৃ বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্তুতিদ্বারা সবিতৃদেবকে বন্দনা করে। ১২। পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। ১৩। সোমদেব আমাদিগকে এবং সর্ব্বপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্নপ্রদান করুন। ১৪। সোমদেব আমাদিগের আয়ুর্ব্বর্দ্ধন এবং পাপনাশ করিয়া হবির্দ্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। হে শোভনকর্ম্মশীল মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের গাভীসকলকে দুগ্ধপূর্ণ করুন এবং জল মধুররসবিশিষ্ট করুন। ১৬। বহুস্তুত এবং স্তুতিবৃদ্ধ শুদ্ধব্রত আপনারা দীর্ঘস্তুতিদ্বারা বলের ঈশ্বর হয়েন। ১৭। জমদগ্নি ঋষি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞবর্দ্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন এবং সোম পান করুন। ১৮।

এখন দেখা যাইতেছে, যখন, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সোমাদির সঙ্গে একত্রেই সবিতা স্তুত হইয়াছেন, তখন সবিতা পরব্রহ্ম না হইয়া সূর্য্য হইবারই সম্ভাবনা। একাদশ ঋকটিও সবিতৃস্তব। ঐ ঋকে সবিতার সঙ্গে ভগদেবও যুক্ত হইয়াছেন।

অতএব উভয়েই সূর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষ, ইহাই সম্ভব। পাঠক দেখিবেন, যে ঋকটিকে গায়ত্রী বলা যায় (দশম ঋক) তাহার পূর্ব্বে "ভু" "ভুব" "স্বর্" এ তিনটি শব্দ নাই। গায়ত্রীর পূর্ব্বে এই তিনটি শব্দ সচরাচর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম থাকায়, অনেকে মনে করেন, "তৎসবিতা" অর্থে, এই ত্রৈলোক্যের প্রসবিতা।

এই ঋকটি গায়ত্রী নাম হইল কেন? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২ তম সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে। আর ১৫টি গায়ত্রীচ্ছন্দে। এই ঋকটির প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহাই গায়ত্রী নামে প্রচলিত। এই প্রাধান্য, ইহার অর্থ-গৌরব হেতু। সত্য বটে যে, সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থ-গৌরব থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যখন ভারতবর্ষে প্রধান ঋষিরা ব্রহ্মবাদী হইলেন, আর তাঁহারা ব্রহ্মবাদ বেদমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্মপক্ষেই করিলেন। এবং সেই অর্থই ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রচলিত হইল।

ইহাতে ক্ষতি কি? ব্রাহ্মণেরই বা লাঘব কি? গায়ত্রীরই বা লাঘব কি? যে ঋষি গায়ত্রী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে অর্থই অভিপ্রেত করিয়া থাকুন না, যখন ব্রহ্মপক্ষে তাঁহার বাক্যের সদর্থ হয়, আর যখন সেই অর্থেই গায়ত্রী সনাতন ধর্ম্মোপযোগী এবং মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধিকর, তখন সেই অর্থই প্রচলিত থাকাই উচিত। তাহাতে ব্রাহ্মণেরও গৌরব, হিন্দু-ধর্ম্মেরও গৌরব। এই অর্থে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান্ সকলেই গায়ত্রী জপ করিতে পারে। তবে আদৌ বৈদিক ধর্ম্ম কি ছিল, তাহার যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা হইতে কি প্রকারে বর্ত্তমান

হিন্দুধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝান আমাদের চেষ্টা, তাই গোড়ার কথাটা লইয়া আমাদের এত বিচার করিতে হইল। বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের মূল, কিন্তু মূল বৃক্ষ নহে; বৃক্ষ পৃথক বস্তু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ফলে ভূষিত, মূলে তাহা নাই। কিন্তু মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।

সীতারাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

সিপাহীরা পালে পালে বিদ্রোহী ধরিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা লাঠি চালাইয়াছিল, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তামাসা দেখিতে লাগিল। যাহারা ধৃত হইল, তাহারা প্রায় নির্দ্দোষী। লোক ধরিয়া আনিতে হইবে,কাজেই সিপাহীরা যাহাকে পাইল,তাহাকে ধরিয়া আনিল। দোষীরা সাবধান ছিল, তাহাদিগকে পাওয়া গেল না; নির্দ্দোষীরা সতর্ক থাকা আবশ্যক বিবেচনা করে নাই—তাহারা ধৃত হইতে লাগিল। কেহ হাঁ করিয়া সিপাহী দেখিতেছিল, অতি সাহসী বলিয়া সে ধৃত হইল। কেহ সিপাহী দেখিয়া ভয়ে পলাইল, যে পলায় সে দোষী বলিয়া ধৃত হইল। কেহ সিপাহীর প্রশ্নে চোট পাট উত্তর দিল; সে চতুর, কাজেই, "বদ্‌মাষ" বলিয়া ধৃত হইল। কেহ কোন উত্তর দিতে পারিল না,—অপরাধীই নিরুত্তর হয়, এই বলিয়া সেও ধৃত হইল। কেহ দুর্ব্বল, তাহাকে ধৃত করার কোন কষ্ট নাই, সিপাহীরা অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ধৃত করি-

লেন; কেহ বলবান্, কাজেই দাঙ্গাবাজ, সেও ধৃত হইল। কেহ দরিদ্র, দরিদ্রেরাই বদ্মাষ্ হইয়া থাকে, এজন্য সে ধৃত হইল; কেহ ধনী, ধনীরা টাকা দিয়া লোক নিযুক্ত করিয়া এই দাঙ্গা উপস্থিত করিয়াছে সন্দেহ নাই. তাহারাও ধৃত হইল। এইরূপে অনেক লোকে ধৃত হইল। এক জন মাত্র স্ত্রীলোককে ধরিবার আদেশ ছিল—যে গাছে চড়িয়া "মার! মার!" শব্দে হুকুম দিয়াছিল, তাহাকে। একের স্থানে শত জনে শত জন স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিল। কেহ শুনিয়াছিল সে বিধবা অতএব অনেকে বিধবা দেখিয়াই ধরিল, কেহ শুনিয়াছিল সে সুন্দরী, সে সুন্দরী দেখিয়াই ধৃত করিল। কেহ শুনিয়াছিল, সে যুবতী; এজন্য অনেক যুবতী এক কালীন বন্ধন ও পূজা প্রাপ্ত হইল। কেহ কেহ জানিয়াছিল যে, সেই বৃক্ষবিহারিণী মুক্ত-কুন্তলা ছিল; অতএব স্ত্রীলোকের এলো চুল দেখিলেই তাহা-দের হজুরে আনিয়া সিপাহীরা হাজির করিতে লাগিল।

এই রূপে ফৌজদারী কারাগার স্ত্রীপুরুষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—আর ধরে না। তখন সে দিনের মত কারাগার বন্ধ হইল। সে দিন কয়েদীরা বন্ধ রহিল—তাহাদের নিস্বতে পর দিন যাহা হয় হুকুম হইবে। সীতারামও এই সঙ্গে আবদ্ধ রহিলেন।

সীতারামকে অনেকেই চিনিত। ইচ্ছা করিলে তিনি ফৌজ-দারের সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় করিতে পারিতেন, অথবা যাহাতে সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে গাদাগাদি করিয়া থাকিতে না হয়, সে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি সে চেষ্টা কিছুই করিলেন না। তাঁহাকে চিনে, এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, ইঙ্গিতে তাঁহাকে চিনিতে নিষেধ করিলেন।

তিনি মনে মনে এই ভাবিতেছিলেন, "আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাই, তবে ইহাদিগের মুক্তির কোন উপায় হইবে না।"

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারের একটি মাত্র দ্বার, প্রহরীরা সেই দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত রহিল।

কেহ কিছু খাইতে পায় নাই। সন্ধ্যার পরে যে যেখানে পাইল, কাপড় পাতিয়া শুইতে লাগিল। সীতারাম তখন সকলের কাছে কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ ঘুমাইও না, ঘুমাইলে রক্ষা নাই।"

সকলে সভয়ে শুনিল। কথাটা কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কিন্তু কেহ ঘুমাইল না। পেটে ক্ষুধা—মনে ভয়; নিদ্রার সম্ভাবনা বড় অল্প। একবার প্রহর বাজিয়া গেল—ঝিঁঝিট-খাম্বাজে নবতওয়ালা একটু মধুরালাপ করিয়া, আহারাদির অন্বেষণে নবতখানা হইতে নামিল। তখন সীতারাম এক স্থানে বসিয়া, কতকগুলি কয়েদীর খেদোক্তি শুনিতেছিলেন। তাহাদের কথা সমাপ্ত হইলে সীতারাম বলিলেন, "ভাই, অত কাঁদা কাটার দরকার কি? আমরা মনে করিলেইত বাহির হইয়া যাইতে পারি।"

এক জন বলিল, "কেমন করিয়া যাইব?"

সীতারাম বলিলেন, "কেন? দ্বার ভাঙ্গিব।"

আর ব্যক্তি বলিল, "তুমি কি পাগল?"

সীতারাম বলিলেন, "কেন বাপু! এখানে আমরা কত লোকে আছি মনে কর?"

এক জন বলিল, "তা জনশ পাঁচ ছয় হইবে। তাতে কি হলো?"

সীতারাম বলিলেন, "পাঁচ শ লোকে একটা দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারি না ?"

সকলে হাসিতে লাগিল। এক জন বলিল, "দরওয়াজা যে লোহার ?"

সীতা। মানুষ কি মিছরির ? না কাদার ?

আর এক জন বলিল, "লোহার কপাট কি হাত দিয়া ভাঙ্গিব ? না দাঁত দিয়া কাটিব ? না নখ দিয়া ছিঁড়িব ?"

সকলে হাসিল।

সীতারাম বলিলেন, "কেন, পাঁচ শ লোকের লাথিতে এক জোড়া কপাট কি ভাঙ্গে না ? হোক না কেন লোহা—এক হয়ে কাজ করিলে, লোহার কথা দূরে থাক, পাহাড়ও ভাঙ্গা যায়, সমুদ্রও বাঁধা যায়। কাঠবিড়ালীতে সমুদ্র বাঁধার কথা শুন নাই ?"

তখন এক জন বলিল, "লোকটা বলিতেছে মন্দ নয়। তা ভাই, না হয় যেন লোহার কপাটও ভাঙ্গিলাম—বাহিরে যে সিপাহী পাহারা ?"

সীতারাম। কয় জন ?

সে ব্যক্তি বলিল, "দুই জন চারি জন থাকিতে পারে।"

সীতারাম। এই পাঁচ শ লোকে আর দুই চারি জন সিপাহী মারিতে পারিব না ?

অপর এক জন কহিলেন, "তাদের যে হাতিয়ার আছে ? আমরা আঁচড়ে কামড়ে কি করিব ?"

সীতারাম বলিলেন, "তখন আমি তোমাদিগকে হাতিয়ার দিব।"

"তুমি হাতিয়ার কোথা পাইবে ?"

"আমি সীতারাম রায়।"

শুনিয়া, যাহারা সীতারামের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, তাহারা একটু কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া বসিল। এক জন বলিল,—"বুঝিলাম, আমাদের উদ্ধারের জন্যই আপনি ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

যে কয় জনের সঙ্গে সীতারাম কথোপকথন করিতেছিলেন, সকলেরই এই মত হইল। সীতারাম তখন আর এক স্থানে গিয়া বসিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন; তাহারাও যথাসাধ্য সাহায্যে উদ্যত, এবং উত্তেজিত হইল। এইরূপে সীতারাম ক্রমে ক্রমে, অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ কৌশল, অসাধারণ বাগ্মিতার গুণে সেই বহুসংখ্যক বন্দিবৃন্দকে একমত, উৎসাহিত, এবং প্রাণপাতে পর্য্যন্ত সম্মত করিলেন।

তখন সীতারাম সেই সমস্ত বন্দিবর্গকে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহারা দাঁড়াইল। তখন সীতারাম তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। দ্বারের সম্মুখে প্রথম সারি, তার পর আর এক সারি, তার পর আর সারি—এইরূপ বরাবর। প্রতি শ্রেণীমধ্যস্থ ব্যক্তিদিগকে তিন তিন জন করিয়া আবার বিভাগ করিলেন। আবার সেই তিন জনকে এমন করিয়া দাঁড় করাইলেন, যে দুই জনের মধ্য দিয়া, এক জন মনুষ্য যাইতে পারে। তাহাতে এইরূপ ফল দাঁড়াইল যে, অনায়াসে পলক মধ্যে কোন তিন ব্যক্তি পিছনের সারিতে পিছাইয়া দাঁড়াইতে পারে, আর পিছনের সারি হইতে তিন জন আগু হইয়া পলক মধ্যে তাহাদের স্থান লইতে পারে—ঠেলাঠেলি হয় না।

এই সকল বন্দোবস্ত করিতে করিতে আবার প্রহর বাজিল।

"দগড়া নগড়া গড়াগড়ি" বলিয়া দামামা কি বলিতে লাগিল। তার সঙ্গে মধুর বেহাগ রাগিণী যামিনীকে, গভীরা, মূর্ত্তিমতী, ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিল। তখন সীতারাম বুঝিলেন, উত্তম সময়, পাহারার সিপাহী ভিন্ন অন্য সিপাহী সকল ঘুমাইয়াছে— কর্ত্তৃপক্ষেরা নিদ্রিত। তখন সীতারাম দ্বারের সমীপস্থ তিন জনকে বলিলেন,—

"তোমরা তিন জন প্রথমে দ্বারে লাথি মার। গায়ে যত জোর আছে, তত জোরে তিন বার মাত্র লাথি মারিবে। তার পর পিছে সরিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু দেখিও, তিন খানা পা, যেন একেবারেই কপাটের উপর পড়ে; অগ্র পশ্চাৎ হইলে সকল বৃথা। একেবারে তিন জন লাথি মারিবার স্থান এ কপাটে আছে—তাই মাপ করিয়া তিন তিন জন করিয়া সাজাইয়াছি" মুখে বলিও—"লছমী-নারায়েণ কি জয়!"

বন্দীরা বুঝিল। "লছমী-নারায়েণ কি জয়!" বলিয়া, তিন জনে ঠিক এক তালে, প্রাণপণ শক্তিতে, সেই লোহার কপাটে পদাঘাত করিল।

বাহিরে চারি জন সিপাহী পাহারায় ঢুলিতেছিল, বজ্রের মত শব্দ সহসা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করাতে তাহারা চমকিয়া উঠিল। কোথায় কিসের শব্দ তাহা না বুঝিতে পারিয়া, এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

এ দিকে প্রথম তিন জন সরিয়া পিছনে গিয়াছে, আর তিন জন আসিয়া পলক মধ্যে তাহাদের স্থান লইয়া সেই এক তালে তিন বার কপাটে পদাঘাত করিল। লোহার কপাটের তাহাতে কি হইবে? কিন্তু বড় ঝঞ্ঝনা বাজিতে লাগিল। এক জন সিপাহী বলিল,

"কিয়া রে?"

কিন্তু ভিতর হইতে "লছমী-নারায়েণ কি জয়!" ভিন্ন অন্য কোন উত্তর হইল না। দ্বিতীয় সিপাহী বলিল,

"শালা লোগ কেওয়াড়ি তোড়নে মাঙ্গ্তা হৈ।"

তৃতীয় সিপাহী। আরে তোড়্নে দেও। বাঙ্গালী লোহেকি কেওয়াড়ি তোড়ে গা!

চতুর্থ সিপাহী। কেওয়াড়ি খোল্কে দো চার থাপ্পর লাগা দেঙ্গে?

প্রথম সিপাহী। আরে যানে দেও। আপ হি সে বহু লোকো ঠণ্ডা হো যায়ে গা।"

এ সকল কথা বন্দীরাও বড় শুনিতে পাইলনা। কেন না এখন, বড় ঝড়ের সময়ে যেমন বজ্রাঘাত থামে না, তাহারা যেমন উপর্য্যুপরি শব্দ থামে না, সেইরূপ শব্দে এখন লোহার কপাটের উপর পদাঘাত বৃষ্টি হইতেছিল—আর কিছুই শোনা যায় না। কয়েদীরা মাতিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সীতারাম, তাহাদিগকে ধৈর্য্যবিশিষ্ট করিয়া, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, তাহাকে সেইখানে স্থির রাখিতে লাগিলেন। ফাটকের ভিতর কিছুমাত্র গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ছিল না।

সিপাহীরা প্রথমে রঙ্গ দেখিতেছিল। মনে করিতেছিল যে, কয়েদীরা কৌতুক করিতেছে এখনই নিবৃত্ত হইবে। ক্রমে দেখিল যে, সে গতিক নহে—ক্রমে কয়েদীদিগের বল বাড়িতে লাগিল। তখন তাহারা কয়েদীদিগকে শাসিত করা নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করিল। তিন জনে পরামর্শ এই করিল যে, তাহারা কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কয়েদীদিগকে ভাল রকম প্রহার করিয়া নিরস্ত করিবে।

তিন জনের মত হইল, কিন্তু এক জনের হইল না। আলিয়ার খাঁ সকলের প্রাচীন—দাড়ি একেবারে শণের মত। সে বলিল, "বাবা! যদি সত্য সত্যই কয়েদী ক্ষেপিয়া থাকে, তবে আমরা চারি জনে কি তাহাদের থামাইতে পারিব? বরং দ্বার খোলা পাইলে, তাহারা আমাদের চারি জনকে পিষিয়া ফেলিয়া পিল পিল করিয়া পলাইয়া যাইবে? তখন আমরা কি করিব? বরং জমাদ্দারকে খবর দেওয়া যাক্।"

দ্বিতীয় সিপাহী। কেন জমাদ্দারকে খবর দিবারই তবে প্রয়োজন কি? সত্যসত্য উহারা কপাট ভাঙ্গিতে পারিবে, সে শঙ্কাত আর করিতেছি না। তবে বড় দিক করিতেছে—তার জন্য জমাদ্দারকে দিক করিয়া কি হইবে? আজ থাক, কাল প্রাতে উহাদিগের উচিত সাজা হইবে।

কিছুক্ষণ সিপাহীরা এই মতাবলম্বী হইয়া নিরস্ত রহিল। কয়েদীদিগের দ্বার ভঙ্গের উদ্যম দেখিয়া নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "বাঙ্গালী লোহার কপাট ভাঙ্গিবে, আর বানরে সঙ্গীত গায়িবে, সমান কথা।"

লোহা সহজে ভাঙ্গে না বটে, কিন্তু দেয়াল কাটিতে পারে। লোহার চৌকাট দেয়ালের ভিতর গাঁথা ছিল। দুই চারি দণ্ড পরে আলিয়ার খাঁ জ্যোৎস্নার আলোকে সভয়ে দেখিল, অবিরত সবল পদাঘাতের তাড়নে, দেয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে। তখন সে বলিল "আর দেখ কি? জমাদ্দারজিকে সম্বাদ দাও। এইবার কপাট পড়িবে।"

এক জন সিপাহী জমাদ্দারকে খবর দিতে শীঘ্র গেল। আর তিন জন হাঁ করিয়া কপাটপানে চাহিয়া রহিল।

দেখিল, ক্রমে দেয়াল বেশী বেশী ফাটিতে লাগিল। তার

পর, দেয়ালটা একটু কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে চৌকাট চক্ চক্ করিয়া নড়িতে লাগিল—ঝন্ ঝন্ শব্দ বড় বাড়িয়া উঠিল। লাথির জোর আরও বাড়িতে লাগিল—বজ্রাঘাতের উপর বজ্রাঘাতের মত শব্দ হইতে লাগিল—শেষ, চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই লোহার কপাট, চৌকাট সমেত, দেয়াল ভাঙ্গিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর জয় শব্দে গগন বিদীর্ণ হইল।

নির্ব্বোধ হিন্দুস্থানীরা, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সরিয়া দাঁড়াইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। যখন কপাট পড়িতেছে দেখিল, তখন দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। দুই জন বাঁচিল, কিন্তু এক জনের পায়ের উপর কপাট পড়ায় সে ভগ্নপদ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এ দিকে কপাট পড়িবামাত্র ভিতর হইতে, বাঁধ ভাঙ্গিলে জলপ্রবাহের মত, বন্দী-স্রোত পতিত কপাটের উপর দিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত প্রহরীকে পদতলে পিষিয়া, গভীর গর্জ্জনে ছুটিল। সর্ব্বাগ্রে সীতারাম বাহির হইয়া আহত প্রহরীর ঢাল সড়্কী তরবারি কাড়িয়া লইয়া আর দুই জনকে যমদূতের ন্যায় আক্রমণ করিলেন। তাঁহার তখনকার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার দারুণ প্রহারে আহত হইয়া প্রহরিদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। জমাদ্দার সাহেব তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।

বন্দিগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল—সীতারাম অসি হস্তে স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলেই বাহির হইয়া গেলে, সীতারাম আবার একবার কারাগারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে, এক কোণে এক জন বন্দীকে মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সে একবারও উঠে নাই, বা

কোন সাড়া দেয় নাই। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, সে পীড়িত। এখন তাঁহার মনে হইল, সে হয় ত বিনা সাহায্যে উঠিতে পারে নাই, বা বাহির হইতে পারে নাই। সে বাহির হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য সীতারাম কারাগৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে তেমনি ভাবে সেই কোণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শুইয়া আছে।

সীতারাম ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! সবাই বাহির হইল, তুমি শুইয়া কেন?"

যে শুইয়াছিল, সে বলিল, "কি করিব?"

এ ত স্ত্রীলোকের গলা। চেনা গলা বলিয়াই সীতারামের বোধ হইল। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সে বলিল, "আমি শ্রী।"

কৃষ্ণ-চরিত্র।

শ্রীকৃষ্ণ, ঈশ্বরের অবতার হউন, বা না হউন, তিনি স্বয়ং কখন লোকের কাছে আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেন না। সত্য বটে, মহাভারতে ও অন্যান্য গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে, যাহাতে দেখিতে পাই, যে কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বিবেচনা করিয়া কথা কহিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠক বোধ হয় ভুলিবেন না যে, মহাভারত, বিষ্ণু বা ভাগবত পুরাণ, বা হরিবংশ কবির কল্পনায় পরিপূর্ণ। সেই সকল কল্পনার মূলে একটু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে মাত্র। কল্পিত বৃত্তান্ত হইতে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সাধ্যমতে বাছিয়া লওয়া

উচিত। সে বিচার অতি কঠিন, নির্দ্দোষরূপে কখনই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে, ইহার কতকগুলি সদুপায় আছে। তাহার একটি এই যে, মহাভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কৃষ্ণ-কথা আছে, ইহা স্মরণ রাখা। যদি এমন কথা পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাই যে, তাহা মহাভারতে নাই, তবে তাহা অনৈতিহাসিক এবং অমৌলিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এখন আমরা মহাভারতেও স্থানে স্থানে পাই যে, কৃষ্ণ আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচিত করিতেছেন। কিন্তু সমস্ত মহাভারত, যাহা এখন মহাভারত বলিয়া প্রচলিত, তাহা এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে রচিত হয় নাই, তাহা যিনি গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। আমি মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া, এই টুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে।—প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল—তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবন-বৃত্ত ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত—অন্ততঃ এখনকার মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে, বড় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়;—ইলিয়ড্ বা পারাডৈস্-লষ্টের সঙ্গে তুলনায় খুব বড় গ্রন্থ বটে। ইহাতে কেবল অতি প্রাচীন কিম্বদন্তী—অর্থাৎ "পুরাণ"—সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র। সেগুলি অধিক রঞ্জিত করিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। দ্বিতীয় স্তরে সেই প্রাচীন কিম্বদন্তী বা পুরাণগুলির বিশেষ সম্প্রসারণ—অনেক স্থানেই তাহার পুনরুক্তি হইয়াছে। এই দ্বিতীয় স্তরটি সমুদায় এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। ইনি প্রথম শ্রেণীর কবি—ইহাঁর তুল্য কবি বলিয়া বাল্মীকি ও সেক্ষপীয়র ভিন্ন আর কোন তৃতীয় ব্যক্তির নাম

লইতে ইচ্ছা করি না। ইহাঁর সৃষ্টি-কৌশল অতি আশ্চর্য্য, চরিত্র-নির্ম্মাণ-শক্তি বিস্ময়কর,—রচনা মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রভাসিত সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় অনন্ত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট। মহাভারত জীবনী হইয়াও যে আদ্যোপান্ত অদ্ভুত ঐক্যবিশিষ্ট হইয়াছে—পাণ্ডুর অভিশাপ হইতে যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন পর্য্যন্ত যে জ্ঞানের অপেক্ষা কর্ম্মের প্রাধান্য, এবং কর্ম্মের অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখি, তাহা তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহিমাময়, প্রতিভা-শালী সেই কবির কীর্ত্তি। যদি ব্যাসদেব নাম দিতে হয়, তবে ইহাঁকেই ব্যাসদেব বলিতে সম্মত আছি। কিন্তু এই কবি যে ভাবে ব্যাসদেবের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ব্যাসদেব বলা যায় না। ব্যাস নিজেই মহাভারতের একটি অতি ভাস্বর চিত্র। এরূপ মহিমাময় ঋষি-চরিত্র কোথাও দেখিতে পাই না।

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভা-শালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্ব্বপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা "অতীতের সহিত বর্ত্তমানের

বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন, যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়, এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে। বরং যাহা সর্ব্বজন-মনোহর এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি *। কিন্তু এই কারণে ভাল মন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব্ব, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগ পর্ব্বে প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর সঞ্চার কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্ব্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্ব্বের যে অংশ এবং বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।

এই তিন স্তরের নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত। কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া এই তিনটি স্তর পৃথক করা যায়। সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে, যে, প্রথম স্তরের

* স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্ক। ৪ অ। ২৫।

লক্ষণ, সংক্ষেপ ও সরলতা—দ্বিতীয়ের লক্ষণ কবিত্ব, তৃতীয়ের লক্ষণ অপ্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার ব্যত্যয় ঘটে।

এক্ষণে মহাভারতের সর্ব্বপ্রাচীন স্তর আলোচনা করিয়া, কৃষ্ণসম্বন্ধে আমরা এই কয়টি কথা পাই।

(১) কৃষ্ণকে প্রথমাবস্থায় কেহ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করে না।

(২) ক্রমে অনেকে স্বীকার করে বটে, কিন্তু সে কথা লইয়া বড় বিরোধ উপস্থিত হয়। এক পক্ষে পাণ্ডবেরা—ভীষ্ম তাঁহাদিগের নেতা। দ্বিতীয় পক্ষের নেতা শিশুপাল, প্রথম বিবাদেই নিহত হয়েন, কিন্তু দুর্য্যোধন, কর্ণ, প্রভৃতি চিরকালই বিরোধী রহিলেন।

(৩) মহাভারতে এমনও আছে যে, যাহারা তাঁহার দেবত্ব স্বীকার করে, তাহারাও তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে নাই। অনেক স্থানেই তিনি ও অর্জ্জুন নরনারায়ণ নামক প্রাচীন ঋষির অবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত না হইয়া কেবল বিষ্ণুর মস্তকস্থিত একটি কেশের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, এক জন মনুষ্যের সহিত, তাহার মস্তকের এক গাছি চুলের যত প্রভেদ—ভগবান্ বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের ততটা প্রভেদ। এ সকল কথা, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। তবে ইহাতে বুঝায় যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মধ্যেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত হইত।

(৪) তাঁহাকে কেহ অবতার বলিয়া স্বীকার করুক বা না করুক, তিনি নিজে কখন আপনাকে অবতার বলিয়া পরিচিত করেন নাই, অথবা কাহারও সঙ্গে এমত ব্যবহার করেন নাই,

যে, তাহাতে নিজের, ঈশ্বরত্ব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা বুঝা যায়। সত্য বটে, শান্তি পর্ব্বে এমন কথা দুই এক জায়গায় আছে, কিন্তু সে তৃতীয় স্তরে। সত্য বটে অন্যান্য স্থানে অর্জ্জুনের নিকট গোপনে—যথা, ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়ে,তিনি আপনাকে পরব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, কিন্তু সেও মহাভারতের তৃতীয় বা দ্বিতীয় স্তরে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরেও এমন কথা বড় দুর্লভ। সচরাচর কৃষ্ণ আপনাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়াই পরিচিত করেন—সামান্য মনুষ্যের মত ব্যবহার করেন। তিনি অপমানিত হইলে, অথবা পাপিষ্ঠের নিকট তেজস্বী বটে, কিন্তু সচরাচর বড় বিনীত।

(৫) তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কখন দৈব বা মনুষ্যাতীত শক্তির দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ করেন নাই। এমন কথা মহাভারতে যাহা আছে, তাহা তৃতীয় স্তরে।*

---

* "It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparately blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men—acting according to human motives, and taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. *It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the latter interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and of the unskilful manner in which these passages are often introduced, and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress.*"

Lassen s Indian Antiquities, quoted by Muir.

"In other places (অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidedly affirmed; in some it is disputed or denied; and in most of the situations he is exhibited in action, it is as a prince and warrior, not as a divinity.

(৬) তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম-বৃদ্ধি। ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য তিনি দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন—(১) ধর্ম্মপ্রচার, (২) ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্ম্মপ্রচার তিনি বক্তৃতা দ্বারা করিতেন না।—আপনার জীবনের আদর্শের দ্বারা। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, তিনি অস্ত্রধারণ করিয়া করেন নাই—পাপ পুণ্যের দণ্ডবিধানের দ্বারা। এই সকল কথা আমরা প্রচারে ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিব, ইচ্ছা আছে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ মনুষ্য-চরিত্র না ঈশ্বর-চরিত্র ?—উত্তরে, আমাদেরও জিজ্ঞাস্য, পাঠকের কি বোধ হয় ? কিন্তু আমরা এমন উত্তর চাই না। আমাদের কথাগুলি শেষ হইলে, পাঠককে জিজ্ঞাসা করিব, পাঠকের কি বোধ হয় ?

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন।

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায় ; লেখাও ভাল

He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however is the work of various periods, and requires to be read throught carefully and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated."

Preface to Wilson's Vishnu Purana.

পাঠক মনে ভাবিতে পারেন, আমরা বুঝি কৃষ্ণের দেবত্ব অস্বীকার করিব, নহিলে. শক্রপক্ষের এ সকল মত সমর্থন করি কেন ? তাহা নহে. শত্রুপক্ষের কথাতেই আমাদের মত প্রমাণীকৃত করিব। আমাদের মত, কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য। আমাদের ইহাও মত, যে ঈশ্বর ব্যতীত কেহ আদর্শ মনুষ্য হইতে পারে না। কেন না মনুষ্যমাত্রেই অসম্পূর্ণ।

হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন, আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে, রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা, বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি সংস্কৃত, ফরাশি, জর্ম্মান কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে, বা শূন্য-ভাণ্ডারে, অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃপুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায়, আপনার মনের ভাব, সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি

অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি, বা সংস্কৃত, বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

মথুরায়।

মিশ্রকাফি—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি
    বাঁশরী বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন
    কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
    বাঁশরী বাজিল কই?
বিকচ বকুল ফুল
দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল
    গুঞ্জরে কোথায়!

এ নহে কি বৃন্দাবন ?
কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি
বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি,
পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী
পরাণ মজিল, সই !
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?
একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে
মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধবা বালা,
মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা
এ নিশি পোহায়, হায় !
কবি ‍‌যে হল আকুল,
রে বিধির ভুল !
য় কেন ফুল
ফুটেছে আজি, লো সই !
। বাজাতে গিয়ে
বাঁশরী বাজিল কই ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিত্তশুদ্ধি।

হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করি। হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত আর কোন তত্ত্বই ইহার ন্যায় মর্ম্মগত নহে। সাকারের উপাসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত-বাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্ত-শুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই তাহার কোন ধর্ম্মই নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে তাহার আর কোন ধর্ম্মেই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ইহা হিন্দু ধর্ম্মের সার, খৃষ্টধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধর্ম্মের সার, ইসলাম ধর্ম্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎ ধর্ম্মেরও সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খৃষ্টীয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্ত-শুদ্ধিই ধর্ম্ম। তবে প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্মেই ইহা প্রবল। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি বিধানানুসারে কার্য্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝা-ইতেছি। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। "ইন্দ্রিয়

সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবেনা যে, ইন্দ্রিয় সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। উদাহরণ, ঔদরিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা, কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের সংযম বিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবেনা বা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে, বা কদর্য্য আহার করিয়া থাকিবে। শরীর রক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয়সংযমের কোন বিঘ্ন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংযতেন্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে স্পৃহা না থাকে। * স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্মরক্ষার্থে বা ধর্ম্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়ম রক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই; যে না করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্ম্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে একে-

---

* রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা।২য় অ।৬৪।

অর্থ। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্য যে ইন্দ্রিয়গণ তদ্দ্বারা বিষয় সকল উপভোগ করিয়া বিধেয়াত্ম ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নবজীবনে মনুষ্যত্ব ও অনুশীলনবাদে এই কথা স্পষ্টীকৃত করা যাইতেছে।

বারে বিমুখ, কিন্তু মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোক লজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিম্বা ঐহিক উন্নতির জন্য অথবা ধর্ম্মের ভাণে পীড়িত হইয়া, তাহারা সংযতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা কখনও স্খলিতপদ না হইলেও তাহারা ইন্দ্রিয়সংযম হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য্য, তাঁহাদিগের হইতে এই ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না—যখন রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তদভাবে যোগ তপস্যা কঠোর সকলই বৃথা। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য হিন্দু পুরাণেতিহাসে ঋষি-দিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসিল, আর অমনি ঋষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি অমনি নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই একটী চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয়সংযম পাওয়া যায় না। কার্য্যক্ষেত্রেই, সংসার ধর্ম্মেই, ইন্দ্রিয় সংযম লাভ করা যায়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদান সকল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়াছি; কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শ-মাত্রে টিকেনা, এই ইন্দ্রিয়সংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমাত্র

টিকে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের উপযোগী উপাদান সমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের এই একটী অতি নিগূঢ় কথা কহিলাম।

কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত কিন্তু অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমার গুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাঁহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য না করেন এমন কাজ নাই, তদ্ভিন্ন মন দেন এমন বিষয় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা নিকৃষ্ট। ইঁহাদের নিকট ধর্ম্ম কিছুই নহে, কর্ম্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর নাই, জগৎ থাকিলেও তাহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন এই কথা বুঝিব, যখন আপনার সুখ

যেমন খুঁজিব পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোর-কৌপিন ধারণ করিয়া, সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্ত-শুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি, বিশ্বামিত্রকে একটি গাভীদান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যে রাজা, অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।

ইহা অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল। এ বিষয়ে স্থানান্তরে এবং সময়ান্তরে আমরা অনেক বলিব ইচ্ছা আছে, এজন্য এখানে আর বিস্তার করিলাম না।

চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য, হৃদয়ে শান্তি। দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি,

তাহার স্থূল তাৎপর্য্য মনুষ্যে প্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

ভক্তি প্রীতি শান্তি লক্ষণাক্রান্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শাস্ত্রকারেরা কিরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্দ হইতে নিম্নলিখিত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। ১০।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। ১১।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাম্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে। ১২।
নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ। ১৩।
মদ্ধিষ্ণ্য দর্শন স্পর্শ পূজা স্তুত্যভিবন্দনৈঃ
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া
মৈত্র্যাচৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নাম সংকীর্ত্তনাচ্চ মে
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা। ১৪।
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্র গুণং হি মাং। ১৫।
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারী যৎ। ১৬
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা বস্থিত সদা

তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং। ১৭।
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তম আত্মানমীশ্বরং
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি। ১৮।
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে
নৈবতুষ্যেঽর্চ্চিতোর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ। ১৯।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং। ২০
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণং। ২১।
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা। ২২।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্দ ২৯ অধ্যায়

ইহার অর্থ

"মা! নির্গুণ ভক্তিযোগ কি রূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদ দর্শন বর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যক্তির এই রূপ ভক্তিযোগ হয় তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস) সাষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব) সারূপ্য (সমান রূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ

সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ১১। মা! ঐ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যান্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। মানবি! ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রমণ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২। মা! ঐ প্রকার ভক্তির সাধন বলি শ্রবণ করুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক স্বস্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদি-যুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ একবারে হিংসাদি বর্জ্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাত্যুক্ত পূজা প্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার প্রতিমাদি দর্শন স্পর্শন পূজন স্তবকরণ বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য বৈরাগ্য মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরে-ন্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতা-চরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহংকারিতা প্রদর্শন। ১৪। ঐ সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ব্বতো-ভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণমাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অধিকারী চিত্ত বিনা প্রযত্নেই পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ হইয়া সর্ব্বপ্রাণিতেই সতত অবস্থিত আছি, অথচ কোনকোন ব্যক্তি

আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। ১৭। পরন্তু আমি সর্ব্বপ্রাণিতে বর্ত্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণি-সমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎ-পন্নাদি ক্রিয়াদ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করে তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করা বিফল। পুরুষ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণিতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। ২০। পরন্তু যে মূঢ় আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ যাহার আপ-নার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্ন-দর্শী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। ২১। অতএব পুরুষের কর্ত্তব্য যে আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণিতে অবস্থিত জানিয়া দান মান ও সকলের সহিত মিত্রতা এবং সমদৃষ্টিদ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করে। ২২।

চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দুধর্ম্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দু-দিগের স্মরণ থাকে যেন, যে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি পূজার কোন ধর্ম্ম নাই। সে স্থলে প্রতিমাদির পূজা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল। ভক্তি ও প্রীতি কার্য্যকারিণী-বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না এবং হৃদয়ও শান্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল। এ কথা আমরা সময়ান্তরে সবিস্তারে বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

বৈদিক দেবতা।

এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট বৈদিক দেবতাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে বায়ু দেবতাদিগের কথা বলিব। বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু দেবতা,—প্রথম বায়ু বা বাত, দ্বিতীয় মরুদ্গণ। বায়ুর বিশেষ পরিচয় কিছুই দিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্যের ন্যায় বায়ু আমাদিগের কাছে নিত্য পরিচিত। ইনি পৌরাণিক দেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। পুরাণেতিহাসে ইন্দ্রাদির ন্যায় ইনি একজন দিক্‌পাল মধ্যে গণ্য। এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে প্রচলিত দেবতাদের মধ্যে ধরিতে হয়।

মরুদ্গণ সেরূপ নহেন। ইঁহারা এক্ষণে অপ্রচলিত। বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদ্গণ ঝড়। নামটা কোথাও একবচন নাই; সর্ব্বত্রই বহুবচন। কথিত আছে যে মরুদ্গণ ত্রিগুণিত ষষ্টিসংখ্যক, একশত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দৌরাত্ম্য, তাহাতে এক লক্ষ আশীহাজার বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ইঁহাদিগকে কখন কখন রুদ্র বলা হইয়া থাকে। রুদ্‌ধাতু চীৎকারার্থে। রুদ ধাতু হইতে রোদন শব্দ হইয়াছে। রুদ ধাতুর পর সেই "র" প্রত্যয় করিয়া রুদ্র শব্দ হইয়াছে। ঝড় বড় শব্দ করে, এইজন্য মরুদ্গণকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোথাও বা মরুদ্গণকে রুদ্রের সন্ততি বলা হইয়াছে।

তার পর অগ্নিদেবতা। অগ্নিও আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে তাঁহারও কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কিছু পরিচয় দেওয়াও হইয়াছে।

ঋগ্বেদে আর একটী দেবতা আছেন, তাঁহাকে কখন বৃহস্পতি কখন ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ইনি অগ্নি, কেহ কেহ বলেন ইনি ব্রহ্মণ্যদেব। সে যাহাই হউক, ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই। বৃহস্পতি এক্ষণে দেবগুরু অথবা আকাশের একটী তারা। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বড় বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বলি, কিন্তু ঋগ্বেদে তিনি চন্দ্র নহেন। ঋগ্বেদে তিনি সোমরসের দেবতা।

অশ্বীদ্বয় পুরাণেতিহাসে অশ্বিনীকুমার বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে যে তাঁহারা সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের পৌরাণিক নাম অশ্বিনী-

কুমার। এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে তাঁহারা শেষরাত্রির দেবতা ; উষার পূর্ব্বগামী দেবতা।

আর একটী দেবতা ত্বষ্টা। পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা যাহা, ঋগ্বেদে ত্বষ্টা তাহাই। অর্থাৎ দেবতাদিগের কারিগর।

যমও ঋগ্বেদে আছেন কিন্তু যমও আমাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত। যমদেবতার একটা গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা সময়ান্তরে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে।

ত্রিত আপ্ত্য অজ একপাদ প্রভৃতি দুই একটী ক্ষুদ্র দেবতা আছেন, কখন কখন বেদে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কিছুই কথা নাই যে তাঁহাদের কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন করে।

বৈদিক দেবীদিগের মধ্যে অদিতি পৃথিবী এবং উষা এই তিনেরই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে। অদিতি ও পৃথিবীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। উষার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কেন না যাহার ঘুম একটু সকলে ভাঙ্গিয়াছে সেই তাহাকে চিনে। সরস্বতীও একটী বৈদিক দেবী। তিনি কখন নদী কখন বাগ্‌দেবী। গঙ্গা-সিন্ধু প্রভৃতি নদী ঋগ্বেদে স্তুত হইয়াছেন। ফলতঃ ক্ষুদ্র বৈদিকদেবী দিগের সবিস্তার বর্ণনে কালহরণ করিয়া পাঠকদিগকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এইখানে বৈদিক দেবতা দিগের ব্যক্তিগত পরিচয় সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম না। আমরা এখন বৈদিক দেবতাতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব। তারপর বৈদিক ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণ চরিত্র।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে দেখি। সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুই সূচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পঞ্চালে আসিয়া ছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যবিন্ধনে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করেন নাই। ইহা কবির কৌশল হইতে পারে। অথবা, মুষল-পর্ব্বের পূর্ব্বে মহাভারতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণ শাসিত যাদববংশের যে একটা ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য দেখা যায়, তাহার ফলও হইতে পারে। মুষল পর্ব্বে সেই ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের বড় শোচনীয় বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাও কৃষ্ণের অভিপ্রেত এমন কথাও মহাভারতে আছে। মুষল পর্ব্ব মহাভারতে কোন্ স্তর ভুক্ত তাহা আমরা যখন মুষল পর্ব্বে আসিব তখন সে কথা বিচার করিব। আমরা এখন দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের কথা বলিতেছি, দ্রৌপদী স্বয়ম্বর যে আদিম মহাভারত ভুক্ত, তদ্বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই নাই। আর দ্রৌপদী স্বয়ম্বর ব্যতীত মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। মহাভারতের কোন অংশ আদিম স্তর ভুক্ত কিনা? এ কথা মীমাংসা করিতে হইলে আগে দেখিবে সে অংশ বাদ দিলে মহাভারতের অবশিষ্টাংশ অসংলগ্ন হয় কিনা? যদি হয় তবে বিচার্য্য অংশ আদিম মহাভারত ভুক্ত বটে। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর তাই।

এই সমবেত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশ যুক্ত পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি নিজ

দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত মাত্র নাই। মনুষ্য বুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, "মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন তাহতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম বৃকোদর।" ইত্যাদি। যুধিষ্ঠির ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে চিনিলে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুকান থাকে?" পাণ্ডদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা, অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন, স্বাভাবিক মানুষ বুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন, ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিস্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের কার্য্যে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, যে তিনি মনুষ্য বুদ্ধিতেই কার্য্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতে ও আদর্শ মনুষ্য। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যের, অর্থাৎমনুষ্যত্বের তিনি, চরমাদর্শ। আমরা এই কথাই ক্রমে পরিস্ফুট করিব। ভিতরে আসল কথাটা এই থাকিয়া যাইবে যে তিনি যথার্থ এই রূপ চরিত্রের মনুষ্য ছিলেন কিনা। এই প্রশ্নের মীমাংসা পাঠক নিজে করেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করা যায়, তবে সেবিষয়ে শেষে কিছু বলা যাইবে।

অনন্তর অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাঁধিল। অর্জ্জুন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। যতদূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জ্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এই টুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীর পুরুষ, এবং বলদেব সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার আত্মীয়, পিতৃস্বসৃপুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সাহায্যে নামিলে তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্ম্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই, যে কৃষ্ণ আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালিজাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখন অন্য কারণে * যুদ্ধ করেন

* শিশুপালকে কৃষ্ণ আত্মরক্ষার জন্য বধ করেন নাই বটে, কিন্তু শিশুপাল বধ কালে তিনি কোন যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়েন নাই। আমরা যুদ্ধেরই কথা এখন বলিতেছি। কৃষ্ণ শিশুপালকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন মাত্র।

নাই। আর ধর্ম্মস্থাপন জন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্ম্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। এ উদ্দেশ্যেও কৃষ্ণ একবার মাত্র অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন—শিশুপাল বধে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে তিনি পাণ্ডবদিগকে উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন বটে। কেবল কাশীরাম দাস, বা কথকঠাকুরদের কৃপায় মহাভারতে যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মূল। আমারও যখন সেইরূপ অধিকার ছিল, হয়ত তখন আমিই এইরূপ মনে করিতাম। কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্ব্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায়, যে ধর্ম্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। নিজেও করেন নাই। যিনি যুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান বীর বলিয়া তৎকালেই স্বীকৃত, তাঁহার এইরূপ যুদ্ধে বিরাগ এইরূপ নিয়মপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ, জীবনে বা কল্পনায়, আর কোথাও দেখা যায় নাই। ঐতিহাসিক সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবরে, কাব্যগত ধর্ম্মবীরশ্রেষ্ঠ দেবব্রত ভীষ্মেও ইহা দৃষ্ট হয় না। কেবল এই আদর্শ মনুষ্যে দেখা যায়।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে বলিলেন, "ভূপালবৃন্দ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" ধর্ম্মতঃ! ধর্ম্মের কথাটাত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্ম্মভীত ছিলেন; রুচিপূর্ব্বক কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্ম্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মবুদ্ধিই

যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম্ম কোন পক্ষে তাহা ভুলেন নাই। ধর্ম্মবিস্মৃতদিগের ধর্ম্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্ম্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ। আমরা মহাভারতীয় কৃষ্ণ চরিত্রে ইহার অলঙ্ঘ্য প্রমাণ দেখাইব। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ;" প্রভৃতি দুই একটা কথা মাত্র যাঁহারা অবগত আছেন, এবং সে সকল কথা কোথা হইতে আসিল, তাহার সন্ধান করেন নাই, তাঁহাদের এই সকল কথা অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবে। যদি সেই অশ্রদ্ধা অকারণ, অমূলক, এবং অজ্ঞানতাজনিত বলিয়া, আমার বোধ না হইত, তবে আমি এই কৃষ্ণ চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না কেননা কৃষ্ণোপাসনা পুনঃ সংস্থাপিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সে উদ্দেশ্য কাহারও হইতে পারে না, কেননা কৃষ্ণোপাসনা দেশ হইতে যায় নাই, বরং প্রবলই আছে। অন্য সকল উপাসনা হইতেই প্রবল আছে। তবে কৃষ্ণের আধুনিক উপাসকেরা তাঁহাকে যে ভাবে চিন্তা করে, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়, আর যাহারা তাঁহার উপাসক নহে, তাহারা সেই নিন্দনীয় উপাসনা দেখিয়াই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। যাঁহাকে লম্পট, মিথ্যাবাদী, ক্রূরকর্ম্মান্বিত বলিয়া মনে জানি, তিনি কদাচ উপাস্য নহেন। এরূপ উপাস্যের উপাসনা অধর্ম্ম এবং আত্মাবনতি জনক। কৃষ্ণের যদি যথার্থ এইরূপ চরিত্র হয়, তবে কৃষ্ণোপাসনা দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়াই ভাল। আর তাহা না হইয়া তিনি যদি আদর্শ চরিত্র হয়েন, তবে তিনি মনুষ্যই হউন, আর দেবতাই হউন, ভক্তির পাত্র। কেবল মনুষ্য হইলেও, যে অর্থে আত্মোন্নতির জন্য উন্নতস্বভাবের প্রতি ভক্তি ও তদালোচনাকে উপাসনা বলা যায়, উপাসনার

সে অর্থে আদর্শ মনুষ্য উপাস্য। তার পর তাঁহার সমুদায় চরিত্রের আলোচনা করিয়া যদি কাহারও এমন বিশ্বাস জন্মে যে এই আদর্শ মনুষ্য ঈশ্বরের অবতার, তিনি তাঁহাকে অবশ্য সেই ভাবে উপাসনা করিবেন। যাহার সে বিশ্বাস না জন্মিবে, তাহার সে ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করা অনুচিত। আমরা কাহাকেও কৃষ্ণোপাসনায় অনুরোধ করিনা ও করিব না। বরং যেখানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানে উপাসনা নিষেধ করি। বিশ্বাসের অভাবে, পরের দেখিয়া, পরের মতে মত দিয়া, উপাসনা করা চিত্তের অবনতিকর। আমরা কেবল চিন্তা ও সমালোচনা করিতে বলি। চিন্তা ও সমালোচনার ফল যাহা হইবে, তদনুসারে কার্য্য করিতে বলি। মনে এক, মুখে আর ইহা যেন না হয়। যেমন বুঝিবে, তেমনি করিবে, তাহাতে কোন সঙ্কোচ বা ভয় করিও না।

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

ইচ্ছা আছে, মহাভারতে কৃষ্ণের যত কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে সকলই এক একটী করিয়া সমালোচিত করিব। কিন্তু পাঠকদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রচারের স্থান অল্প, প্রচারের লেখকদিগের অবকাশ অল্প, আর পাঠকদিগের ধৈর্য্য অল্প, আর মহাভারত গ্রন্থ অতি বৃহৎ। সুতরাং কতকালে আমরা একার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব তাহা বলা যায় না। তবে পাঠককে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি, যে মহাভারতোক্ত কৃষ্ণের কোন কার্য্য গর্হিত বা নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইলেও,

কৃষ্ণপক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক আমরা তাহা চাপিয়া যাইব না। সত্যই আমাদের উদ্দেশ্য। অসত্যে কোন ধর্ম্মেরই উন্নতি হইতে পারে না।

ভালবাসা।

ভালবাসা ভিন্ন সংসার চলে না। ভালবাসা ব্যতীত জীবন থাকে না। ভালবাসার গুণে দয়া মমতা আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষা—যাহাতে জীব বাঁচে বাড়ে সুখী হয়—সবই। কিন্তু এমন যে ভালবাসা, পৃথিবীতে ইহা বড়ই বিরল—ইহার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। মনুষ্য মধ্যে ভালবাসা শব্দের ছড়াছড়ি, সকলেই সকলকে বলে—ভালবাস, ভালবাস—মানুষের মুখে কেবলই ভালবাসার ভাণ। আবার আগেকার অপেক্ষা এখন কি ইউরোপ কি এসিয়া, কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ষ, সর্ব্বত্রই ভালবাসা শব্দের বড়ই রোল উঠিয়াছে—যেন পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, ছেলে বুড়া, মেয়ে পুরুষ, সকলেই সকলকে কেবল ভালবাসিয়াই বেড়াইতেছে। এখন ধান ভানিতেও ভালবাসার কথা, কাঠ কাটিতেও ভালবাসার কথা, ভাত রাঁধিতেও ভালবাসার কথা, কাপড় কাচিতেও ভালবাসার কথা, বই লিখিতেও ভালবাসার কথা, স্তব করিতেও ভালবাসার কথা, সমাজ ভাঙ্গিতেও ভালবাসার কথা, সমাজ গড়িতেও ভালবাসার কথা, সকল কথাতেই সকলে কেবল সকলকে বলিতেছে—ভালবাস, ভালবাস, ভালবাস। আজিকালিকার বাঙ্গালা সাহিত্য ত কেবল ভালবাসার হুঙ্কারে পরি-

পূর্ণ। এমন বই, এমন পত্রিকা, এমন প্রবন্ধই নাই যাহাতে ভালবাসার হুঙ্কারে পাঠকের কাণে তালা লাগে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজিকার মনুষ্যসমাজে এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালবাসা বড়ই বিরল—কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না—লোকের মধ্যে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষ—কেবল মুখে ভালবাসা শব্দের গগনভেদী রোল। কপটতার এত প্রাদুর্ভাব পৃথিবীতে আর কখন হয় নাই। মনুষ্যসমাজের এমন দুরবস্থা আর কখন দেখা যায় নাই। মানবাত্মা এমন ব্যবসাদারি-ভক্ত আর কখন হয় নাই। মানুষ আজ বড় অসুখী, তাই সুখ দুঃখ তত্ত্ব লইয়া এত ব্যস্ত। আজিকার মানব সাহিত্যের ভীষণ বিস্তার বড় একটা সুখের কথা নয়, কেন না তাহা প্রধানত কেবল মানুষের অধোগতির এবং দুঃখ বৃদ্ধির ফল ও প্রমাণ!

আজকাল সর্ব্বত্র লোকের মুখে ভালবাসা শব্দ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোক আজ লোককে যে খুব কমই ভালবাসে তাহার একটি প্রমাণ সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যে এবং তাহার দেখা দেখি এখনকার বঙ্গীয় সাহিত্যে ভালবাসার প্রকৃতি যে রূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় যে, পৃথিবীতে আজ ভালবাসা শব্দের রোল যতই বেশী হউক, প্রকৃত ভালবাসা কিছুমাত্র নাই। ভালবাসার প্রকৃতি এই রূপ কথিত হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর ভালবাসা-ওয়ালারা বলিয়া থাকেন যে, ভালবাসা একটি দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery, উহা কেমন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিতে পারা যায় না। আধুনিক ইংরাজ কবিদিগের মুখে এবং ইংরাজি কবিতাপ্রিয় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মুখে এই কথা শুনিতে

পাওয়া যায়। কিন্তু ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে দুর্বোধ্য রহস্য হউক আর নাই হউক, উহাকে দুর্বোধ্য রহস্য বলিয়া বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফল এই হয় যে, ভাল না বাসা বা ভালবাসিতে না পারা দূষণীয় বলিয়া লোকের কাছে গণ্য হয় না। যাঁহার এই রূপ বিশ্বাস যে ভালবাসা অতিশয় দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery, অর্থাৎ ভালবাসা কেমন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিতে পারা যায় না, তাহার মনের কথা এই যে ভালবাসা না বাসা মানুষের কর্তৃত্বাধীন নয়, অতএব আমি যদি কাহাকে ভাল না বাসি তবে আমার কোন দোষ দায়িত্ব বা অপরাধ নাই। এখন বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে প্রয়াস পাইতে হইবে না যে, যেখানে লোকের ভালবাসা সম্বন্ধে এই রূপ বিশ্বাস বা সংস্কার সেখানে ভালবাসার রাজ্য বড় একটা বিস্তার লাভ করে না, বরং ঐ বিশ্বাসের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিয়াই যায়। কি ইউরোপে কি ভারতবর্ষে আজ তাহাই ঘটিতেছে! সর্ব্বত্রই ভালবাসার ধুয়া যত চড়িতেছে, প্রকৃত ভালবাসা তত কমিতেছে!

এই শ্রেণীর লোক ইহাও বলিয়া থাকেন যে ভালবাসা যেমন একটি দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery, উহার উৎপত্তি ও তেমনি আকস্মিক এবং দুর্দ্দমনীয়। প্রমাণ স্বরূপ আন্তনি এবং ক্লিওপাতারার ভালবাসার কথার, রোমিও এবং জুলিয়তের ভালবাসার কথার, বৎসরাজ এবং রত্নাবলীর ভালবাসার কথার উল্লেখ করা হয়। এবং এ শ্রেণীর বঙ্গীয় লেখকগণ ইংরাজি কোর্টশিপে যে দুর্দ্ধর্ষ আকর্ষণাগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহারও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু নিবিষ্ট মনে এই সকল এবং এই প্রকার প্রমাণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এ রূপ স্থলে যে ভালবাসা হয় তাহা এত আকস্মিক

স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় হইবার কারণ এই যে, তাহার প্রধান অংশ ঐন্দ্রিয়িক লালসা এবং রূপজ মোহ, ঠিক মনের ভালবাসা নয়। সৌন্দর্য্য বা beauty দেখিলে তৎ-প্রতি যে অনুরাগ জন্মে তাহা আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় বটে, কিন্তু তাহা ভালবাসা নয়, রূপজ মোহ মাত্র। জিহ্বা দ্বারা তিক্ত মিষ্ট প্রভৃতি রসাস্বাদ যেমন আকস্মিক এবং অনিবার্য্য, আকৃতিগত সৌন্দর্য্য (physical beauty) দেখিলে তৎপ্রতি অনুরাগ ও ঠিক তেমনি আকস্মিক (instantaneous) এবং অনিবার্য্য। রসাস্বাদও যেমন ভালবাসা নয়, আকৃতিগত সৌন্দর্য্য দর্শনে তৎপ্রতি যে অনুরাগ হয় তাহাও তেমনি ভাল-বাসা নয়। এবং কথিত উদাহরণ স্থলে যে ভালবাসা দেখা যায় তাহাতে ঐন্দ্রিয়িক লালসা থাকে বলিয়া তাহা এত দুর্দ্দমনীয়। কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক লালসা ভালবাসা নয়, কটু মিষ্ট রসাস্বাদের ন্যায় শারীরিক বিকার বা কার্য্য মাত্র। অতএব যাঁহারা ভালবাসাকে আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রকৃত ভালবাসার সহিত ঐন্দ্রিয়িক লালসা এবং রূপজ মোহের যে প্রার্থক্য আছে তাহা দেখিতে পান না এবং বুঝিতে পারেন না বলিয়া এই ভ্রম করিয়া থাকেন। এবং এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই আজকাল অনেক বঙ্গীয় লেখক এবং সমাজ সংস্কারক বলিয়া থাকেন যে যে বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় ভালবাসা আকস্মিক, আপনা আপনি এবং দুর্দ্দমনীয় ভাবে উৎপন্ন হয় নাই, সে বিবাহ বিবাহই নয়, কেন না সে বিবাহে ভালবাসা জন্মিতে পারে না। তাই তাঁহারা হিন্দু বিবাহ প্রণালীর এত নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখনকার

কথা এই যে, ভালবাসা আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় জিনিস হউক আর নাই হউক, যাঁহারা ভালবাসাকে সেই ভাবে বুঝিয়া থাকেন তাঁহাদের মতের অর্থ এই যে ভালবাসা না বাসা মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাধীন নয় এবং যদি কেহ কাহাকে ভাল না বাসে তবে তাহার কোন দোষ দায়িত্ব বা অপরাধ নাই। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে যেখানে লোক ভালবাসাকে আকস্মিক, স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় জিনিস বলিয়া বিশ্বাস করে সেখানে ভালবাসার রাজ্য বড় একটা বিস্তার লাভ করে না, বরং ঐ বিশ্বাসের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিয়াই যায়। আজ পৃথিবীময় তাহাই ঘটিতেছে! কি ভারতবর্ষে কি ইংলণ্ডে ভালবাসার ধূয়া বাড়িতেছে, কিন্তু ভালবাসা কমিতেছে!

যে শ্রেণীর লোকের কথা বলিলাম তাঁহাদের অপেক্ষা এক অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের ভালবাসা সম্বন্ধীয় মত অনেক উৎকৃষ্ট। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ভালবাসা যে একটা বিশেষ দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery তা নয়। জগতের সকল জিনিসে যেমন একটু করিয়া দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery থাকে ইহাতেও তাই আছে, তদপেক্ষা বেশী কিছুই নাই। রাগে, দ্বেষে, দয়ায়, ফুলফোটায়, চেতন বা অচেতন পদার্থের গতিতে যেমন একটু রহস্য বা mystery আছে, ভালবাসাতেও তাই আছে। আর ভালবাসা কেন বা কেমন করিয়া হয়, তাহা যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না তা নয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভালবাসা প্রধানত দুই কারণে জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বাভাবিক সম্বন্ধের বলে, যেমন পিতাপুত্রের মধ্যে; দ্বিতীয়তঃ গুণদর্শনে, যেমন বন্ধুর মধ্যে। স্বাভাবিক সম্বন্ধ মূলক ভালবাসা যে শুধু ভালবাসা, আর কিছু নয়, তা বোধ হয়

না। কেন না স্বাভাবিক সম্বন্ধ শোণিত মূলক; অতএব সম্বন্ধ মূলক ভালবাসায় একটি জড় অংশ আছে যাহা পশুপক্ষী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর জীবেও বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও মনুষ্যের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ মূলক ভালবাসায় মনেরও প্রভূত সম্পর্ক আছে। সেই মানসিক অংশ গুণ দর্শনে বা গুণানুভবে বৃদ্ধি হয়; যথা পুত্র যত গুণবান হয় পিতার ভালবাসা তত বাড়িতে থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অভাবে যে ভাল-বাসা হয়, অর্থাৎ, বন্ধু প্রভৃতির মধ্যে যে ভালবাসা হয়; তাহা গুণ দর্শন বা গুণানুভব মূলক বলিয়া গুণ বৃদ্ধি বা অধিকতর গুণানুভব সহকারে বাড়িয়া থাকে। অতএব এ ভালবাসা যে শুধু ক্রমশ জন্মে তা নয়, ইহা পরিবর্দ্ধনশীল। ভালবাসার পাত্রের গুণ যত দেখিতে পাওয়া যায় বা বাড়িতে থাকে এ ভালবাসা তত বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গুণ দর্শন নিজের মানসিক শক্তি অনুশীলন সাপেক্ষ, এবং গুণবৃদ্ধি ভালবাসার পাত্রের মানসিক শক্তি অনুশীলন সাপেক্ষ। অতএব এ ভালবাসার বৃদ্ধি অনেক পরিমাণে পর সাপেক্ষ এবং সেই জন্য বহুল মাত্রায় অনিশ্চিত। অনেক লোক সর্ব্বদাই আত্মোন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়া থাকে এবং অনেক লোক হয়ও না। সেই জন্য গুণদর্শন মূলক ভালবাসা অনেক স্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার অনেক স্থলে হয়ও না। আবার গুণদর্শন মূলক ভালবাসা কতক পরিমাণে নিজের গুণদর্শন শক্তি সাপেক্ষ। কিন্তু যেখানে আত্মাদর বা আত্মাভিমান বেশী কিম্বা আত্মোন্নতি কম সেখানে সে শক্তিও কম হয়, সুতরাং পরের গুণ বেশী হইলেও ভালবাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অতএব গুণ দর্শন মূলক ভালবাসা বর্দ্ধনশীল এবং সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের ভালবাসার অপেক্ষা বাহুল পরিমাণে

উৎকৃষ্ট হইলেও সর্ব্বথা বর্দ্ধনশীল বা বিঘ্নহীন নয়। তাই কি ইংলণ্ডে কি ভারতে কোথাও পণ্ডিত এবং গুণবানের মধ্যে ভালবাসার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, হিংসা এবং আত্মশ্লাঘাই প্রবল—সর্ব্বত্রই ভালবাসার ধূয়া খুব চড়া, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা খুব কম।

তবে কোন্ প্রণালীতে ভালবাসিলে পৃথিবীতে ভালবাসা বৃদ্ধি হয়, জীবজগতে ভালবাসার ডোর দীর্ঘ এবং দৃঢ় হয়? আমাদের মতে একটি মাত্র প্রণালী আছে,সেই প্রণালীতে ভালবাসিলে সেই মহৎ এবং মোহন ফল লাভ করা যায়। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আপনাকে এবং সমস্ত প্রাণীকে এবং সমস্ত জগৎকে সেই পরম প্রেমভাজন সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভাবিয়া সমস্ত মনুষ্যকে, সমস্ত প্রাণীকে, সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিলে তবে অবাধে ভালবাসার রাজ্য বিস্তৃত হইতে পারে। যাহাকে ভালবাসিব সে ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে আসিয়া যায় কি? সে ভাল হইলেও তাহাকে ভালবাসিব, মন্দ হইলেও তাহাকে ভালবাসিব। ভালবাসা কেননা যে ভাল সেও সচ্চিদানন্দের বিকাশ, যে মন্দ সেও সচ্চিদানন্দের বিকাশ। অতএব আমার হৃদয় হইতে নির্গত হইবে, অপরের উপর গিয়া পড়িবে। ভালবাসা সম্বন্ধে আমরা এবং অপরের মধ্যে এই মাত্র সম্পর্ক। আমার হৃদয় আমার এক মাত্র ভালবাসার উৎস হইবে, অপরের হৃদয়কে আমার ভালবাসার উৎস হইতে কেন দিব? আমার হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে কেন দিব? দিলেই বা আমার হৃদয়োদ্ভূত উৎস ভাল খেলিবে কেন? আর আমার হৃদয়োদ্ভূত উৎস ভাল না খেলিলে আমি কেমন করিয়া আমার জগৎকে প্রেমবারিতে

প্লাবিত করিয়া সচ্চিদানন্দে পরিণত করিব? ভালবাসা যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের আয়ত্তাধীন হয়, ততক্ষণ ভালবাসার নিশ্চয়তা কোথায়, বিস্তারের স্থিরতা কৈ? তোমার গুণাগুণ দেখিয়া যদি আমার তোমাকে ভালবাসিতে হয়, তবে আমি যে তোমাকে ভালবাসিবই তাহার নিশ্চয়তা কৈ? তোমাতে যদি তেমন গুণ না দেখি তাহা হইলেত আর আমার তোমাকে ভালবাসা হইল না। আর যদি তোমাকে ভাল, নাই বাসিলাম তবে আমারই বা তোমার কাছে থাকা কেন? তোমারই বা আমার কাছে থাকা কেন? তাই বলি, আপনাকে বা আপনার হৃদয়কে ভালবাসার এক মাত্র ভিত্তি করিতে হইবে, তবেই সমস্ত জগৎ আপনার ভিতর আসিবে, আপনার উপর দাঁড়াইবে, নচেৎ নয়। নচেৎ আমার জগতের খানিকটা আমার বাহিরে গিয়া পড়িবে, আমারসহিত মিশিবে না। আর আমার জগতের খানিকটা যদি আমার সহিত না মিশে তাহা হইলে আমার জগৎ এবং অস্তিত্ব দুইই অসম্পূর্ণ হইবে এবংআমার জগদীশ্বরের সহিত আমার মেশা হইবে না, আমি ঈশ্বরভ্রষ্ট পামর হইব। অতএ জগৎ ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া জগৎকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিও না, কেন না তাহা হইলে জগৎকে ভালবাসিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সমস্ত জগৎ সেই সচ্চিদানন্দ, অতএব সমস্ত জগৎ ভালবাসার পাত্র, বাল্যকাল হইতে মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল করিও, হৃদয় এই ভাবে ভরাইয়া তুলিও, তাহা হইলে ভালবাসায় বাধা বিঘ্ন দেখিবে না, যা দেখিবে তাই ভালবাসিবে, সব ভাল ভালবাসিবে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভালবাসায় ভরিয়া উঠিবে, ভালবাসার রাজ্য আর বিশ্বনাথের রাজ্য সমঃসীমা সম্পন্ন হইবে। তাহা হইলে

ভালবাসার পাত্র বা মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। আধুনিক ইংরাজ কবিরা তাহাই করিয়া থাকেন। সমস্ত জীবিত নরনারীর মধ্যে মনের মানুষ খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহারা কাল্পনিক মনের-মানুষ সৃষ্টি করেন। এবং তাঁহাদের দেখা দেখি বর্ত্তমান বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাই করিতেছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়। বিশ্বনাথকে যে বিশ্বময় বলিয়া জানে তাহাকে কি আবার মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, না কল্পনায় সৃষ্টি করিতে হয়? যাহার বিশ্বনাথ নাই, যাহার সচ্চিদানন্দ নাই, যাহার প্রকৃত ধর্ম্মভাব নাই, যে কেবল আত্মসর্ব্বস্ব, কেবল সেই ভালবাসার পাত্র, মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়, কেবল সেই বিধাতার জগতে জীবন্ত মনুষ্যের মধ্যে মনের মানুষ না পাইয়া কল্পনার জগতে মনের মানুষ করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপে যীশু খৃষ্টের অপূর্ব্ব প্রেম-সম্বাদ বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই আজ মনের মানুষ খুঁজিয়া আপনার সাহিত্য এবং সমাজকে কুপথগামী করিতেছে। এবং ইউরোপের দেখা দেখি আমাদের স্বদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকে আমাদের সাহিত্য এবং সমাজকে কুপথগামী করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের কবিরাও আজ বিধাতার সৃজিত অসংখ্য নরনারীর মধ্যে ভালবাসার পাত্র না পাইয়া কল্পনায় ভালবাসার পাত্র সৃষ্টি করিতেছেন এবং আমাদের নব্য সমাজ-সংস্কারকেরাও মনের মানুষ খুঁজিয়া বিবাহ না করিলে বিবাহে ভালবাসা হয় না এই মতের পক্ষপাতী হইয়া আমাদের প্রাচীন বিবাহ প্রণালীরউপব খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ান, ভালবাসার পাত্র বাছিয়া বেড়ান অধার্ম্মিক এবং অশিক্ষিতের কাজ প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের

কাজ নয়। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কাছে সকলই ভালবাসিবার জিনিস। প্রকৃতভগবদ্ভক্ত সকলকেই মনের মানুষ করিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিয়া ভালবাসিতে পারেন। যে অনন্ত পুরুষের ধ্যানে আত্মাভিমান বিনাশ করিয়া আপনাকে ভগবদ্ভাবে ভরাইয়া ফেলিয়াছে, সে সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে সক্ষম হইয়াছে—তাহার ভালবাসার হেতু কেবল সে আপনি, আর কেহ বা আর কিছু নয়। অতএব ভালবাসার রাজ্য অবাধে বিস্তৃত করিতে হইলে সকলকে অনন্তপুরুষের ধ্যানে আত্মাভিমান বিনাশ করিয়া আপনাদিগকে ভগবদ্ভাবে ভরাইয়া ফেলিতে হইবে, তবেই সকলে কেবল আপনা আপনি ভালবাসার হেতু হইতে পারিবেন। ভগবানের প্রকৃত সেবার নিমিত্ত, ভগবানের ভবের প্রকৃত উন্নতির নিমিত্ত মানুষের এ শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ শিক্ষা অন্যত্র কঠিন হইতে পারে কিন্তু ভারতে কঠিন নয়। ভারতের ঈশ্বর জগন্ময়—খৃষ্টানের ঈশ্বরের ন্যায় জগৎ হইতে পৃথক নন। অতএব বহুকালের সংস্কারের গুণে ভারতবাসী সহজেই জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালবাসিতে পারিবে। আবার ভারতে দৃষ্টান্তও ভারতবাসীর অনুকূল। আর কেহ কোথাও জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালবাসেন নাই, কিন্তু ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষেরা সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালবাসিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাদের বংশধর, কেন না তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতে পারিব? দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে জগদীশ্বরের প্রকৃত পূজার জন্য এবং জগদীশ্বরের জগতের প্রকৃত উন্নতির জন্য মানুষের যে নূতন এবং পরিশুদ্ধ ভালবাসার পদ্ধতি

আবশ্যক হইয়াছে, ভারতবাসী কর্ত্তৃক পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমেই তাহার প্রথম অনুষ্ঠান হইবে।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি।

শিক্ষক। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাই তাহা বিশেষ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল গল্প শুনার মত শুনিয়া গেলে আমার শ্রম সার্থক হইবে না। সেই জন্য যাহা বলিতেছি তাহা মন দিয়া শুন।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরকে নিরাকার, নির্গুণ, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, অনন্ত, অনাদি, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া অখ্যাত করেন। এবং ইহাও বলিয়া থাকেন যে এই ঈশ্বর আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিশেষণ শব্দ গুলির প্রয়োগ করা হয়, তাহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝা চাই। প্রথমে নিরাকার শব্দটিতে কি অর্থ বুঝায় তাহা বলি শুন।

ছাত্র। যাহার কোন রূপ নাই তিনিই নিরাকার। এ ভিন্ন নিরাকার শব্দের কি অন্য কোন রূপ অর্থ আছে নাকি?

শি। রূপ ও আকার এই দুই শব্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুই শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে অনেক সময় অনেকে আকার কথাটির অর্থ সম্বন্ধে অনেক ভুল করিয়া থাকেন। দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন গুণ সকল আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য

হইয়া থাকে। বল দেখি, দ্রব্যের আকার আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়ের বিষয়।

ছা। দ্রব্যের আকার আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়।

শি। যাহাকে দ্রব্যের বর্ণ গুণ কহে তাহাই আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বর্ণ গুণকে দ্রব্যের রূপ বলে এবং যাহা দ্রব্যের আকার তাহাকেও সময়ে সময়ে রূপ বলা হয়। রূপ শব্দের এই দুই প্রকার অর্থ থাকাতে অনেকে দ্রব্যের আকারকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন যে যাহা আমাদের চক্ষুর অগোচর তাহার বুঝি কোন আকার নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বায়ু চক্ষুর অগোচর, কিন্তু বায়ুর আকার আছে। এক জন জন্মান্ধ, যে কখনও কোন দ্রব্যের রূপ চক্ষে দেখে নাই, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আকার সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। এই যে আমার হাতে পয়সাটি রহিয়াছে ইহার আকার গোল এবং ইহার বর্ণ লোহিত।

কোন দ্রব্যের আকার কি, এই কথাটিতে সেই দ্রব্য কি রূপ আয়তন বিশিষ্ট স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহাই বুঝায়। কোন দ্রব্য আছে কিন্তু উহা কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই ইহা আমরা অনুভবই করিতে পারি না। এবং ঐ দ্রব্য যে রূপ সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহাকে দ্রব্যের আকার বলা যায়।

যদিও আমাদের দ্রব্য জ্ঞান ও তাহার আকার সম্বন্ধীয় জ্ঞান উক্ত দ্রব্যের গুণ সকল আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হওয়াতেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু উহা কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ নহে। কিরূপে দ্রব্য ও তাহার আকার

সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের অন্তরে জন্মিয়া থাকে, তাহার বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। যে কারণেই হউক যখনই বুঝি যে, কোন একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে তখনই সেই দ্রব্য যে কোন না কোন স্থানে অবস্থিত এবং কোন না কোন পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া আছে, ইহা মনে হইবেই হইবে। স্থান ব্যাপকতা কথাটিতে যে অর্থ বুঝায় তাহা বস্তুর ধর্ম্ম। অর্থাৎ কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই অথচ বস্তু আছে ইহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। যে দ্রব্য যেরূপ সীমাবেষ্টিত স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই সেই বস্তুর আকার।

এখন দেখ ঈশ্বর নিরাকার এই কথায় কি অর্থ বুঝায়। ঈশ্বর কথাটিতে কোন বস্তু বুঝায়, কি কোন গুণ বুঝায়? সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর কথাটিতে সর্ব্বব্যাপী বস্তুই বুঝায়। যখন বলি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর বিশ্ব-ব্যাপী, তখন ঈশ্বরের যে স্থান-ব্যাপকতা গুণ আছে, তাহা সকলেই শুনিবেন। এই পয়সাটি স্থান ব্যাপিয়া আছে, সেই জন্য উহাকে সাকার বলি কিন্তু ঈশ্বর স্থান ব্যাপিয়া আছেন অথচ তাঁহাকে নিরাকার বলি, ইহার কারণ কি?

আমরা সচরাচর সাকার এই কথাটিতে কি অর্থ বুঝি। যে দ্রব্য কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা-কেই সাকার বলিয়া বুঝি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর কি কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছেন? এই বিশ্ব যে, অনন্ত ও অসীম। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই, এই জন্যই তিনি নিরাকার।

যদি বল কল্পনায় বিশ্বের একটী সীমা দিতে পারি, তবে আমি বলি যে, কল্পনায় একটি সীমা দিয়া একবার ভাব দেখি যে ঐ সীমার বহিরে আর স্থান নাই। ইহা তুমি ভাবিতে পারিবে না। এই জন্যই বিশ্বের সীমা নাই, এই জন্যই ঈশ্বর নিরাকার। এখন বুঝিয়া দেখ, যে বস্তু অসীম তাহাই নিরাকার। একমাত্র ঈশ্বরেরই কোন সীমা নাই, এই জন্য ঈশ্বরই নিরাকার। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তাহার সীমা আছে ইহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। এমন কোন সীমাবদ্ধ স্থান ভাবিতে পারি না যাহার বাহিরে আর স্থান নাই, সুতরাং ঈশ্বর যখন বিশ্বব্যাপী, তখন তাঁহার সীমা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, এই জন্যই শাস্ত্রে তাঁহাকে নিরাকার বলে।

ছা। ঈশ্বর নিরাকার এই অর্থে আমি এই বুঝি যে, মন যেরূপ নিরাকার বস্তু ঈশ্বর সেই অর্থে নিরাকার।

শি। মনকে যদি কোন বস্তু বিশেষ বল তবে উহা অবশ্যই কোন না কোন স্থান ব্যাপিয়া থাকিবে। যখন আমার মন, তোমার মন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মনের কথা বল তখন একটী মন অবশ্যই কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মনেরও আকার আছে বলিতে হইবে। যদি তুমি মনের স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম্ম অস্বীকার কর, তবে মনকে আর বস্তু বলিতে পার না। তাহা হইলে মনকে কোন না কোন স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তুর গুণ মাত্র বলিতে হইবে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনের কোন আকার স্বীকার করেন

না এবং এই জন্যই তাঁহারা মনকে আমাদের দেহস্থিত বস্তু সমষ্টির গুণ মাত্র বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের হিন্দুগণ দেহ ছাড়া মনের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এবং মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মন ভিন্ন ভিন্ন রূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে, এইরূপ কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। তুমি যে মনকে নিরাকার বস্তু বলিতেছ তাহার কারণ কি ?

ছা। মনের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই সকল গুণ নাই, এই জন্যই মনকে নিরাকার বস্তু বলি।

শি। সচরাচর যে সকল স্থুল দ্রব্যকে আমরা সাকার জ্ঞান করি তাহাদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গুণ অনুভব দ্বারাই তাহাদের আকার জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সেই জন্য আকার আছে বলিলেই তাহার রূপ রসাদি গুণের কোন না কোন গুণ আছে ইহা মনে হয়। কিন্তু রূপ রসাদি যে সকল গুণ আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয়ের বিষয়,মন নামক বস্তুরসে সকল গুণ নাই সুতরাং তাহার আকার কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলেন যে, যে সকল সাকার পদার্থের ঐ সকল স্থুল গুণ নাই ; আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাদের আকার নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। মানব স্থুল ইন্দ্রিয়ে অভিমানী না থাকিলে তাহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূক্ষ্ম বিকাশ হয় এবং সেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূক্ষ্ম সাকার বস্তুর আকার নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন। যখন তুমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিদ্রা যাও এবং স্বপ্ন দেখ তখন তুমি যে নানারূপ আকার দেখিতে পাও সে কাহার

আকার? তোমার নিজের মন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে যে আকার ধারণ করিয়া থাকে সেই সেই আকার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মে।

এখন বুঝিয়া দেখ যে, মনকে কোন বস্তু বিষয়ের গুণ না বলিয়া কোন বস্তু বলিলে উহার আকার আছে বলিতে হইবে। তবে সাধারণতঃ সাকার বস্তু বলিলে যেরূপ স্থূল সাকার বস্তু মনে হয়, মন সেরূপ সাকার নহে। স্থূল বস্তু সকল স্থূল জাতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু মন সূক্ষ্ম জাতীয় স্থান ব্যাপিয়া আছে। যাঁহারা স্থূল বস্তু ভিন্ন অন্য কোনরূপ সূক্ষ্ম বস্তুর অস্তিত্ব মানেন না তাঁহারা, মন যে এই স্থূল দেহ ছাড়া অন্য কোন বস্তু, ইহাও বলিতে পারেন না।

এক্ষণে দেখ মনকে যে অর্থে নিরাকার বল, ঈশ্বরকে সে অর্থে নিরাকার বলিতে পার না। মনকে বস্তু বলিলে মনকে কোন সীমাবদ্ধ বস্তু বলিতে হইবে। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই এই জন্যই তিনি নিরাকার।

নিরাকার শব্দের অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে ঈশ্বর নির্গুণ, এই শব্দে কি অর্থ বুঝা যায় বল দেখি।

চা। ঈশ্বর নির্গুণ এই কথাটির অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। যাঁহা হইতে এই জগতের সমস্ত পদার্থের গুণ জন্মিয়াছে, তাঁহাকে কি করিয়া নির্গুণ বলিতে পারি।

শি। যেমন সূর্য্য কিরণের বর্ণ, শ্বেত পীতাদি বর্ণ সকলের সমষ্টি বর্ণ, সেই রূপ এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে সেই সমুদয় গুণের সমষ্টি গুণ যে একটি অসীম গুণ, তাহাই ঈশ্বরের গুণ। যখন ঈশ্বরের বিশ্বরূপ কথাটির অর্থ বুঝাইব তখন সমষ্টি গুণ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিব। ঈশ্বরের এই অসীম গুণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয় হইতে পারে না।

কেননা যে গুণ সীমাবদ্ধ তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে কিন্তু যেগুণ কোন সীমাবদ্ধ নহে তাহা কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না।

ছা। সীমাবদ্ধ স্থান কথাটির অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু সীমাবদ্ধ গুণ কথাটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

শি। সীমা কথাটির অর্থ কি। এই সোনার বর্ত্তুলটি একটি সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, যখন এই কথা বলা যায়, তখন সীমা শব্দে কি অর্থ বুঝায়। এই বর্ত্তুলটি একটি স্থান ব্যাপিয়া আছে এবং সেই স্থানটি ছাড়া অন্য স্থান আছে। এই দুইটি স্থান যাহা দ্বারা পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়াছে তাহাই এই বর্ত্তুলটির সীমা। সেইরূপ যখন লোহিত বর্ণ, এই গুণ সম্বন্ধে ভাবি, তখন এই বর্ণটি লোহিত বর্ণ এবং লোহিত বর্ণ নয় এমন বর্ণও আছে, ইহা বুঝিয়া থাকি। যাহা লোহিত এবং যাহা লোহিত নয় এই উভয়ের প্রভেদ বিচার করিয়াই লোহিত বর্ণটি কি তাহা বুঝিতে পারি। যখনই একটি গুণকে অন্য গুণ হইতে পৃথক ভাবিব অমনই বলিব যে, সেই গুণটির একটি সীমা আছে।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল গুণের জ্ঞান জন্মে সে সকলেরই সীমা আছে। ইন্দ্রিয় গুলি একটি হইতে আর একটির প্রভেদ দেখাইয়া দেয় বলিয়াই গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। আমাদের গুণ সম্বন্ধে যত জ্ঞান সকলই আপেক্ষিক অর্থাৎ একটি গুণের জ্ঞান অন্য গুণের জ্ঞানের উপর অপেক্ষা করে। ইংরাজীতে ইহাকে Relativity of Knowledge বলে। গুণ জ্ঞান আপেক্ষিক; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণ মাত্রেরই সীমা আছে। যদি দুঃখ কাহাকে বলে না জানিতাম তবে সুখ কাহাকে বলে বুঝিতাম না। যেখানে সুখের শেষ, সেই খান হইতে দুঃখের সীমা আরম্ভ। যেখানে অজ্ঞানের শেষ সেই খান হইতে জ্ঞানের সীমা আরম্ভ। কিন্তু ঈশ্বরের যে গুণ আছে বলিয়াছি, তাহার সীমা নাই।

সুতরাং তাহা কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এই জন্য আমরা যাহাকে সগুণ বলিয়া বুঝি ঈশ্বর তাহা নহেন। ঈশ্বর নির্গুণ।

ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই, এই কথাটির অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা চাই। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, বারান্তরে সে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় উক্তি।

কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে যে যেরূপ সংকল্প করা যায়, কর্ম্ম সম্পাদন কালে সেরূপ দাঁড়ায় না। প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ কালে আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, প্রচারে উপন্যাস থাকার কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এখন বিশেষ আপত্তি দেখিতেছি। প্রচারের আকার ক্ষুদ্র, কিন্তু উদ্দেশ্য গুরুতর। ইহাতে উপন্যাস দিতে গেলে একবারে এক পরিচ্ছেদের বেশী দিবার স্থান হয় না। কিন্তু উপন্যাস অত একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকিলে, তাহাতে কোন রস থাকেনা। পাঠকের তাহা রুচিকর হউক না হউক, উপন্যাস লেখকের তাহাতে বিশেষ আপত্তি। লেখক বলিতে পারেন, এবং "সীতারাম" লেখক বলিয়া থাকেন, যে ইহাতে উপন্যাসের মর্য্যাদা থাকেনা।

অতএব আমরা এ সংখ্যায় সীতারাম প্রকাশিত করিলাম না। এবং ভবিষ্যতে করিবারও ইচ্ছা নাই। তবে, পাঠকদিগের নিকট স্বীকৃত আছি যে, তাঁহাদিগকে "সীতারাম" উপহার দিব। আমার সে অঙ্গীকার যতদূর পারি রক্ষা করিব। সীতারাম সম্পূর্ণ হইয়া শীঘ্র পুনর্মুদ্রিত হইবে। পুনর্মুদ্রিত হইলে, প্রচারের পাঠকদিগকে অর্দ্ধেক মূল্যে পুস্তক দিবেন, গ্রন্থকারের এমন অভিপ্রায় আছে।

পঞ্চভূত।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায্যে আমরা আজ কাল দ্রব্য ও দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়াছি যে দ্রব্যের গুণ দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ কোন না কোন গতিক্রিয়া মাত্র। দ্রব্যের রূপ রসাদিগুণ যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হয় তাহা কোন না কোন শক্তিক্রিয়া জনিত জ্ঞান মাত্র। এই গতিক্রিয়ার আধারের নাম বস্তু বা দ্রব্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে ইহা দেখা যায় যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই জড় জগতের সমস্ত ঘটনাই যে কোন একমাত্র আধারের ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতিক্রিয়া (motion), ইহাই প্রমাণ করিবার পথে অগ্রসর হইতেছেন।

যাহাকে আমরা আলোক বলি তাহা ইথর নামক দ্রব্যের অণু সকলের কম্পন জনিত; ইথর সমুদ্রে উত্থিত তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ ইথরসমুদ্রের তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর স্নায়ুতে আঘাত করাতে যে স্নায়বীয় কম্পন জন্মে তাহাতেই আমাদেয় আলোক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া পাশ্চাত্যগণকে ইথর নামক এক প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ ইথরের কম্পন জন্য দ্রব্যের বর্ণ বিষয়ক গুণ জন্মিয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন রূপ গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে তেজ নামক এক প্রকার বস্তু আছে, এবং তাহা থাকাতেই দ্রব্যের রূপ গুণ জন্মিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা আর হিন্দু শাস্ত্রকারগণদের কথা মিলাইয়া দেখিলে এক

জনদের ইথর আর এক জনদের তেজ দুটি যে একই অর্থ-বোধক ইহা বোধ হয়।

দ্রব্যের বর্ণ বিষয়ক জ্ঞান যেমন আমাদের স্নায়ুর কম্পন বশতঃ জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ক জ্ঞানও স্নায়ুর কম্পন বশতঃ জন্মিয়া থাকে। যে প্রকার অণুর কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর কম্পন জন্মে, তাহার নাম যেমন ইথর বা তেজ, সেই রূপ যেরূপ অণুর কম্পনে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুব কম্পন জন্মে তাহার নাম ক্ষিতি। যেরূপ অণুর কম্পনে রসনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুব কম্পন জন্মে তাহার নাম অপ, এবং অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও এইরূপ।

হিন্দু ঋষিগণ মতে এই পাঁচ প্রকার ভূতের অণু লইয়া বাহ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হিন্দুদের এই মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা, এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মে নাই। হিন্দু ঋষিগণ সূক্ষ্মানুভূতি শক্তির সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন দ্বারা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যেমন যেমন অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই শাস্ত্রে নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যদি কেহ তাঁহাদের মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তবে দ্রব্যের পরমাণু সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ তথ্য অবগত আছেন, তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে। আজ কাল পাশ্চাত্য-গণ স্পষ্টই স্বীকার করেন যে যদিও তাঁহারা দ্রব্যের পরমাণু সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে দু এক কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের সূক্ষ্ম পরমাণু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান (Knowledge of the ultimate nature of atoms) কিছুই নাই।

হিন্দুঋষিগণের পঞ্চভূত সম্বন্ধীয় মতকে যখন ভ্রান্ত বলিতে পারি না, তখন তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার অর্থ

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তত দূর বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

এই জড় জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই সকলই একই প্রকার বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতিক্রিয়া মাত্র, পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। পাশ্চাত্যগণ যাহা আজকাল ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, কত শত কাল পূর্ব্বে সাংখ্যকার তাহাই অভ্রান্ত জ্ঞানে শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াগিয়াছেন যে একমাত্র আকাশ ভূত হইতেই বায়ু তেজ, অপ ও ক্ষিতি ভূত উদ্ভূত হইয়াছে এবং এই পঞ্চভূতের পঞ্চ প্রকার পরমাণু লইয়াই এই বাহ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আকাশ মহভূতের বিকারে বায়ু, বায়ুর বিকারে তেজ এবং তেজের বিকারে অপ্ ও অপের বিকারে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে।

এই বিকার কথাটির অর্থ প্রথমে বুঝিতে হইবে। মৃত্তিকার রাশি হইতে কিয়দংশ মৃত্তিকা লইয়া তাহাতে একটি বিশেষ আকার দিয়া একটি ঘট নির্ম্মাণ করিলাম। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঐ ঘটকে মৃত্তিকার বিকার বলিয়া থাকেন। সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে কিয়দংশ জল আবর্ত্তাকারে পরিণত হইলে ঐ বিশেষ আকার প্রাপ্ত আবর্ত্তকে সমুদ্রের বিকার বলা যায়। সেইরূপ ঋষিগণ যখন বলেন যে আকাশের বিকারে বায়ু উৎপন্ন হয়, তখন উহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আকাশের অণু সকল হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়, কিন্তু বায়ুর একটি পরমাণু কোন বিশেষ আকার পাওয়াতে আকাশ হইতে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান হয়।

যে পরমাণু শব্দটি ব্যবহার করিলাম তাহা কি অর্থে ব্যব-

হার করিলাম তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। খানিকটা বায়ুকে ক্রমাগতভাগ করিতে করিতে এমন যে সূক্ষ্ম অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে পুনরায় ভাগ করিতে গেলে তাহার বায়ুর গুণ আর থাকিবে না, তাহাকে বায়ুর পরমাণু বলা যায়। ইংরাজী Atom শব্দের অর্থ, যাহাকে ভাগ করিতেপারা যায় না। কিন্তু যতই সূক্ষ্ম অংশ হউক না, তাহাকে পুনরায় ভাগ করিতে পারা যায় না, ইহা কল্পনা করিতে পারি না। ইংরাজী Atom কথাটি আর আমাদেয় পরমাণু কথাটীর অর্থের পার্থক্য জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বায়ুর একটি পরমাণুকে ভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাগ করিলেই উহাতে আর বায়ুর গুণ থাকিবে না, আকাশের অংশ রূপ পরিগণিত হইবে।

আকাশের কিয়দংশ কিরূপ বিশেষ আকার পাইয়া বায়ুর অণু রূপে পরিগণিত হয়, তাহা সর উইলিয়ম টমসনের থিওরি অফ্ অ্যাটমস্ (Theory of atoms) বুঝিলে এক রকম ধারণা করিতে পারা যায়।

আজ কালকার কেমিষ্ট্রী শাস্ত্র হইতে এই পাওয়া যায় যে যে জড় জগতে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দেখা যায় তাহা অক্সিজন হাইড্রোজন আদি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকলের পরমাণু সকল কোন একই দ্রব্যের বিকার মাত্র, কিম্বা উহারা জগতের আরম্ভ হইতেই ঐ রূপ ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া আছে—এই চিন্তা অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গণের মনে উদয় হয়। সেই বিভিন্নতার পশ্চাতে একটি অভিন্ন ভাব আছে, এইটি তাঁহাদের মনে যেন কোথা হইতে আসিয়া উদয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকল যে কোন এক এলিমেণ্ট হইতে

উদ্ভূত হইয়াছে, পাশ্চাত্য গণ ইহা অনুমান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে সর্ উইলিয়ম টমসন বলেন যে এলিমেণ্ট সকলের এক একটি পরমাণু কোন একমাত্র সূক্ষ্ম পদার্থে ব্যাপ্ত দেশে উত্থিত এক একটী আবর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমাণুকে এইরূপ ঘূর্ণিতগতিবিশিষ্ট (Vortex motion) আবর্ত্ত স্বরূপ মনে করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণাদি গুণ কিরূপ সম্ভব হয়, তাহা তিনি গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ আবর্ত্ত সমূহের মধ্যে কোন একটী আবর্ত্ত অন্যগুলি হইতে সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত থাকে। তামাক খাইতে খাইতে তামাকের ধূঁয়া গোল গোল করিয়া ছাড়িয়া দিয়া ইহা দেখা যায় যে, কোন একটী আবর্ত্ত বাতাসে উড়িতে উড়িতে অন্যটীর নিকবর্ত্তী হইয়া উহাকে স্পর্শ করিলেও দুটীতে মিলিয়া এক হইয়া যায় না। দুটী আবর্ত্ত এরূপ কাছাকাছি হইলেই আবার সরিয়া পড়িয়া উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন থাকে। ঐরূপ স্বতন্ত্র ভাব পরমাণুর একটী বিশেষ ধর্ম্ম। এবং ঘূর্ণিত গতি বিশিষ্ট আবর্ত্তের এইরূপ ভাব দেখিয়া, ও ঘূর্ণিত গতি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে স্থির করিয়া, সর্ উইলিয়ম টমসন ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পরমাণু সকল কোন একইরূপ বস্তু দ্বারা ব্যাপ্ত সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্ত মাত্র।

হিন্দুদার্শনিক গণও বলেন যে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সকল দেখিতেছ, ইহারা একই সরিতের ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্ত বই আর কিছুই নহে। সেই জন্য সাংখ্যকার যখন বলেন যে বায়ু ভূত আকাশের বিকারমাত্র, তখন আমরা এইরূপ বুঝি যে আকাশ

নামক দ্রব্যে ব্যাপ্ত একটি মহাসমুদ্রে উদ্ভূত আবর্ত্ত সকলই বায়ুর পরমাণু। এই বায়ুর অণুর কম্পন জনিত আমাদের যে ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাহার নাম স্পর্শ।

যেমন আকাশ নামক বস্তুর পরমাণু সকল দ্বারা ব্যাপ্ত দেশে উত্থিত আবর্ত্তকে বায়ুর পরমাণু বলিয়া বুঝিলাম, সেইরূপ এই বায়ুর পরমাণু লইয়া উত্থিত আবর্ত্তকে তেজের পরমাণু বলে। আবার তেজের কতকগুলি পরমাণু ঘুর্ণিত গতি বিশিষ্ট হইয়া যে আবর্ত্ত হয়, তাহার নাম অপ্, এবং অপ্ দ্বারা ব্যাপ্ত দেশের আবর্ত্তকে ক্ষিতি কহে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে এই পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত। বাহিরের তেজের কম্পন দেহস্থ তেজে গঠিত দর্শনেন্দ্রিয়ে আঘাত করে, তাহাতে দর্শন জ্ঞান জন্মে। বাহিরের আকাশের কম্পন জন্য দেহের আকাশে গঠিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের কম্পন জন্মে, তাহাতে শব্দ জ্ঞান জন্মায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ঐরূপ।

অনেকে বলিবেন যে বাতাসের তরঙ্গ আমাদের কর্ণে আঘাত করাতেই শব্দ জ্ঞান হয়, ইহাই ত বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে। তবে আকাশের অণুর কম্পন হইতে শব্দ উত্থিত হয়, একথা বলি কেন? হিন্দু ইহার উত্তর এই দিবেন, যে তুমি যাহাকে বাতাস বলিতেছ, তাহাতে আকাশের ভাগ আছে, এই জন্য বাতাসে শব্দ গুণ আছে। জলের মধ্যে ডুব দিয়া জলের ভিতরকার শব্দ শোনা যায়, তখনত বাতাসের তরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে আঘাত করে না, তবে বাতাসের তরঙ্গকে কেমন করিয়া শব্দ বলিতে পার। জলে ও আকাশ আছে, সেই জন্য জলের ভিতর শব্দ শুনা যায়।

যেরূপ সূক্ষ্ম পদার্থে আমাদের যে ইন্দ্রিয় গঠিত, সেইরূপ সূক্ষ্ম

পদার্থের কম্পনে আমাদের সেই ইন্দ্রিয় কম্পিত হয়, এই কথাটি একটু ভাবিলেই বুঝা যায়। স্থূল পদার্থের গতিতে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় কম্পিত হয় এবং সূক্ষ্ম পদার্থের গতি ক্রিয়ায় আমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ক্ষোভিত হয়। একটি তপ্ত লোহার গোলার গতি দ্বারা আমাদের স্থূল দেহ গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ লোহার অভ্যন্তরস্থ আণবিক গতিক্রিয়া অর্থাৎ তাপ আমাদের স্নায়ুর গতি উৎপাদন করিয়া উষ্ণতার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এইরূপ সূক্ষ্মের ক্রিয়া সূক্ষ্মের উপর এবং স্থূলের ক্রিয়া স্থূলের উপর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা যদি মানা যায়, তবে ইহা বুঝিতে পারা যায়, যে যেরূপ অণুর কম্পনে এক জাতীয় জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ অণুর কম্পনেই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান জন্মান সম্ভব নহে। সুতরাং যেরূপ অণুর কম্পনে শ্রবণজ্ঞান জন্মায় এবং যেরূপ অণুর কম্পনে দর্শন জ্ঞান জন্মায়, তাহা ভিন্ন জাতীয় হওয়াই সম্ভব। হিন্দুগণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে যে পঞ্চ প্রকার দ্রব্যের গুণ বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়।

এখন একটি কথা আছে তাহা এই যে, যাহার গুণ শব্দ, অর্থাৎ যাহার অণুর কম্পনে শব্দ জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে আকাশ বলা হইল কেন? যাহার গুণ স্পর্শ, তাহার নাম বায়ু দেওয়া হইল কেন? যাহার গুণ গন্ধ, তাহাকে ক্ষিতি বলা হয় কেন? বায়ু অর্থে বাতাস, ক্ষিতি অর্থে মাটি, এই ত সাধারণতঃ বুঝা যায়।

ইহার কারণ এই, সাধারণতঃ আমরা যাহাকে বায়ু বলি, তাহাতে স্পর্শগুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে, যাহাকে জল

বলি তাহাতে রসগুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে, যাহাকে ক্ষিতি বলি তাহাতে গন্ধ গুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধে এইরূপ।

ক্ষিতি আদি পঞ্চভূতে, গন্ধ আদি পাঁচটি গুণ ক্রমান্বয়ে আছে, এই কথাটি ঠিক্ হইলেও সাংখ্যকার বলেন যে বায়ু ভূত আকাশ ভূত হইতে উদ্ভূত হওয়াতে উহাতে আকাশেরও গুণ আছে, বায়ুর ও গুণ আছে, অর্থাৎ উহার শব্দ ও স্পর্শ দুটি গুণই আছে। তেজের শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ আছে এবং ক্ষিতির পাঁচটি গুণই আছে।

এখন দেখ যাহাকে আমরা সচরাচর বায়ু বলিয়া থাকি, তাহাযদিও পাঁচটি ভূতেরই মিশ্রণে গঠিত বটে কিন্তু উহার শব্দ ও স্পর্শ গুণই প্রধান। অর্থাৎ বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি। উহার রূপ, রস ও গন্ধ গুণ আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য স্পর্শ গুণাত্মক ভূত যাহা আকাশের বিকার বলিয়া শব্দ গুণাত্মকও হইয়া থাকে, তাহাকে মরুৎ বলা হইয়াছে। ঐরূপ অগ্নি শিখার রূপ আছে, স্পর্শ আছে * কিন্তু রস বা গন্ধ গুণ নাই, এই জন্য রূপ গুণাত্মক ভূতের নাম তেজ। জলে রস আছে, রূপ আছে, স্পর্শ আছে, শব্দ আছে কিন্তু গন্ধ গুণ নাই, এই জন্য রস গুণাত্মক ভূতকে অপ্ কহে এবং মাটির সকল গুণই আছে, তাই উহা হইতে ক্ষিতি ভূতের নাম করণ। কেবল মাত্র শব্দ গুণ আছে, এরূপ দ্রব্য সাধারণে জানা নাই কিন্তু যোগীগণ ঐবস্তুর সত্ত্বা অনুভব

*—শব্দ গুণ আছে কি না বুঝিতে পারা যায় না।

করিতে পারিতেন। ঐ পদার্থ জানা শুনা কোন বস্তুর ন্যায় নহে, সেই জন্য উহার নাম আকাশ।

ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লালসায় হিন্দু যোগীগণ নিজের আত্মার সহিত বিশ্বের আত্মার যোগ করিবার জন্য যে যোগ মার্গ অবলম্বন করিতেন, ভূতশুদ্ধি তাহার প্রথম সোপান। তাই পঞ্চভূত সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিলাম।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

দেবতত্ত্ব।

আমরা দেখিয়াছি যে বেদের ইন্দ্রাদি দেবতারা কেহ বা আকাশ, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা অগ্নি, কেহ বা নদী ; এইরূপ অচেতন জড়পদার্থ মাত্র। বেদে এইরূপ অচেতন জড়পদার্থের উপাসনা কেন? এরূপ উপাসনা কোথা হইতে আসিল? ইহার উৎপত্তির কি কোন কারণ আছে? অদ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে কেবল বৈদিক হিন্দুরাই এই ইন্দ্রাদির উপাসনা করিতেন না। পৃথিবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাতি ইঁহাদিগের উপাসনা করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। সেই সকল জাতিমধ্যে এই দেবতাদিগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। আমরা কেবল প্রাচীন আর্য্যজাতিসম্ভূত যোন, রোমক প্রভৃতি জাতিদিগের কথা বলিতেছি না। হিন্দুরা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ

করিয়াছে, তাহারাও সেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচলিত থাকিবে ইহা বিস্ময়কর নহে। বিস্ময়কর এই যে, যে সকল জাতির সঙ্গে আর্য্যবংশীয়দিগের বংশগত, স্থানগত, বা অন্য কোনপ্রকার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই ইন্দ্রাদির উপাসনা প্রচলিত। আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা পলিনেসিয়ার অভ্যন্তর বাসীদিগের মধ্যেও এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা প্রচলিত। আমরা কতক গুলি উদাহরণ দিব। অধিক উদাহরণ সঙ্কলনের জন্য প্রচারের স্থান নাই। উদাহরণ দিবার পূর্ব্বে আমাদের দুইটী কথা বলিবার আছে।

প্রথম, হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চাত্য লেখকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকদিগের তুষ্টির জন্য দুই একবার আপন মতের পোষকতায় পাশ্চাত্য লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক। এবং আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিলিলে সেরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এখানে ইয়ুরোপের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই, কেননা কোন হিন্দুই আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদিম বাসীদিগকে দেখিয়া আইসে নাই।

দ্বিতীয়, আমরা প্রধানতঃ অসভ্যজাতিদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ উদাহরণ গ্রহণ করিব। ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, আমরা হিন্দুদিগকে অথবা প্রাচীন বৈদিক হিন্দুদিগকে, অসভ্য জাতি মধ্যে গণ্য করি। ইহা আমরা বলিতে স্বীকৃত আছি যে, বৈদিকহিন্দুরা যে সকল কথা বুঝিয়াছিলেন, ইউরোপে

সভ্যজাতিরাও তাহার অনেক কথা এখনও বুঝেন নাই। তবে সাদৃশ্য এই যে বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অবস্থা, আর আমরা যে সকল অসভ্যজাতিদের কথা বলিব, তাহাদেরও ধর্ম্মের প্রথম অবস্থা।

এক্ষণে আমরা উদাহরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ ইন্দ্রদেবতাই আমাদের উদাহরণ হউন। প্রমাণ করিয়াছি যে ইন্দ্র বৃষ্টি-দেবতা। শ্বেত-নীল-নদীতীরবাসী দিঙ্ক নামে জাতি ইন্দ্রকে দেন্দিদ নামে উপাসনা করে। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় স্বর্গবাসী প্রধান দেবতা। 'ডমর' নামে অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে 'ওমাকুরু' নামে দেবতা বৃষ্টি-দেবতাও বটে, সর্ব্বপ্রধান দেবতাও বটে। ইনিই ডমরদিগের ইন্দ্র। আমেরিকার আদিম জাতিদিগের মধ্যে দুইটী সভ্য-জাতি ছিল,—মেক্সিকোর আদিমবাসী 'অজতেক' এবং 'পিরুর আদিমবাসী 'ইঙ্কা' দিগের প্রজা। অজতেকেরা ত্লালোকের উপাসনা করিত। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় আকাশ দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বজ্রী। পিরুবাসীদিগের মধ্যে ইন্দ্র, দেব নহেন, দেবী। নিকারাগুয়াবাসীদিগের মধ্যে বৃষ্টিদেবতার পূজা আছে। ভারতবর্ষীয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে উড়িষ্যার খন্দেরা পিজ্জুপেন্নু নামে বৃষ্টিদেবতার পূজা করে। কোলেদের বড় পর্ব্বতকে তাহারা মরংবুরু বলে। তিনিই ইহাদের বৃষ্টিদেবতা। পূর্ব্বে আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে রোমকদিগের জুপিটার আমাদিগের দ্যৌষ্পিতৃ। কিন্তু দ্যৌঃ ত কেবল আকাশ, রোমকেরা কেবল আকাশের উপাসনায় সন্তুষ্ট নহেন। বৃষ্টিকারী আকাশের উপাসনা চাই। এজন্য তাঁহারা জুপিটার প্লুবিয়স, অর্থাৎ বৃষ্টি-

কারী আকাশের উপাসনা করিতেন। ইনি রোমকদিগের ইন্দ্র।

অগ্নিকে দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। পৃথিবীতে বিশেষতঃ আসিয়া প্রদেশে, অগ্নির উপাসনা বড় প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার ডিলাবরেরা অগ্নিদেবতাকে আমেরিকার আদিমবাসীদিগের আদি পুরুষ (মনু) বলিয়া বৎসরে বৎসরে উপাসনা করে। অর্ভিঙের লিখিত পুস্তকে জানা যায় যে, চিনুক নামে আমেরিকার প্রান্তবাসী আদিমজাতিরা অগ্নির পূজা করিত। সভ্য মেক্সিকো বাসীদিগের মধ্যে অগ্নি একজন প্রধান দেবতা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নামটী এত দুরুচ্চার্য্য যে আমরা তাহা বাঙ্গলায় লিখিতে পারিলাম না।* পলিনেসিয়াতে মহুইকা নামে এবং আফ্রিকার ডাহোমে প্রদেশে জো নামে অগ্নি পূজিত। আসিয়া প্রদেশে কঞ্চড়লেরা সব পূজা করে এবং অগ্নিও পূজা করে। জাপানপ্রদেশস্থ য়েসো প্রদেশে অগ্নিই প্রধান দেবতা। তুঙ্গুজ মোগল এবং তুর্ক জাতীয়েরা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে। টইলর সাহেব মোগলদিগের † একটী বিবাহ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ঋগ্বেদের অগ্নি সূক্ত মনে পড়ে।

ইতিহাসে বিখ্যাত আসিরিয়া, কালদিয়া, ফিনিসিয়া, প্রভৃতি দেশের লোকেরা প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল।

*Xiuhteuctli; also Huehueteotl.

† আমরা যাহাদিগকে মোগল বলি তাহারা যথার্থ মোগল নহে। আরব্য বা পারস্য হইতে আসিয়া যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে আমরা তাহাদিগকেই মোগল বলি। তাহারা মোগল নহে। মধ্য আসিয়ায় মোগল নামে একটী ভিন্ন জাতি আছে।

প্রাচীন পারস্যবাসীরা বিখ্যাত অগ্নির উপাসক এবং তাহাদিগের বংশ, বোম্বাইয়ের পার্সীরা অদ্যাপিও বিখ্যাত অগ্নির উপাসক। ইউরোপেও গ্রীকদের মধ্যে Vulcan, Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। তৎপরবর্ত্তী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রাচীন প্রুসিয়েরা এবং রুষিয়েরা এবং লিথুয়ানীয়েরা অগ্নির পূজা করিত। এখনও ইউরোপে একটু একটু অগ্নিপূজা আছে। উদাহরণস্বরূপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।*

সূর্য্যোপাসনা জগতে অতিশয় বিস্তৃত। সভ্য এবং অসভ্য সকলেই তাঁহার উপাসনা করে। আমেরিকায় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে হডসন বের উপকূলবাসী আদিমজাতিরা প্রাতঃসূর্য্যের উপাসনা করে। বঙ্কুবর দ্বীপবাসীরা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের

* "The Esthonian bride consecrates her new hearth and home by an offering of money cast into the fire, or laid on the oven for Tule-Ema, fire mother. The Carinthian peasant will "fodder" the fire to make it kindly and throw lard or drippiug to it, that it may not burn his house. To the Bohemian it is a godless thing to spit into the fire, God's fire as he calls it. It is not right to throw away the crumbs after a meal, for they belong to the fire. Of every kind of dish some should be given to the fire and if some runs over, it is wrong to scold, for it belongs to the fire. It is because these rights are now so neglected that harmful fires so often break out."

PRIMITIVE CULTURE, P. P. 285.

উপাসনা করে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে সূর্য্য দ্বিতীয় দেবতা। বর্জিনিয়ার আদিমবাসীরা উদয় এবং অস্তকালে সূর্য্যের উপাসনা করিত। পোত্তবিতুমিরা ছাদের উপর উঠিয়া সূর্য্যের ভোগ দিত। আলগোঙ্কুইন দিগের চিত্র লিপি মধ্যে সূর্য্যের চিত্র প্রধান দেবতার চিত্রের স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। সিউস জাতিরা সূর্য্যকে জগতের সৃজনকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তার স্বরূপ বিবেচনা করে। ক্রীক্‌জাতিরা সূর্য্যকে ঈশ্বরের প্রতিমা স্বরূপ বিবেচনা করে। আরৌকানিয়েরা সূর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। পুয়েল্‌চেরা সূর্য্যের নিকট সকল মঙ্গল কামনা করে। টুকুমানবাসীরা সূর্য্যের মন্দির গঠন করিয়া, তন্মধ্যে তাঁহার উপাসনা করে। লুইসিয়ানাবাসী নাচেজ জাতিদিগের মধ্যে সূর্য্যের পুরোহিতেরাই রাজা হইত এবং সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক রীতিমত প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করিত। ফ্লোরিদার আদিমবাসী অপলশেরা প্রকৃত সৌর ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যা কালে সূর্য্য উপাসনা করিত এবং বৎসরে চারিবার সূর্য্যের উৎসব করিত। এ দেশে দুর্গাপূজায় যেমন ঘটা, মেক্সিকো নিবাসী অজতেকদিগের মধ্য সূর্য্যপূজার সেই রূপ ঘটা ছিল। তাহাদিগের নির্ম্মিত সূর্য্যের বৃহৎ স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং প্রেস্কটের মনোহর রচনায় এই সূর্য্যের ভীষণ উপাসনা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সূর্য্যকেই অজতেকেরা ঈশ্বর বলিয়া মানিত। দক্ষিণ আমেরিকার বোগোটা নিবাসী মুইস্কা জাতিরা সূর্য্যের নিকট নরবলি দিত। পিরুর সূর্য্যোপাসনা অতি বিখ্যাত এবং পিরুবাসীদিগের জীবনের সমস্ত কর্ম্ম এই সূর্য্যোপাসনার দ্বারা শাসিত হইত। পিরুর রাজারা আমাদিগের রামচন্দ্রাদির ন্যায়

সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যের প্রতিনিধি বলিয়া রাজ্য করিতেন। পিরুদেশে স্বর্ণখচিত অসংখ্য সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যের স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল সর্ব্বলোকের দ্বারা উপাসিত হইত।

ভারতবর্ষীয় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বোড়ো ও ধীমাল জাতিরা সূর্য্য উপাসনা করে। বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ড, ওরাঁও এবং সাঁওতাল জাতিরা সিংবোঙ্গা নামে সূর্য্যদেবের উপাসনা করে। উড়িষ্যার খন্দদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবের নাম বুড়াপেন্নু। তিনি স্রষ্টা এবং বিধাতা। তদ্ভিন্ন তাতার, মঙ্গল, তুঙ্গুজ, সাইবিরিয়া বাসীরা এবং লাপ জাতিরা সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন পারসিকদিগের সূর্য্যোপাসনার কথা বলিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতা হিলিয়স্ বা আপোলন নামে উপাসিত হইতেন। সক্রেটিস্ প্রভৃতিও তাঁহার উপাসনা করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে গ্রীক প্রভৃতি আর্য্যজাতিদিগের দেবোপাখ্যান সকল অধিকাংশই সৌরোপন্যাস—সূর্য্যরূপক। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা অবগত থাকিতে পারেন।

প্রাচীন মিসরবাসিদিগের মধ্যে সূর্য্যোপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৈদিক হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারাও সূর্য্যের নানা মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। এক মূর্ত্তি রা আর এক মূর্ত্তি ওসাইরিস, তৃতীয় মূর্ত্তি হার্পক্রোতি*। প্রাচীন সিরীয়, ও

* Harpokrates,

আসিরীয়, ও টিরীয় দিগের মধ্যে সূর্য্য বালসমেস্, বেল বা বাল নামে উপাসিত হইতেন। সিরিয়া হইতে সূর্য্যোপাসনা রোমকে আনীত হইয়াছিল। এই সূর্য্যদেবের নাম এলোগবল্। তাঁহার পুরোহিত হেলিওগবলস্ রোমকের একজন সম্রাট হইয়াছিলেন। পরে রোমক খৃষ্টান হইলেও খৃষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সূর্য্যোপাসনা চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। যেখানে সূর্য্যোপাসনা লুপ্ত হইয়াছে, সেখানেও খৃষ্টমস্ প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার উপাসনার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পক্ষান্তরে, বিদুইন আরবেরা মুসলমান হইয়াও অদ্যাপি সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

চতুর্থ উদাহরণ স্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ করি। ইন্দ্রাগ্নিসূর্য্যের ন্যায় বায়ুরও উপাসনা বহুদেশে প্রচলিত। আলগঙ্কুইন জাতিদিগের বায়ুদেবচতুষ্টয়ের উপাখ্যান লংফেলো কৃত Hiawatha নামক কাব্যে বর্ণিত আছে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, এই চারিটী দেবতা চারি প্রকার বায়ু মাত্র। ইরকোয়া জাতিদিগের মধ্যে বায়ুর অধিপতি দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায়ু এবং মরুদ্গণ পৃথক পৃথক দেবতা, অসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও তেমনি কোথাও বায়ু কোথাও মরুদ্গণ পূজিত। পলিনেসীয়দিগের মধ্যে মরুদ্গণের পূজা আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতরু এবং তৈরিবু। বন্ধুজন ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাকিলে উহারা এই মরুদ্গণের পূজা করে। উহাদিগের বিশ্বাস, ঐ পূজায় প্রার্থনামত ঝড় বন্ধ হয় এবং প্রার্থনামত ঝড় উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলেসিয়ার উপদ্বীপ মধ্যে মৌই প্রধান দেবতা। তিনি কোন কোন স্থানে বায়ু দেবতা

বলিয়া পূজিত হন। টাহিটীতে তিনি পূর্ব্ব বায়ু। নবজিল্যাণ্ডে তিনি বায়ুগণের শাসনকর্ত্তা। ফিন্‌জাতিদিগের প্রধান দেবতা উক্কো ঝড়ের অধিপতি। গ্রীকদিগের মধ্যে বোরিয়স্, জেফিরস্ এবং ইয়লস্ বায়ু দেবতা। হার্পিগণ মরুদ্দেবতা। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দিগের বিখ্যাত ওডিন মরুদ্দেবতা। এই মরুদ্দেবের পূজার চিহ্ন আজ্‌ও ইউরোপে বর্ত্তমান আছে। কারিন্থিয়ার কৃষকেরা মাংসপূর্ণ কাষ্ঠপাত্র গাছে ঝুলাইয়া দিয়া বায়ুদেবকে ভোগ দেয়। জার্ম্মনির অন্তর্গত স্বাবিয়া, টাইরোল এবং উপর-পালাটিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে ঝড়কে ঐরূপ মাংস উপহার দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে জলেশ্বর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। পুরাণে তিনি কেবল জলেশ্বর। গ্রীকদিগের মধ্যেও বরুণ এইরূপ দুই ভাগ হইয়াছেন। য়ুরেনস্ (Uranos) আকাশ বরুণ এবং পোসাইডন (Poseidon) বা নেপ্‌চুন (Neptune) জলবরুণ। অসভ্য জাতি-দের মধ্যেও এই দ্বিবিধ বরুণের উপাসনা আছে। আকাশ বরুণের কথা আমরা পরে বলিব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণেরই কথা বলি। পলিনেসিয়া প্রদেশে তুয়ারাতাই এবং রুয়াহাতু এই দুই জলেশ্বর বরুণ উপাসিত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান জাতিদিগের মধ্যে জলেশ্বরের পূজা খুব ধূমধামের সহিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশেও জলেশ্বরের পূজা আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পিরুবাসীরা মামাকোচা নামে সমুদ্রদেবের পূজা করে। পূর্ব্ব আসিয়ায় কামচকট্‌কা প্রদেশে মিৎক্ নামে জলেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন। জাপানে দ্বিবিধ জলেশ্বর আছেন। স্থলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম

মিথস্নো্কামি এবং জলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম জেবিস্নু।

আগামী সংখ্যায় আমরা আর দুইটী বৈদিক দেবতাকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিব। পরে যে তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি, তাহার অবতারণা করিব।

কৃষ্ণচরিত্র।

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কি করা কর্ত্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ফুরাইল, উৎসব যাহা ছিল তাহা ফুরাইল, কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া বলদেবকে সঙ্গে লইয়া যেখানে ভার্গব কর্ম্ম-শালায় ভিক্ষুক বেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন, সেই খানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে কখন সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না, কেন না মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে "বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করি-লেন।" বলদেবও ঐরূপ করিলেন। যখন আপনার পরি-চয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে,

পূর্ব্বে পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃস্বস্থপুত্র বলিয়াই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ লৌকিক ব্যবহার অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণ ও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয় পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহ সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি "কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটী কোটী রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।" এ সকল পাণ্ডবদিগের তখন ছিল না; কেন না তখন তাঁহারা ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন। অথচ এসকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির "কৃষ্ণ প্রেরিত দ্রব্য সামগ্রী সকল আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।" কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে গমন

করিলেন। তার পর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। যে প্রকারে দৈবগতিকে পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্ত মাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রত স্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্ম্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত ক্রূর এবং পাপাচারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকিলে এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থূল কথা এই, যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সদ্বৃত্তির ন্যায় প্রীতিবৃত্তি ও পূর্ণ-বিকশিত ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্ব্ব বর্দ্ধিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্র-জনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম—বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবঞ্চ দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খুঁজিয়া লইয়া, আপনার কার্য্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্য্যটি একটি ক্ষুদ্র কার্য্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদমায়েসেও চেষ্টা চরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মা-ত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা। তাই, আমরা কৃষ্ণকৃত

ছোট বড় সকল কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে কেবল "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা এবং প্রক্ষিপ্ত, তাহা দ্রোণবধ পর্ব্বাধ্যায় সমালোচনা কালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

এই বৈবাহিক পর্ব্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বড় তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। দ্রুপদরাজ কন্যার পঞ্চস্বামী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে, একটী উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটী রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে তুমি কেন কাঁদিতেছ? তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে "আইস দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ

করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি-লেন, সেখানে তাঁহার মত আর চারিটী ইন্দ্র আছেন! শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও। সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন!!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে তুমি গিয়া ইহাদিগের পত্নী হও। সে দ্রৌপদ হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর কান খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে নারা-য়ণ এই কথা শুনিবা মাত্রই আপনার মাথা হইতে দুই গাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। এক গাছি কাঁচা, এক গাছি পাকা। পাকা গাছটি বলরাম হইলেন, কাঁচা গাছটি কৃষ্ণ হইলেন!!!

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে এই উপাখ্যানটী, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলি-য়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ উপাখ্যানটীর রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর উপন্যাস লেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যান সৃষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মহা-ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই উপাখ্যানটীর সমুদয় অংশ উঠাইয়া দিলে মহা-ভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ

থাকিবে না। দ্রুপদ রাজের আপত্তি খণ্ডন জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না ঐ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটী উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান ঐ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটী ইহার বিরোধী। দুইটীতে দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটী যে প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটীই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত আছে, যে পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনী কুমার দিগের ঔরস পুত্রমাত্র। এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দ্দভ লিখিয়াছেন যে ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন। জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দ্দভের লেখনী প্রসূত নহে, ইহা নিশ্চিত।

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটীর এ স্থলে উল্লেখ করায় আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটী স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই; তা ছাড়া একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বও ইহাদ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্য্যের মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্ত্তী হতভাগ্য লেখক-

দিগের হস্তে দাড়ি, গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দু ধর্ম্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈবদ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেননা এখানে মহাদেবই সর্ব্বনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটী কেশ মাত্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাইব। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাইব, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার কারণ পাইব। যদি একথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে এই বিবাদ আদিম মহাভারত প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনা উভয়েই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারত প্রচারের সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা কতকটা বেদের প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল; তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিব মাহাত্ম্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণ মাহাত্ম্যসূচক সেই রূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। অনুশাসনিক পর্ব্বে এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। যথাকালে তাহার

সমালোচনা করিব। তখন দেখিতে পাইব, প্রায় সকল গুলিতেই একটু একটু গর্দ্দভের গাত্রসৌরভ আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর।

DRAMATIS PERSONAE.

১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু!

২। তস্য ভার্য্যা।

উচ্চশিক্ষিত। কি হয়?

ভার্য্যা। পড়ি শুনি।

উচ্চ। কি পড়?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গালা গুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। ও গুলো সব immoral, obscene, filthy.

ভার্য্যা। সে সব কাকে বলে?

উচ্চ। Immoral কাকে বলে জান—এই ইয়ে হয়—অর্থাৎ যা moralityর বিরুদ্ধ।

ভার্য্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ?

উচ্চ। না না—এই কি জান—ওর আর বাঙ্গালা কোথা পাব? এই যা moral নয়—তাই আর কি?

ভার্য্যা। মরাল কি? রাজ হংস?

উচ্চ। ছি! ছি! O woman: thy name is stupidity!

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না—তবে আসল কথাটা এই যে বাঙ্গলা বই পড়া ভাল নয়।

ভার্য্যা। তা, এই বই খানা নিতান্ত মন্দ নয়—গল্পটা বেশ।

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল দময়ন্তীর গল্প?

ভার্য্যা। তা ছাড়া আর কি গল্প হতে নেই?

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছু আছে না কি?

ভার্য্যা। এটা তা নয়। এতে কাটলেট্ আছে, ব্রাণ্ডি আছে, বিধবার বিবাহ আছে—বৈষ্ণবীর গীত আছে।

উচ্চ। Exactly. তাইত বলছিলাম ও ছাই ভষ্ম গুলো পড় কেন?

ভার্য্যা। কেন, পড়িলে কি হয়?

উচ্চ। পড়িলে demoralize হয়।

ভার্য্যা। সে আবার কি? ধেমোরাজা হয়?

উচ্চ। এমন পাপও আছে! demoralize কি না চরিত্র মন্দ হয়।

ভার্য্যা। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কন—শুনিতে পাইলে খানসামারাও কানে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন

কুকাজ নেই যে তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই,—আর আমি গরিবের মেয়ে, এক খানা বাঙ্গলা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?

উচ্চ। আমরা হলেম Brass pot; তোমরা হলে Earthen pot.

ভার্য্যা। অত পট্ পট্ কর কেন? কই মাছ ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি? তা যা হোক্, একবার এই বই খানা একটু পড় না।

উচ্চ। (শিহরিয়া ও পিছাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না।

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না।

ভার্য্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না আমি ঝাড়িয়া দিতেছি।

(ইতি পুস্তকখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চ শিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন।)

ভার্য্যা। ও কপাল! আচ্ছা তুমি যে বই খানাকে অত ঘৃণা করচো, কই তোমার ইংরেজরাও তত করে না? ইংরাজেরা নাকি এই বই খানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে।

উচ্চ। ক্ষেপেছ?

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। বাঙ্গলা বই ইংরাজিতে তরজমা? এসব আষাড়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বই খানা Seditious ত নয়? তা হলে government তরজমা করান সম্ভব। কি বই ও খানা?

ভার্য্যা। বিষবৃক্ষ।

উচ্চ। সে কাকে বলে ?

ভার্য্যা। বিষ কাহাকে বলে জান না ? তারই বৃক্ষ।

উচ্চ। বিষ—এক কুড়ি।

ভার্য্যা। তা নয়—আর এক রকমের বিষ আছে জান না ? যা তোমার জ্বালায় আমি এক দিন খাব।

উচ্চ। ও হো! Poison! Dear me! তারই গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—ফেল! ফেল!.

ভার্য্যা। এখন, গাছের ইংরাজি কি বল দেখি ?

উচ্চ। Tree.

ভার্য্যা। এখন দুটা কথা এক কর দেখি ?

উচ্চ। Poison Tree! ওহো! বটে বটে! Poison Tree বলিয়া একখান ইংরাজি বইয়ের কথা কাগজে পড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গলা বইয়ের তরজমা ?

ভার্য্যা। তোমার বোধ হয় কি ?

উচ্চ। আমার Idea ছিল যে Poison Tree এক খানা ইংরাজি বই, তারই বাঙ্গলা তরজমা হয়েছে। তা যখন ইংরাজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন ?

ভার্য্যা। পড়াটা ইংরাজি রকমেই ভাল—তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক। তা তোমাকে ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিতেছি। এই বই খানা দেখ দেখি। এখানা ইংরাজির তরজমা—লেখক নিজে বলিয়াছেন।

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরাজি বইয়ের তরজমা ? Robinson Crusoe না Watt On the improve-

ment of the Mind ?

ভার্য্যা। ইংরেজি নাম আমি জানি না। বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী।

উচ্চ। ছায়াময়ী? সে আবার কি? দেখি (পুস্তক হস্তে লইয়া) Dante, by Jove ?

ভার্য্যা। (টিপি টিপি হাসিয়া) তা ও খানা ভাল বুঝিতে পারি না—পোড়া বাঙ্গালির মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুদ্ধি ত রাখিনে—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে?

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য্য কি? Dante lived in the fourteenth century. অর্থাৎ তিনি fourteenth century তে flourish করেন।

ভার্য্যা। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন? এত বড় কবি?

উচ্চ। কি পাপ! fourteen মানে চৌদ্দ।

ভার্য্যা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেন? তা চোদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন?

উচ্চ। বলি চোদ্দ সেঞ্চুরিতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভার্য্যা। তিনি চোদ্দ সুন্দরীতেই বর্ত্তমান থাকুন আর চোদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্ত্তমান থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা।

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তিনি Florence নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন।

ভার্য্যা। পোর্টম্যাণ্টো হলদে করিতেন? আমাদের এই কাল পোর্টম্যাণ্টটা হলদে হয় না?

উচ্চ। বলি বড় বড় চাকরি করিতেন। পরে Guelph ও Ghibilline দিগের বিবাদে—

ভার্য্যা। আর হাড় জ্বালিও না। বহিখানা একটু বুঝাও না।

উচ্চ। তাই বুঝাইতে ছিলাম। অথরের লাইফ্ না জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে?

ভার্য্যা। আমি দুঃখী বাঙ্গালীর মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি? বইখানার মর্ম্মটা বুঝাইয়া দাও না।

উচ্চ। দেখি বইখানা কি রকম লিখেছে দেখি।

(পরে পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রথম ছত্র পাঠ)

"সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা"

তোমার কাছে অভিধান আছে?

ভার্য্যা। কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল?

উচ্চ। গগন কাকে বলে?

ভার্য্যা। গগন বলে আকাশকে।

উচ্চ। "সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা"—

নিবিড় কাকে বলে?

ভার্য্যা। ও হরি! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে শিখাবে? নিবিড় বলে ঘনকে। এও জান না? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে না?

উচ্চ। কি জান—বাঙ্গালা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদের পড়া শোভা পায়?

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কি?

উচ্চ। আমাদের হলো polished society—ও সব বাজে

লোকে লেখে—বাজে লোকে পড়ে—সাহেব লোকের কাছে ও সবের দর নেই—polished societyতে কি ও সব চলে?

ভার্য্যা। তা মাতৃভাষার উপর পালিশ ষষ্ঠীর এত রাগ কেন?

উচ্চ। আরে মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি?

ভার্য্যা। আমার ও ত ঐ ভাষা—আমি ত মরে ছাই হই নাই।

উচ্চ। Yes for *thy* sake, my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গালা বই পড়িব। কিন্তু Mind এক খান বৈ আর নয়!

ভার্য্যা। তাই মন্দ কি?

উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়্‌ব—কেহ না টের পায়।

ভার্য্যা। আচ্ছা তাই।

(বাছিয়া বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নীতি-পূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামী হস্তে প্রদান। স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন।)

ভার্য্যা। কেমন বই?

উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গালায় যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না।

ভার্য্যা। (ঘৃণার সহিত) ছি! এই বুঝি তোমার পালিশ-ষষ্ঠী? তোমার পালিশ ষষ্ঠীর চেয়ে আমার চাপড়া-ষষ্ঠী, শীতল-ষষ্ঠী অনেক ভাল।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

শি। সে দিন তোমাকে বলিয়াছি যে ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই—এই জন্যই তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বর অসীম গুণবিশিষ্ট। এই জন্যই তিনি নির্গুণ,একথাটি অনেকের কাছে কেমন নূতন কথা ঠেকিবে। তাহার কারণ এই—অসীম কথাটিতে সাধারণতঃ এই রূপ অর্থ বুঝা যায় যে যাহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী—যাহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই তাহাকেই অসীম বলা যায়। কিন্তু আমরা যে অসীম কথাটি ব্যবহার করিয়াছি, তাহার অর্থ এই,যে যাহার কোন বিশেষ সীমা নাই। যে গুণের এমন কোন সীমা নাই, যাহা দ্বারা তাহাকে অন্য কোন গুণ হইতে বিশেষ রূপে ভাবা যায়, তাহাই অসীম গুণ। ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ,এই জন্য তিনি নির্গুণ। যদি বলি যে তুমি বড় সুন্দর—তবে এই বুঝায় যে, যে গুণ থাকিলে তুমি কুৎসিত হইতে বা মাঝা মাঝি রকমের শ্রী বিশিষ্ট হইতে, সেই সেই গুণ তোমাতে নাই। তোমার সৌন্দর্য্য যে গুণ তাহার সীমা রহিয়াছে, কিন্তু এই জগতে যত গুণ আছে, সকলেই ঈশ্বরের এক মাত্র গুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং এই গুণটি তাঁহাতে আছে এবং তাহারই বিপরীত ভাবাপন্ন গুণটি তাঁহাতে নাই, একথা বলা যায় না। এই বিশ্বে যত স্থান (space) আছে, তত স্থান তিনি ব্যাপিয়া আছেন, এই জন্য তিনি নিরাকার এবং এই জগতের যতগুণ আছে, সমস্তই তাঁহার এক অনির্ব্বচনীয় গুণের অন্তর্গত, এই জন্য তাঁহার গুণের সীমা

নাই। এই জন্য তাঁহার গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না এবং এই জন্যই তিনি নির্গুণ।

একটি উপমা দিয়া নির্গুণ কথাটি বুঝাইতে চাই। আজ কাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে যদি এক খণ্ড রেশম বস্ত্র দ্বারা একটি কাঁচের দণ্ডকে ঘর্ষণ করা যায়, তবে ঐ কাঁচ ও ঐ রেশম বস্ত্রে তাড়িত শক্তির গুণ দেখা যায়। কিন্তু ঐ কাচের তাড়িত শক্তি এবং ঐ রেশমের তাড়িত শক্তি ভিন্ন প্রকার। বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ একটির নাম পজিটিভ্ ইলেকট্রিসিটি এবং অন্যটির নাম নেগেটিভ্ ইলেকট্রিসিটি বলেন। কিন্তু তাড়িত শক্তি এই দুই ভাগ হইবার পূর্ব্বে কাচে বা রেশমের বস্ত্র পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, তাহাকে তাঁহারা নিউট্রাল ইলেকট্রিসিটি বলেন। যেমন এক নিউট্রাল ইলেকট্রিসিটি দুই ভাগে ভাগ হইয়া পজিটিভ ও নেগেটিভ দুই প্রকার তাড়িত শক্তি রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের এক নির্গুণ ভাব হইতেই জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সগুণ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে যে চেতন গুণ বা জড় গুণ দেখিতে পাই, তাহা ঈশ্বরের অন্তর্গত একমাত্র গুণের ব্যষ্টি ভাব। ঈশ্বর চেতন ও নহেন, জড়ও নহেন, হিন্দুগণ তাঁহার সেই নির্গুণ অনবচ্ছিন্ন গুণকে চৈতন্য গুণ নাম দিয়া থাকেন। চেতন গুণ কাহাকে বলে তাহা আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু এই অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য গুণ কিরূপ, তাহা আমরা অন্তরে ধারণা করিতে অক্ষম।

হিন্দুগণ একস্থলে ঈশ্বরকে নির্গুণ, আবার অন্যস্থলে তাঁহাকে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যময় এইরূপ বলিয়াছেন দেখিয়া অনেকে উক্ত দুই বিশেষণকে বিরুদ্ধভাব বিশিষ্ট বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে ঐ দুইটি বিশেষণই যে একার্থ-বোধক তাহা বুঝা যায়।

ছা। আপনি সেদিন বলিয়াছেন যে যাহাকে আমাদের মন বলা যায় তাহা সাকার বস্তু, কিন্তু একথাটির অর্থ আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই।

শি। আমাদের মন যে সাকার কি নিরাকার এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরায় বলি শুন। মন এই শব্দটিতে যদি কোন বস্তু বুঝ তবেই তাহা সাকার বস্তু, আর যদি মন কথাটিতে কোন বস্তুবিশেষের গুণ বুঝ, তবে সেই গুণের ত আর কোন আকার থাকিবে না। কিন্তু সেই গুণ অবশ্য সাকার বস্তুর গুণ হইবে। হিন্দু ঋষিগণ মনুষ্য শরীরকে পাঁচটি কোষের সমষ্টিতে নির্ম্মিত, এই রূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমাদের স্থূল দেহ যে রূপ স্থূল দ্রব্যে গঠিত, তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য গঠিত আর চারিটি কোষ উহারই মধ্যে আছে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে একটির নাম মনোময় কোষ। এই মনোময় কোষ সূক্ষ্ম আকার বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বস্তু। ইহাকেই কখন কখন মন বলা যায়, আবার কখন কখন এই কোষের গুণকে মন বলা হয়। সুতরাং হিন্দুদের মতে মন কোন সাকার বস্তু বা সাকার বস্তুর গুণ বিশেষ।

ছা। ইংরাজী মনোবিজ্ঞান সকল পাঠ করিয়া Mind আর matter এই দুইএর মধ্যে matter সাকার, mind নিরা-

কার, আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা আমি মন হইতে দূর করিতে পারিতেছি না।

শি। যাহাকে আমরা স্থূল জড় বস্তু বলি, ইংরাজী matter শব্দে তাহাই বুঝায়। Mind কিন্তু স্থূল জড়বস্তু নহে, সুতরাং mind আর matter যে ভিন্নরূপ বস্তু তাহার সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত দ্রব্যের আকার উপলব্ধি করিতে পারি না এবং মন স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বস্তু নহে সুতরাং মনের আকার কিরূপ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আকার কথার যাহা যথার্থ অর্থ, তাহা বুঝিলে তোমারমনে আর গোল থাকিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ যে তোমার মন তোমার দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু; অথচ উহা কোন স্থান ব্যপিয়া নাই। এরূপ ধারণা তুমি কথনই করিতে পারিবে না। মন সম্বন্ধে যে বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিবে, তাহার ভাব যদি কোন রূপ ধারণা করিতে না পার, তবে এরূপ বিশেষণ শব্দ প্রয়োগের ফল নাই।

আমার মতে এই জগতে সমস্তই সাকার, কেবল এক-মাত্র ঈশ্বরই নিরাকার।

ছা। যাহাকে ইংরাজীতে spirit বলে এবং হিন্দু শাস্ত্রে আত্মা বলে, তাহা সাকার কি নিরাকার? মনকে বস্তু বলিলে মনকে যে জন্য সাকার বলিতে হয়, আত্মাকেও তাহা হইলে সেই কারণে সাকার বলিতে হয়।

শি। যাঁহাকে আত্মা বলা যায় তাহা অবশ্যই দেশব্যাপী। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ আকার নাই কেননা তোমার আত্মা ও আমার আত্মা একই পদার্থ। এই আত্মাই ঈশ্বর

এবং ইহাই একমাত্র নিরাকার পদার্থ। যেমন একখানি কাগজের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আঁকা থাকিলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের আধার সেই একমাত্র কাগজ, সেইরূপ এই জগতে যাহা কিছু আছে দেখিতেছ, এক জগদাধার আত্মা সেই সকলেরই আধার। হিন্দুদের এই মত জানিবে। আত্মা কথাটির অর্থ এই যে যাহা না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না তাহাই আমার আত্মা। হিন্দুগণ বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা স্থির করিয়া ছিলেন যে আদি কারণ ঈশ্বর আমাতে না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না, এই জন্য ঈশ্বরই আত্মা জানিবে। যাঁহারা মনে করেন যে এই স্থূল দেহ না থাকিলে আর আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, তাঁহাদের পক্ষে এই স্থূল দেহই আত্মা। কিন্তু ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন এই স্থূল দেহের অভাবেও আমার অস্তিত্ব থাকে, সুতরাং স্থূল দেহ আত্মা নহে। এমনকি সূক্ষ্মশরীর না থাকিলে ও আমার অস্তিত্ব থাকে, সেই জন্য সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মা নহেন। এইরূপ, আমি কে এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরই আমি। সেই জন্য ঈশ্বরকে যে অর্থে নিরাকার বলা হয়, আত্মাকে ও সেই অর্থে নিরাকার বলা হয়। ক্রমে ক্রমে এই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইব।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণ চরিত্র।

দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে—তাহা সকল শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এদেশে অনেকেই একব্বরী গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি। আমরা সেই একব্বরী গজ চালাইব।

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার, আগে, স্থির কর, যে এই সুভদ্রা হরণ বৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল—এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে সুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথমস্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার রচনা অতি উচ্চ শ্রেণীর কবির রচনা বটে,—কিন্তু কেবল সেই কারণেই ইহা দ্বিতীয়

স্তরভুক্ত বিবেচনা করা যায় না। প্রথমস্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর। তবে প্রথমস্তর ও দ্বিতীয়স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথমস্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয়স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা প্রথমস্তরগত—দ্বিতীয়স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমন্যু হইতে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রার্জ্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল—দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদী স্বয়ম্বর বাদ দেওয়া যায় তবু সুভদ্রা হরণ নয়। হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে সুভদ্রার বিবাহ মহাভারতে কথিত হয় নাই সুতরাং ইহাই মৌলিক মহাভারতের অংশ।

এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে, অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালানাটকাদিতে যে সুভদ্রাহারণ পড়িয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভুলিয়া যাউন। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবর্ত্তিনী দূতী হইলেন, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথি হইয়া গগণমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিল—সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল

অতি মনোহর কাহিনী বটে কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নহে। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি কি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কথক-দিগের সৃষ্টি তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন কারণে অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য দেশ পর্য্যটনান্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহাকে বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অর্জ্জুন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্ব্বতে একটা মহান্ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদু কুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে?" অর্জ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাঁহার মহিষী হন তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই :—

"হে অর্জ্জুন! স্বয়ম্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের

প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ম্বরকাল উপস্থিত হইলে, তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ স্বয়ম্বর কালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে।"

এই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অর্জ্জুন প্রস্থান করিলেন।

এখন আজি কালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত, এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে "মহাশয়! আপনার যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ," তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতি শাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না) কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সুভদ্রা হরণ পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন, মিথ্যা প্রশংসায় কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্ম্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহার ও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধু-বর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজ রক্ষার মূলসূত্র এই যে কেহ কাহারও উপর অবৈধ বল-প্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বল-প্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থীকৃত কন্যাহরণকে নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ অপহৃতা কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা যাক। কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য—তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার "Duty"। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল—সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বলিলেও হয়—সৎ পাত্রস্থ হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান "ডিউটি"— তিনি যাহাতে সৎ পাত্রস্থ হয়েন, তাহাই করা। এখন, অর্জ্জুনের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি যাহাতে অর্জ্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ তাঁহার করা কর্ত্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বল-

পূর্ব্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্ত্তব্য সাধন হইতে পারিত কিনা, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল চির-জীবনের মঙ্গলামঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গল সিদ্ধি নিশ্চিত সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ সুভদ্রার চিরজীবনের পরমশুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি পরমধর্ম্মানুমত কার্য্যই করিয়াছিলেন—তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও আমার উপর বল প্রয়োগ করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরহিত মহাশয় মনে করেন, যে আমি যদি আমার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাঁহার এমন কোন অধিকার নাই, যে আমাকে মারপিট করিযা সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে "the end does not Sanctify the means."

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সুভদ্রার যে অর্জ্জুনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা—কুমারী এবং বালিকা—পাত্র বিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্র বিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে

ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা অজ্ঞতা বশতঃ বা লজ্জা বশতঃ বা উপায়াভাব বশতঃ আমি সে কার্য্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু বল প্রয়োগের ভান করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্ম্ম? মনে কর একজন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু, বড় ঘর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফ্‌তর খানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি "এসো গো" বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভান ভিন্ন তাহার মঙ্গল সাধনের উপায়ান্তর ছিল না।

"আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।" এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা ঐ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। যে দ্বিতীয় উত্তর এই, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্য্যে আমার

পরম মঙ্গল, সে কার্য্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটেনা। যে রোগীর রোগ-প্রভাবে প্রাণ যায়. কিন্তু রোগীর স্বভাব-সুলভ ঔষধে বিরাগবশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাটাইবেনা,—জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবেনা, জোর করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, বলপূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? আজিও সুভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত করে, তবে কোন্ পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্যা সৎপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি. না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?

এই গেল প্রথম আপত্তির দুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে, যে ভাল, স্বীকার করা গেল, যে কৃষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গলকামনা করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কিন্তু বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন কি তাঁহাকে অর্জ্জুন

মহিষী কবিবার অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ম্বরে যেন ভয় ছিল, যেন মূঢ়মতি বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ন্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন, বসুদেব প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয়া রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদ-বেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না। এবং অর্জ্জুন ও সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন?

এখনকার দিনকাল হইলে, একাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জ্জুনের বিবাহ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহ প্রথার মত ছিল না। সেই বিবাহ প্রথা না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না।

মনুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্ষ, (৪) প্রাজ্যপাত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন।

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণেরই অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ বিবাহে অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য, ক্ষাত্রস্য চতুরোহবরান্।

ইহার টীকায় কুল্লুকভট্ট লেখেন, "ক্ষত্রিয়স্য অবরানুপরিতা-নারস্যদীংশ্চতুরঃ।" তবেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারিপ্রকার বিবাহ বৈধ। আর সকল অবৈধ।

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে—

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব নকর্ত্তব্যৌ কদাচন।

পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্ত্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল।

তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ "কাম-সম্ভব," সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জ্জুনের তাহা কখনও অনু-মোদিত হইতে পারেনা। অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বল-পূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনুর ৩ অ ২৪ শ্লোকে আছে—

চতুরোব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।

যে বিবাহ ধর্ম্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজ কুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা অভ্রান্তবুদ্ধি এবং সর্ব্বপক্ষের মান সম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিতা ছিল, ইহার

প্রমাণ কি? কথা ন্যায্য বটে; তত প্রাচীন কালে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তবে মনুসংহিতা পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি নীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ঐরূপ বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাই পারুক—মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রা হরণ পর্ব্বাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খুঁজিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া যাদবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতে-ছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার আগে কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, অর্জ্জুন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে, বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন।—

"অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থ-লুব্ধ মনে করেন না বলিয়া অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণি-গ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হই-তেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের

কুলোচিত হইয়াছে। এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়া, সুভদ্রা ও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই।"

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন,

১। অর্থ (বা শুল্ক) দিয়া যে বিবাহ করা যায় (আসুর)।

২। স্বয়ংবর।

৩। পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য)।

৪। বলপূর্ব্বক হরণ (রাক্ষস)।

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্ত্তি ও অযশ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ আছে।*

প্রচারের অনেক শ্রেণীর পাঠক আছেন। ভরসা করি তন্মধ্যে এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই যে সিদ্ধান্ত করেন, যে আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি

---

* মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে যে বিবাহতত্ত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, কেননা উহা প্রক্ষিপ্ত। উহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা আমরা অনুশাসন পর্ব্বের সমালোচনা কালে প্রমাণ করিব। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীষ্ম স্বয়ং, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটী কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভীষ্ম রাক্ষস বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীষ্মের চরিত্র এই যে যাহা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সে কবি কখনই তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই।

নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া প্রচারের স্থান নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে "রিফর্ম্মরই" আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য তবে মালাবারী ধরণের রিফর্ম্মর হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারী ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।

আমরা বলিয়াছি, যে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাহাদিগের কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অর্জ্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই

প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার সে কথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া, সমারোহ পূর্ব্বক তাহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের আর অধিকার নাই।

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজ মধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয় কৃত এই বল প্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই, যে আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজ সম্মত, তদ্দ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় না।

আমরা এই তত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্ণদ্বেষিরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপ কাটিটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপ কাটিতে মাপিলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেআপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের সেই একবগ্গী গজ বাহির করা চাই।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

শিক্ষক। একণে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ এই কথাটির অর্থ কি বলি শুন।

ছাত্র। আপনি ঈশ্বরকে নিরাকার বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাকে—যাহাকে ইংরাজীতে Spirit বলে—তাহাকে বস্তু বলা কি ঠিক সঙ্গত হয় ?

শি। দেখ ইংরাজীতে Matter আর Spirit এই দুই কথায় তোমার মনে যে অর্থ ধারণা হইয়াছে তাহার মধ্যে Matter শব্দের অর্থ আর বস্তু শব্দের অর্থ তোমার মনে একইরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইংরাজীতে Matter বলিলেই জড়পদার্থ বিশেষ, এইরূপ জ্ঞান হয়, আর Spirit অর্থে যাহা জড় নহে তাহাকেই Spirit বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু আমরা যে বস্তু শব্দ প্রয়োগ করিতেছি তাহার অর্থ এই যে—যাহার বাস আছে, তাহাই বস্তু, ইংরাজীতে যাহাকে Existence বলে, সেই Existence যাহার আছে তাহারই নাম বস্তু। কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় যখনই যে কথাটি প্রয়োগ করিবে তাহার ঠিক অর্থটি কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। ভিন্ন ভিন্ন কথার ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থ পরিষ্কাররূপে না বুঝিবার দরুণ অনেক সময় বিচারে ভুল হইয়া পড়ে।

আজ কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতই উন্নতদশা প্রাপ্ত হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, এই জগৎ যে এক-

মাত্র বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এইটি প্রমাণ করিবার পথে তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। এই এক মাত্র বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্নরূপ শক্তির ক্রিয়া হইতেই এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্যগণ ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সকলের মধ্যে আবার এরূপ সম্বন্ধ আছে যে এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকার শক্তিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। শক্তি সকলের এই সম্বন্ধকে তাঁহারা Correlation of forces বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে এই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সমূহের পরিমাণের সমষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ইহাকে তাঁহারা Conservation of energy বলিয়া থাকেন।

হিন্দুগণ এই বিশ্বের আকার সম্বন্ধে যাহা বুঝেন তাহাও ঐরূপ। তাঁহারাও বলেন যে এই জগৎ একমাত্র বস্তু দ্বারা গঠিত। যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শক্তির ক্রিয়া এই জগতে দেখিতে পাই সকলেই একমাত্র শক্তির ভিন্ন ভিন্নরূপ অবস্থা মাত্র। এবং সেই একমাত্র বস্তু, সেই একমাত্র শক্তির বশে যে গুণ বিশিষ্ট হন তাহাই ঈশ্বরের গুণ। এই বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমষ্টি শক্তিই ঐশ্বরিক শক্তি। এই জন্যই তাঁহাকে বিশ্বরূপ কহা যায়।

ছা। জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের যেরূপ ধারণা আছে হিন্দুদের ধারণাও কি সেইরূপ ছিল?

শি। ঠিক সেরূপ নহে, বিস্তর প্রভেদ আছে। এই বিশ্বের সমষ্টি শক্তি যে এক এবং উহাই যে সেই আদি কারণের অনন্ত শক্তি ইহা উভয়েই বলিয়া থাকেন বটে কিন্তু ঐ সমষ্টি

শক্তি যে কিরূপ শক্তি সে বিষয়ে মতের ঐক্য নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির তালিকায় তেজ, তাড়িত, আলোক, ইত্যাদি স্থূল শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির উল্লেখ নাই, সেই জন্য তাহাদের সমষ্টিশক্তি তেজ তাড়িতের ন্যায় কোনরূপ শক্তি হইবে, তাঁহাদের ধারণা এই, কিন্তু হিন্দুদের শক্তির তালিকার ভিতর ঐ সকল স্থূল শক্তির সহিত ইচ্ছা শক্তি, কল্পনা শক্তি, বিচার শক্তি, অনুভব শক্তি ইত্যাদি চেতন শক্তি সকলও ধরা হইয়া থাকে। হিন্দুগণের মতে এই সমস্ত সূক্ষ্ম শক্তিরই প্রাধান্য জগতে এত অধিক যে সমষ্টি করিতে গেলে সমষ্টি-ফল স্থূলজাতীয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হিন্দুদের মতে এই সমষ্টি শক্তি চেতনজাতীয়, জড়-জাতীয় নহে এবং এই শক্তিকে তাঁহারা বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি বলিয়া থাকেন। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শক্তি। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে চেতন শক্তি বলিয়া বুঝি, বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি সেরূপ নহে এ কথাটি যেন স্মরণ থাকে।

সমষ্টি শক্তি কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝ। যাহা দ্বারা দ্রব্যের অবস্থান্তর জন্মে তাহার নাম শক্তি। তেজ (Heat) এক প্রকার শক্তি কেন না উহা দ্বারা শীতল দ্রব্যকে উষ্ণ অবস্থায় লইয়া যায়। এই এক তেজ শক্তি বরফকে জলের আকারে, জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণ জলীয় বস্তুতে একটি নির্দ্ধারিত পরিমাণ তেজ থাকিলে উহা কঠিন বরফের আকারে থাকে। ঐ বরফে নিহিত শক্তিকে কঠিন শক্তি বলিতে পার। তদপেক্ষা বেশী পরিমাণ তেজ থাকিলে ঐ জলীয় বস্তু তরলাকার ধারণ করে তখন উহাতে নিহিত শক্তিকে তরলশক্তি নাম দাও, আরও অধিক

পরিমাণ তেজ থাকিলে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় তখন উহাতে নিহিত শক্তিকে বাষ্পীয় শক্তি নাম দিতে পার। যেমন তেজ নামক একই শক্তি অবস্থাভেদে কঠিন শক্তি, তরল শক্তি এবং বাষ্পীয় শক্তি নাম পাইল, সেইরূপ এই জগতে একই প্রকারের আধারে প্রযুক্ত শক্তি অবস্থাভেদে দেবশক্তি জড়শক্তি চেতন-শক্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমষ্টি পরিমাণের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।

এইবারে মনে কর, খানিক বরফ, খানিক জল এবং খানিক বাষ্প একত্রে মিশাইলাম, ঐ তিনটি পদার্থে যে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টি শক্তি ঐ তিনটি দ্রব্যস্থ জলীয় বস্তুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিল। এই তিনের মিশ্রণে মিশ্রিত দ্রব্য যদি বাষ্পাকার ধারণ করে তবে ঐ সমষ্টি শক্তিকে বাষ্পীয় শক্তি বলিতে পার, যদি তরলাকার ধারণ করে তবে উহাকে তরল শক্তি বলিতে পার। সেইরূপ এই বিশ্ব যখন একাকার ধারণ করিবে, যখন বিভিন্নতা আর থাকিবে না, তখন এই বিশ্বের যে অবস্থা বিশ্বের সমষ্টি শক্তির তাহাই সংজ্ঞা হইবে। এই বিশ্বের শক্তিতত্ত্ব সম্যক্ পর্য্যালোচনা বিনা কেহই বলিতে পারেন না যে, এই সমষ্টি শক্তি চেতন কি জড় কি অন্যরূপ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি অল্প দূর অগ্রসর হইয়াছেন, সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যদি এই সমষ্টি শক্তিকে জড় শক্তি বলে তবে আমি সে কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দু ঋষিগণ যাঁহারা যোগমার্গ অবলম্বনে বিশ্বের সহিত আপনাদিগকে একভাবাপন্ন করিয়াছিলেন তাঁহারা যেরূপ বলেন তাহা কতদূর সত্য তাহা সকলের ভাবিয়া দেখা

কর্ত্তব্য। হিন্দুদের মতে এই বিশ্ব জড় নহে, ইহা চেতনও নহে, ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্যময়।

যদি সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধীয় ভাবসমূহ অন্তরে একেবারে যুগপৎ ভাবিতে পার তবেই ঈশ্বর কি, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। এই বিশ্বই ঈশ্বর এই জন্যই তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হয়। এই বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ পদার্থে চিত্রিত দেখিতেছ কিন্তু ইহাকে অখণ্ড এক বস্তু জানিও। এই এক বস্তুই ঈশ্বর। একমেবা-দ্বিতীয়ং কথাটির অর্থ বড় গভীর। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু কি তাহা অন্তরে ধারণা করিতে চেষ্টা কর এবং এই চেষ্টাই ঈশ্বরোপাসনা। একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির অর্থ যাঁহারা এরূপ বুঝেন যে জগতে দেবদেবী নাই তাঁহারা উহার অর্থ কিছুই বুঝেন নাই। হিন্দুগণ ঐ বাক্যটি মহাবাক্য বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে নিরাকার নির্গুণ ও বিশ্বরূপ এই তিনটি কথার যেরূপ অর্থ বলিয়াছি তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। যদি আমার মতের সহিত কোন বিষয়ে অনৈক্য হও তবে তাহা আমাকে বলিবে।

ছা। আপনি নিরাকার ও নির্গুণ কথার যেরূপ অর্থ বুঝা-ইয়াছেন তাহাতে আমার বোধ হয় যে যাঁহা সগুণ তাহাই সাকার।

শি। আমিও ইহাই বুঝি যে যাহার গুণ আছে তাহার আকারও আছে। কেননা যাহাতে কোন সীমাবদ্ধ গুণ আছে তাহা যে অসীম স্থানব্যাপী ইহা সম্ভব নয়। এইজন্য যাহার গুণ সীমাবদ্ধ তাহার আকারও সীমাবদ্ধ বুঝি। ঈশ্বরকে যদি সগুণ অথচ নিরাকার বলি তবে এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না।

ছা। ঈশ্বর বিশ্বরূপ নিরাকার ও নির্গুণ। তাঁহার আকার ও গুণ সম্বন্ধে চিন্তা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তাঁহার উপাসনা কিরূপ সম্ভবে?

শি। বাস্তবিক নিরাকার ঈশ্বরকে আমরা ভাবিতে পারি না। ঈশ্বর মনের অগোচর এই কথা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে তিনি মনে মনে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারেন তবে আমি বলি যে তিনি নিরাকার কথার অর্থ বুঝেন নাই। নিরাকার ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই ভাবা যায় না বলিয়া সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দেয়। বেদান্ত শাস্ত্রে উপাসনা সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে "সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপারানি উপাসনানি।" সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে ততই সেই আত্মার উজ্জ্বল আভা অন্তরে উদিত হইবে। তখন মনের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

ছা। সগুণ ঈশ্বর কথাটির অর্থ কি?

শি। ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমা। যিনি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন তিনিই ঈশ্বরে লীন হইয়াছেন। যিনি উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহার আর পরিবর্ত্তন নাই।

এই উন্নত মনুষ্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে দেখিতে পান এবং এই উন্নত মনুষ্য-দশার চরম আদর্শ পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। এক মনুষ্যরূপ আধারে সমগ্র বিশ্ব যাঁহাতে একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে তিনিই সগুণ ঈশ্বর। যে নিয়মশৃঙ্খলা-বশে এই বিশ্ব চলিতেছে সেই নিয়মশৃঙ্খলা যাঁহার কার্য্যশৃঙ্খলে দেখা

যায় তিনিই সগুণ ঈশ্বর। তিনি মনুষ্য অথচ ঈশ্বর এইজন্য তিনি সগুণ ঈশ্বর। যিনি কর্ম্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয়, যিনি মনুষ্য আকার ধারণ করিয়াও অন্তরে বিশ্বরূপ, যাঁহার আমি জ্ঞান এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তিয়াছে, যিনি আমিই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান করেন সেই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ Man God বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করেন সেই Man God কথাটি, আর সগুণ ঈশ্বর কথাটি আমি একই অর্থবোধক বলিয়া জ্ঞান করি। যদি ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান-লালসা জন্মিয়া থাকে তবে এইরূপ উন্নত পুরুষ সম্বন্ধে অবিরামে চিন্তা কর। নিজের আমি জ্ঞান এইরূপ মুক্তাত্মার গুণে মিশাইতে চেষ্টা কর। ক্রমেই দেখিবে চিত্ত নির্ম্মল হইতেছে আর কোথা হইতে কে যেন তোমাকে ক্রমে ক্রমে পথ দেখাইয়া দিতেছে। হিন্দুশাস্ত্র যতই আলোচনা করিবে ততই দেখিবে যে এইরূপ আত্মজ্ঞানী পুরুষই ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান-পিপাসুর চিন্তার একমাত্র অবলম্বনীয় অমূল্য ধন। এই চিন্তার বশে উক্ত উপাসকের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া ক্রমেই আত্মজ্ঞান জন্মিবে। তিনি ক্রমেই বুঝিতে পারিবেন ঈশ্বর কিং স্বরূপ।

প্রাণ হরি নাম গাও।

মরি কি মধুর স্বপন হেরিনু,
আকুল হইল প্রাণ।

যেন এ সঙ্গীতে নাচিতে নাচিতে
গাহিছে হরির গান ॥
আত্মপর যেন, নাহি জীবে আর,
নাহি ভেদ নারী নরে।
মুখে হরি হরি, করে কর ধরি,
উঠে প্রাণী স্তরে স্তরে ॥
পশু পক্ষী কীট, ক্ষিতি কাষ্ঠ শিলা,
সিন্ধু নদী সরোবর।
অণু পরমাণু, গ্রহ উপগ্রহ,
অভেদ অজড় জড় ॥
নাচিতে নাচিতে, উঠে স্তরে স্তরে,
আনন্দ উছলি পড়ে।
নাহি অন্য রব, চারি দিক্ হ'তে
শুধু হরি নাম করে ॥
সিন্ধু তীরে বসি, তরঙ্গ বিকাশ
দেখিয়াছিলাম সেই।
হরি হরি রবে, ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া
উথলে উচ্ছ্বাস সেই ॥
উঠিতে উঠিতে অপূর্ব্ব আলোকে
নয়ন চমকি ওঠে।
হেরিনু বিস্ময়ে, উরধ ভেদিয়া
তড়িত কিরণ ফোটে।
অকূল সে আলো, মধুর সে আভা
আঁখি না ফিরান যায়।
শঙ্খের আকারে, অগণিত উর্ম্মি,

উছলি চলেছে তায়।
কত রবি শশী, কত তারাকার,
দেশ মহাদেশ কত।
সাগর ভূধর, জীব জন্তু কীট,
কানন সরসি নদ।
সে তরঙ্গ হ'তে ফুটিতে ফুটিতে
দিক দিগন্তরে ধায়।
কোথা বা আবার, বিশ্ব অগণিত,
ভাসে সে কিরণ গায়।
জননী হৃদয়ে সন্তানের স্নেহ
যেমতি মধুরে রাজে।
সে বিশ্ব মণ্ডলী, সে কিরণ বক্ষে
তেমতি জড়ায়ে আছে।
কোথাও আবার, বিশ্ব কোটী কোটী
মিশিছে কিরণ গায়।
তবু নহে শূন্য সে কিরণ সিন্ধু
বিশ্ব অবিরল তায়।
একমাত্র রব অশ্রান্ত "ওঁকার"
উচ্ছ্বাসের সহ ফোটে।
ক্ষান্ত মুহূর্ত্তেক সে "ওঁকার" ধ্বনি
যেই হরিধ্বনি ওঠে।
এ প্রপঞ্চ কিবা, নারিনু বুঝিতে
অথচ আনন্দে প্রাণ।
পুরিয়া উঠিল, স্বতঃ ওঠে মম
উথলিল হরি গান।

অমনি হেরিনু আমারো এ বিশ্ব
সে কিরণ বক্ষে ভাসে।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু হ'তে অণু
আমি তার এক পাশে॥
তদবধি যেই মুদি দুনয়ন
অমনি দেখিতে পাই।
নাচিতে নাচিতে ওঠে স্তরে স্তরে
বিশ্ব হরি নাম গাই॥
এ জড় অজড় প্রেমে মত্ত যাঁর
কোথা তুমি সেই হরি।
আনন্দের সিন্ধু তব নিরাকার
রাখিব হৃদয়ে ধরি॥
হৃদয় আমার করিরে সঞ্চয়
আনন্দ যেখানে পাও।
জাগ্রতে স্বপনে হরিষে বিষাদে
প্রাণ হরি নাম গাও॥

ঈশান

গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি।

২। পূজাবাড়ীর ভিক্ষা।

নবমী পূজার দিন বাবাজিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব, যে তিনি পূজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া বেড়াই-

ভেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে, যে সেই অমূল্য অমৃতময় নামের বিনিময়ে তিনি সন্দেশাদি লোষ্ট্র গ্রহণ পূর্ব্বক, বৈষ্ণবদিগের বদান্যতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিবেন। এক মুঠা চাউল লইয়া যে হরিনাম শুনায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল কথার সবিশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আমি পূজ্যপাদ গৌরদাস বাবাজির সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। যেখানে পূজা-বাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষুক শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানেই সন্ধান করিলাম, সে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও দেখিলাম না। পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, বাবাজিউ, ভোজনে বসিয়া আছেন।

দেখিয়া, বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়া শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন প্রশস্ত মনে করিলাম না। নিকটে গিয়া বাবাজিউকে বলিলাম,

"প্রভু! ক্ষুধায় ধর্ম্মের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয়।"

বাবাজিউ বলিলেন, "তাহা হইলে চোরের ধর্ম্ম বড় উদার। এ কথা কেন হে বাপু?"

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা!

বাবাজি। দোষটা কি?

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক—শক্তির প্রসাদ খাইব কেন?

বাবাজি। শক্তিটা কি হে বাপু?

আমি। দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মী, শিবের শক্তি দুর্গা, ব্রহ্মার শক্তি ব্রাহ্মণী এই রকম।

বাবাজি। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! তোর মুখ

দেখিয়া আহার করিলে আহারও পশু হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাড়িয়া ঘরকন্না করে নাকি? দূর হ।

আমি। তবে শক্তি কি?

বাবাজি। এই জলের ঘটি টা তোল দেখি।

আমি জলপূর্ণ ঘটীটা তুলিলাম।

বাবাজি একটা জলের জালা দেখাইয়া বলিলেন, "এটা তোল দেখি!"

আমি। তাও কি পারা যায়?

বাবাজি। তোমার ঘটি টা তুলিবার শক্তি আছে, জালাটা তুলিবার শক্তি নাই। ভাত খাইতে পার?

আমি। কেন পারিব না? রোজ খাই।

বাবাজি। এই জলন্ত কাটখানা খাইতে পার?

আমি। তাও কি পারা যায়?

বাবাজি। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন বুঝিলে দেবতার শক্তি কি?

আমি। না।

বাবাজি। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্ব্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টি কারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু দেবতা, বহন শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।

আমি। এ সব কি কথা? যে শক্তিতে আমি ঘটি তুলিলাম, বা ভাত খাই, তাহা আমি ত চক্ষে কখন দেখি না। কই, আমার সে শক্তি এই দুর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া গুজিয়া গহনা

পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক দেখি! আমার বৈষ্ণবী তাহা করিয়া থাকে, সুতরাং আমার বৈষ্ণবীকেই আমার শক্তি বলিতে পারি।

বাবাজি। গণ্ডমূর্খেরা তাই ভাবে। তুমি শরীরী, তোমার শক্তি তোমার শরীরে আছে। তাহা ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না।

আমি। দেবতারা কি? শরীরী? তবে তাঁহাদিগের শক্তিও নিরাকার?

বাবাজি। শরীরী এবং অশরীরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার। কিন্তু একটা একটা করিয়া কথা বুঝ। প্রথমে বুঝ যে ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই অশরীরী।

আমি। সে কি? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অপ্সরাদিগের নৃত্য গীত দেখে কে?

বাবাজি। এ সকল রূপক। তাহার গূঢ়ার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন বুঝ যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র। যাহা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে জীবের বা বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্র।

আমি। বুঝিলাম না। কেহ ব্যামোহে মরে, কেহ ডুবিয়া মরে, কেহ পুড়িয়া মরে, কেহ পড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে। কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে। কোন বস্তু গলিয়া ধ্বংস হয়. কোন বস্তু শুকাইয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু গুঁড়া হইয়া যায়, কেহ শুষিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র?

বাবাজি। সকলের যে সমষ্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, তাই রুদ্র।

আমি। তবে রুদ্র একজন না অনেক?

বাবাজি। এক। যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারিকে দেখিবে. সর্ব্বত্রই একই রুদ্র জানিবে।

আমি। তিনি অশরীরী?

বাবাজি। তা ত বলিলাম।

আমি। তবে মহাদেব মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাকে উপাসনা করি কেন? সে কি তাঁর রূপ নয়?

বাবাজি। উপাসনার জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার?

আমি চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। সে কথা স্বীকার করিলাম। বাবাজি বলিলেন,

"যাহারা সেরূপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তাহারা পারে। কিন্তু তার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা হইতে বিরত হইবে? তাহা উচিত নহে। যাহার জ্ঞান নাই, সে যে রূপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এসব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যদি এমন একটা মূর্ত্তি কল্পনা কর, যে তদ্দারা সংহার কারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মূর্ত্তি বলিতে পার। তাই রুদ্রের কাল-ভৈরব রূপ কল্পনা। নচেৎ, রুদ্রের কোন রূপ নাই।

আমি। এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই

আছে। শিব দুর্গা পৃথক পৃথক করিয়া গড়িয়া পূজা করে কেন?

বাবাজি। তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না। অগ্নিতে যে কখন হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না, যে অগ্নিতে হাত পুড়িয়া যাইবে। গাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া, যে আর কখন অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে আগুনের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপ চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রূপ কল্পনা করিতে হয়।

আমি। কিন্তু বৈষ্ণব বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকে রুদ্রের উপাসনা করে না। অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্ত্তব্য।

বাবাজি। বিষ্ণু আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা পূরিবে না, এমন আদেশ কিছু করেন নাই। কিন্তু সে কথা থাক। *রুদ্রাণী, বিষ্ণুরই শক্তি।*

আমি। সে কি? রুদ্রাণী ত রুদ্রের শক্তি?

বাবাজি। বিষ্ণুই রুদ্র।

আমি। এ সব অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা রুদ্র, তিনজন পৃথক। একজন সৃষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন। তবে বিষ্ণু রুদ্র হইলেন কি প্রকারে?

বাবাজি। যে বাবুর বাড়ী বসিয়া আমি ভোজন করিতেছি, ইনি করেন কি জান?

আমি। জানি। ইনি জমিদারি করেন।

বাবাজি। আর কিছু করেন না?

আমি। পাটের ব্যবসাও আছে।

বাবাজি। আর কিছু করেন?

আমি। টাকা ধার দিয়া সুদ খান।

বাবাজি। ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে আমি আজ একজন জমিদারের বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বলি যে আমি একজন ব্যবসাদারের বাড়ী খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে আমি একজন মহাজনের বাড়ী খাইয়াছি, তাহা হইলে তিনজনের কথা বলা হইবে না একজনেরই কথা বলা হইবে?

আমি। একজনেরই কথা। তিন একই।

বাবাজি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনই এক। একজনই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, এবং সংহার কর্ত্তা। হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন, তিন ঈশ্বর নাই।

আমি। তবে তিনজনকে পৃথক পৃথক উপাসনা করে কেন?

বাবাজি। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তাঁর সকল কাজগুলি পৃথক পৃথক করিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি জমিদার হইয়া কিরূপে জমিদারি করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা করেন তাহা বুঝিতে হইবে, আর তিনি মহাজনিতে কি করেন তাহাও বুঝিতে হইবে। তেমনি ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার কৃত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পৃথক পৃথক বুঝিতে হইবে। এই জন্য ত্রিদেবের উপাসনা। একজনেরই কার্য্যানুসারে, তিনটি পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। তিন জনের তিনটি নাম নহে।

আমি। বুঝিলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য জন্মিল, খাইয়া সবাই বাঁচিলাম। বাঁচাইল কে--পালনকর্ত্তা বিষ্ণু—না বৃষ্টিকর্ত্তা ইন্দ্র?

বাবাজি। যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, যে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন পালন করেন, ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্ব্বদেবতা। তবে যেমন আমাদের বুঝিবার সৌকার্য্যার্থ, এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বিল বলি, কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোষ্পদ বলি, তেমনি উপাসনার জন্য তাঁহাকে কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন বিষ্ণু, ইত্যাদি নানা নাম দিই।

আমি। তবে তাঁহার যথার্থ নাম কি?

বাবাজি। তাঁহাকে দুইভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ, এবং সর্ব্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম, বা পরব্রহ্ম, বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য সেইজন্য চিন্তনীয়, সগুণ, এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা স্বরূপ চিন্তা করি তখন তাঁহার নাম দর্শনে ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন, তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।

আমি। কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন?

বাবাজি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই উভয় লক্ষণ-যুক্ত স্বরূপে ধ্যেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এইজন্য, আমি তাঁহার দাসানুদাস, সেই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করি। একবার তোমরা কৃষ্ণনাম কর! বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি!

বাবাজি তখন হরিবোল দিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতেছিল, সে হরিবোল শুনিয়া বলিল,

"বাবাজি! অত হরিবোলের ধূম কেন? পাঁটা টা রান্না বড় ভাল হয়েছে বটে!"

তাই ত! সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় অন্যমনা ছিলাম, দেখি নাই যে বাবাজি এক রাশি ছাগ মাংস উদরসাৎ করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির স্তূপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন! ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম,

"বাবাজি! এই তোমার হরিবোল! এই তোমার বৈষ্ণব ধর্ম্ম! তুমি কণ্ঠী ছিঁড়িয়া ফেল। আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদি করিব না"

বাবাজি। কেন, কি হয়েছে বাপু!

আমি। আমার মাথা হয়েছে! তুমি বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার নাম করিতে নাই তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে?

বাবাজি। পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান কোথায় বলেছেন, যে পাঁটা খাইওনা? যদি পুরাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চাও, তবে পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান্ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মাংসেই নিত্য সেবা

করিতেন। তিনি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ব:ট? তুই বেটা আবার বৈষ্ণব?

আমি। তবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলে কেন?

বাবাজি। অহিংসা যথার্থ বৈষ্ণব কন্যা বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ঘরে গিয়া জাত হারাইয়াছে।

আমি। ছেঁদো কথা বুঝিতে পারি না।

বাবাজি। দেখ, বাপু বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি বোঝ। তোমার কণ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পঞ্চসংস্কারেও নয়, দেড় কাহন বৈষ্ণবীতেও নয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে বল দেখি?

আমি। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ।

বাবাজি। প্রহ্লাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন,

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।

অর্থাৎ "হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা।" কণ্ঠী, কুঁড়োজালি, কি দেখাস রে মূর্খ! এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংসা ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণু নাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল। যে খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমান মনুষ্য মাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যীশুরই পূজা করুক আর পীর প্যাগম্বরেরই পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব। আর তোমার কণ্ঠী কুঁড়ো-

জালির নিরামিষের দলে, যাহারা তাহা শিখে নাই, তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে।

আমি। মাছ পাঁটা খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায়?

বাবাজি। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি?

আমি। তবে আমাকেও একখানা পাতা দিতে বলুন।

তখন পাতা, এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম। পাকের কার্য্যটা অতি পরিপাটি রূপ হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখিয়া বাবাজি বলিলেন.

"বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ দিয়া, আগামী বৎসর কছিমদ্দী সেখকে দিয়া দুর্গোৎসব করাইব?"

আমি। ফল কি?

বাবাজি। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে!

বাবাজি। এ কান দিয়া শুনিস্ ও কান দিয়া ভুলিস্? যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই. বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি, এরূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।

আজ তোমাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিছু বুঝাইলাম। আর একদিন তোমাকে ব্রহ্মোপসনা এবং কৃষ্ণোপসনা বুঝাইব। ধর্ম্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা, দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপসনা, তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপসনা বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপসনা। ধর্ম্মের চরম কৃষ্ণোপসনা।

আমি। বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও কৃষ্ণোপসনায় কিছু প্রভেদ আছে না কি?

বাবাজি। অনেক। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপসনার একত্রে সমাবেশকেই কৃষ্ণোপসনা বলিতেছি। ইহাই গীতোক্ত ধর্ম্ম।

শ্রীহরিদাস বৈরাগী

রাজার উপর রাজা।

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায়,
পেলেম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম
পেলেম কেবল ঝাঁটা॥
বাসের জন্য ঘর করিলাম,
ঘর গেল পুড়ে।
বুড়া বয়সের জন্যে পুঁজি করিলাম
সব গেল উড়ে॥
চাকুরির জন্যে বিদ্যা করিলাম,
ঘটিল উমেদারি।
যশের জন্য কীর্ত্তি করিলাম
ঘটিল টিটকারি॥
সুদের জন্য কর্জ দিলাম,
আসল গেল মারা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম,

শেষে কেঁদে সারা॥
ধানের জন্য মাঠ চসিলাম,
হলো খড় কুটো।
পারের জন্য নৌকা করিলাম,
নৌকা হলো ফুটো॥
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম,
সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম,
ডিক্রীর বেলায় ফাঁকি॥
তবে আর কেন ভাই, বেড়াও ঘুরে,
বেড়ে ভবের হাট।
ঘূর্ণী জলে নৌকা যেমন, ঝড়ের কুটো,
জলন্ত আগুনের কাঠ।
মুখে বল হরি নাম ভাই,
হৃদে ভাব হরি।
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই,
এসো লাভে ঘর ভরি।
এক গুণেতে শত লাভ,
শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ,
ভারি ফেলাও কারবার॥
ভাই বল হরি, হরি বোল,
ভাঙ্গ ভবের হাট।
রাজার উপর হওগে রাজা
লাট সাহেবের লাট॥

আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা সঙ্কল্প করা যায়, তাহা সকল সময়ে সম্পন্ন হয় না। যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না, যে প্রচার কেবল ধর্ম্মবিষয়ক পত্র হইবে। কিন্তু প্রচারের লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে, ইহাতে এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না।

ইহাতে প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্যজীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র ও বহু-বিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরনীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরনীয় না হইলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধেরও সফলতা ঘটে না। অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহুবিষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছি। প্রচারের প্রধান লেখকেরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু প্রচারের বর্ত্তমান ক্ষুদ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা ধর্ম্মালোচনা পরিত্যাগ করিতে

পারি না, অথবা তাহার অল্পতা করিতে পারি না। কাজেই প্রচারের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইবে। কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, আমরা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রচার সম্পাদিত করিতে পারিব।

১। ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যেরূপ প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ হইতে থাকিবে। এখন যাঁহারা তাহা লিখিতেছেন, তাঁহারাই তাহা লিখিবেন।

২। স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব থাকিবে না। অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। "সীতারাম" বন্ধ হওয়ায়, অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে "সীতারাম" পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

৩। এতদ্ভিন্ন, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।

এই সঙ্কল্প পাঠকদিগের অনুমোদিত না হইলে, সিদ্ধ হইবে না। কেননা পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলে কাজেই মূল্য বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য দুইমাস অগ্রে পাঠকদিগকে সম্বাদ দিলাম। পত্রের কলেবর এবং মূল্য কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পাঠকেরা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি করিবেন।

দ্যাবা পৃথিবী।

—:•:—

আকাশের একটি নাম দ্যু বা দ্যৌঃ। নামটি এখনও অর্থাৎ আধুনিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। এই দ্যু বা দ্যৌ বেদে দেবতা বলিয়া স্তুত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছি। ইনি একজন আকাশ দেবতা। ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারী আকাশ, অদিতি অনন্ত আকাশ। কিন্তু দ্যৌ বা দ্যু আকাশের কোন্ মূর্ত্তি—এ কথাটা বলা হয় নাই।

বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পৃথিবীরও আছে। আকাশ দেব বলিয়া, পৃথিবী দেবী বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। একটা কাজের কথা এই যে, এই দ্যু বা দ্যৌ, আর এই পৃথিবী, একত্রে এক সূক্তেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তনাম দ্যাবাপৃথিবী।

আরও কাজের কথা এই যে, কেবল তাঁহারা একত্রে স্তুত হইয়াছেন, এমত নহে, তাঁহারা দম্পতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী।

কেবল তাই নহে। এই দম্পতী সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্যৌ পিতা, পৃথিবী মাতা। আজি আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাকি—বাঙ্গালা সাহিত্যেও "মাতর্ব্বসুমতি!" এমন সম্বোধন পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈদিক ঋষিরা যেমন পৃথিবীকে মাতা বলিতেন, তেমনি

আকাশকে পিতা বলিতেন। "তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।" (১,৮৩, ৪) এই "পিতা দ্যৌঃ" বা "দ্যৌষ্পিতা" অর্থাৎ দ্যৌষ্পিতৃ" শব্দ গ্রীকদিগের "Zeus Pater" এবং রোমক-দিগের "Ju-piter" ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে বলে, আকাশ পঞ্চভূতের একটি। কিন্তু ইহাই আদিম। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। ঋগ্বেদসংহিতায় দর্শনশাস্ত্র নাই—অতএব ঋগ্বেদসংহিতায় এ সকল কথা নাই। কিন্তু তাহাতে আছে, যে আকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা "দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী।" বা "দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতরধ্রু-গগ্নে ভ্রাতর্ব্বসবো" ইত্যাদি।

তবেই, যেমন ইন্দ্র আকাশের বর্ষকমূর্ত্তি, বরুণ আবরকমূর্ত্তি অদিতি অনন্তমূর্ত্তি, দ্যু বা দ্যৌ তেমনি জনকমূর্ত্তি। মনুও বলিয়াছেন, "মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্ত্তিঃ।"

এখন আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কথা বলে না, যে আকাশ এই বিশ্বব্যাপী জীবপুঞ্জের জনক। এরূপ কথা কোন "প্রমাণ" নাই। কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধর্ম্ম সকল গঠিত হয় নাই। যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগিতে পারে না। তবে এই জনকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাশের কি কোন দাবি দাওয়া ছিল না তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন করে না, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে পৃথিবী জুড়িয়া এই দাবি স্বীকার করিয়াছিল। সকল আদিম ধর্ম্মে আকাশ জনক। অনেক ধর্ম্মে আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম।

বেদে দ্যৌঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও

আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। আমরা বলিয়াছি যে এই "দ্যৌঃ" শব্দই "Zeus," কিন্তু Zeus গ্রীকপুরাণে পৃথিবীর স্বামী নহে। গ্রীকপুরাণে Ouranos দেবের পত্নী Gaia দেবী। Gaia সংস্কৃতে "গো।" গো শব্দে পৃথিবী সকলেই জানে। কিন্তু ইহার পতি Zeus নহেন, Ouranos পতি। Ouranos দ্যৌঃ নহেন—Ouranos বরুণ। বরুণও আকাশ। অতএব গ্রীকপুরাণেও আকাশ পৃথিবীর স্বামী। এবং ইহারাই সেই পুরাণমতে সর্ব্ব-জীবের জনক-জননী। আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন ছাড়া, বোধ হয় লাটিন ও গ্রীক বুঝেন না—এবং আমরাও দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অপরাধে অপরাধী। সুতরাং এ কথার পোষকতায় বচন উদ্ধৃতি করিতে পারিলাম না।*

উত্তর আমেরিকার হুরণ, ইরিকোওয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জুলুজাতি. বন্নিজাতি প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই আকাশ দেবতা পূজিত। উত্তর আসিয়ার সামোয়েদ জাতির মধ্যে, কিন্ জাতিদিগের মধ্যে এবং চীনজাতিদিগের মধ্যে আকাশ জনক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ।

ঐরূপ আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং চৈনিক জাতিদিগের মধ্যে আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, পৃথিবী আকাশের পত্নী; পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে বা বিবাহে জীবসৃষ্টি।

* এই তত্ত্বে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পৃথিবীর পরিণয় কল্পিত হইয়াছিল, তখন দ্যৌঃ শব্দ জিয়স্ শব্দে পরিণত হয় নাই। তখন আর্য্যবংশীয়েরা পৃথক্ পৃথক্ দেশে যাত্রা করে নাই। অনেক কালের প্রাচীন কথা।

চৈনিক দার্শনিকেরা ইহার উপর একটু বাড়াইলেন। আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা; ইহা হইতে তাঁহারা করিলেন, যে সৃষ্টিতে দুইটি শক্তি আছে—একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, একটি স্বর্গীয়, একটি পার্থিব। একটির নাম ইন্, আর একটির নাম ইয়ঙ্।

ইহাতে পাঠকের, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি পুরুষ মনে পড়িবে। ভারতবর্ষীয়েরা যে চৈনিকদিগের নিকট হইতে এ কথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৈনিকেরা যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এমন কথা বলিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, দুই জাতির মধ্যে এক কারণেই এই প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। উভয় দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে, তাহা আমরা জানি। বোধ হয় এই দ্যাবাপৃথিবীতত্ত্ব, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও মায়াবাদে মিলিত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে পরিণত হইয়া থাকিবে। সেই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব হইতে তান্ত্রিক উপাসনার উৎপত্তি কি না, এবং ভৈরব ও ভৈরবীর মূলে এই দ্যাবাপৃথিবী কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। এক্ষণে আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত নহি।

আমরা এতদিনে যে দুইটি স্থূল কথা বুঝাইলাম, তাহা পাঠককে এইখানে স্মরণ করাইয়া দিই।

প্রথম। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, বিশ্বের নানা বিকাশ মাত্র—যথা—আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ু।

দ্বিতীয়। এইরূপ ইন্দ্রাদির উপাসনা কেবল ভারতবর্ষে নহে, অনেক স্থানে আছে। এক্ষণে আমরা বিচার করিব,

প্রথম। কেন এরূপ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়। এখানে উপাসনা বস্তুটা কি।

কৃষ্ণচরিত্র।

সুভদ্রাহরণের পর খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানীর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন, তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটা এই। গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম।

পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বড় যাজ্ঞিক ছিলেন। চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ করিতে করিতে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা হায়রাণ হইয়া গেল। তাহারা আর পারে না—সাফ জবাব দিয়া সরিয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিলেন—তাহারা বলিল এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না—তুমি রুদ্রের কাছে যাও। রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন—রুদ্র বলিলেন, আমরা যজ্ঞ করি না—এ কাজ ব্রাহ্মণের। দুর্ব্বাসা একজন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমারই অংশ—আমি তাঁহাকে বলিয়া দিতেছি। রুদ্রের অনুরোধে, দুর্ব্বাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর যজ্ঞ—বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃত ধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির Dyspepsia উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, ঠাকুর! বড় বিপদ—খাইয়া খাইয়া শরীরে বড় গ্লানি উপস্থিত

হইয়াছে, এখন উপায় কি? ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি করিলেন, তাহা *Similia Similibus Curanter* হিসাবে। তিনি বলিলেন, ভাল, খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও। খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল—পীড়া আরাম হইবে। শুনিয়া অগ্নি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারিদিকে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত—হাতীরা শুঁড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা করিয়া জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষীগণ মিলিয়া আগুণ নিবাইয়া দিল। আগুণ সাতবার জ্বলিলেন, সাতবার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার? তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনাটি জানাইলেন—খাণ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে—খাইতে দেয় নাই। তখন কৃষ্ণার্জ্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফশল নষ্টের একটা উপায় করা যাইতে পারিত। যাই হোক—ইন্দ্র চটিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুনকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছুড়িয়া মারিলেন—অর্জ্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইলওয়ে টনেল করিবার বড় সুবিধা হইত) শেষ ইন্দ্র বজ্র

প্রহারে উদ্যত—তখন দৈববাণী হইল যে ইহারা নরনারায়ণ প্রাচীন ঋষি। * দৈববাণীটা বড় সুবিধা—কে বলিল তার ঠিকানা নাই—কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন সচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পশু পক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাঁহারা মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্নি ভাল হইল—(আমাদের হয় না কেন?) তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনকে বর দিলেন। পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খুসী হইয়া ঘরে গেলেন।

এরূপ অত্যুক্তি—এরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার, মহাভারতের প্রথম স্তরে বড় দেখা যায় না। দ্বিতীয় স্তরে ইহার বাহুল্য। অনেক কারণে এই খাণ্ডবদাহ পর্ব্বাধ্যায়ের অধিকাংশ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা কোন্ স্তরের অন্তর্গত তাহা বিচার করিবার বড় প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। প্রথমস্তরগতই হউক বা দ্বিতীয়স্তরগতই হউক, এরূপ আষাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়—অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য—অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র,—তাহার ভাল মন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য থাকে তবে সে টুকু এই যে, পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন

* পাঠক দেখিয়াছেন, একস্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন ঋষি আবার দেখিব তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথার সামঞ্জস্য চেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের এখন সমালোচ্য।

ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জ্জুন তাহাতে আগুণ লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া. জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারিরা নিত্য তাহা করিয়া থাকে।

আমরা স্বীকার করি, যে এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টালবয়স্-হুইলরি ধরণের হইল। কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য্য সূচিত করিতে বাধ্য হইলাম তাহার কারণ আছে। খাণ্ডব দাহটা অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরান্তর্গত হউক, কিন্তু স্থূল ঘটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। কেন না এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভা পর্ব্বের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল সে অর্জ্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জ্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার জন্য ময়দানব পাণ্ডবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সেই সভা লইয়াই সভাপর্ব্বের কথা।

এখন সভাপর্ব্ব অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে এক পর্ব্ব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তদুপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা ঐতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্ম্মাতা একজন অবশ্য

থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়রের নাম ময়। হয় ত সে অনার্য বংশীয়—এজন্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে সে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতা বশতঃ এই এঞ্জিনিয়রী কাজ টুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাণ্ডবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এ সকলি কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অন্ধকারের ঢিল।

হয় ত, ময়দানবের কথাটা সমুদয়ই কবির সৃষ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষ্যে কবি যে ভাবে কৃষ্ণার্জ্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না ময়দানব প্রাণ পাইয়া, অর্জ্জুনকে বলিলেন "আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জ্জুন কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না; কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জ্জুন তাহাকে বলিলেন,

"হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।"

ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম; ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর প্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের

দুর্ভাগ্য। অর্জ্জুন বাক্যের অপরার্দ্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জ্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,

"তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়. ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

অর্থাৎ, আমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয় তবে, সেও পরের কাজ · আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় "দানব কুলের বিশ্বকর্ম্মা"—বা চীফ ইঞ্জিনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন "যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নির্ম্মাণ কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।"

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন; ধর্ম্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্ম্মাণ ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, কৃষ্ণের হস্তে তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভা সংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

গত সংখ্যক কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে সমাজসংস্করণের কথাটা

উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছিলাম যে তিনি সমাজসংস্থাপক বা Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন, (Moral and Political Regeneration ধর্ম্ম প্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজ-সংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন—জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা তাহা জানি না—আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একটা পৃথক জিনিষ বলিয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজ সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে, হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণপদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরণের হয়। আর, যার কাজ নাই, হুজুগ তার বড় ভাল লাগে। সমাজ সংস্করণ আর কিছু হোক না হোক, একটা হুজুগ বটে। হুজুগ বড় আমোদের জিনিস্। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত, সমাজ, সংস্কার কিসের জোরে হইবে? রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজ সংস্করণের পৃথক চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজ সংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই।

চৈতন্যবাদ।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল?

অনেকেই মনে করেন. এ কথার উত্তর অতি সহজ। খ্রীষ্টিয়ান বলিবেন, মুসা ও যীশু ধর্ম্ম আনিয়াছেন। মুসলমান বলিবেন মহম্মদ আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত আনিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ধর্ম্মের মুসা মহম্মদ কেহ নাই। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার সংখ্যা নাই, বলিলেও হয়। সকলেরই এক একটা ধর্ম্ম আছে, এমন কোন জাতি আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্ম্মে প্রায় মহম্মদমুসা খ্রীষ্ট বৌদ্ধের তুল্য কেহ ধর্ম্মস্রষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল?

আর যাঁহারা বলেন, যে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ, মুসা বা মহম্মদ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় একটা ভুল আছে। ইঁহারা কেহই ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে য়িহুদায় য়িহুদী ধর্ম্ম ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে; মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে ধর্ম্ম ছিল, ইস্‌লাম তাহার উপর ও য়িহুদী ধর্ম্মের উপর গঠিত হইয়াছে; শাক্যসিংহের আগে বৈদিক ধর্ম্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ মাত্র। মুসার ধর্ম্ম প্রচারের

পূর্ব্বেও এক য়িহুদী ধর্ম্ম ছিল; যুসা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই সকল আদিম ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল? তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্ম্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্ম্মের স্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্ট ধর্ম্ম নাই, সকল ধর্ম্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে—পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসিল? যদি বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রমে পৃথ্বীতলে জীবসঞ্চার হইয়াছে, তাহা হইলে বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল। কেননা সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে। অতএব কি জীবোৎপত্তি কি ধর্ম্মোৎপত্তি সম্বন্ধে এ উত্তর দিলে চলিবে না।

কেননা ধর্ম্মোৎপত্তিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই, যে বিশেষের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না, যে পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছু বুঝি পাঠকদিগকে অতি সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি।

ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্ম্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাইব না। কেননা, সভ্যজাতির ধর্ম্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই,

প্রথমাবস্থা নহিলে আর কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে হইল, অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায়; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল।

এখন, মনুষ্য যতই অসভ্য হৌক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে, যে শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক সামগ্রী।

এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে। সে মরিয়া গেল, আর সে কিছুই করে না। তাহার শরীর যেমন ছিল, তেমনই আছে, হস্তপদাদি কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। একটা কিছু তার আর নাই, তাই আর পারে না। তাই অসভ্য মনুষ্য বুঝিতে পারে, যে শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি আছে, সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে।

সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, "জীবন" বা "প্রাণ" বা আর কিছু। অসভ্য মনুষ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিষটা বুঝিয়া লয়। বুঝিলে দেখিতে পায়, যে এটা কেবল জীবেরই আছে, এমত নহে, গাছ পালারও আছে। গাছ পালাতেও এমন একটা কি আছে, যে সেটা যত দিন থাকে, ততদিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শুকাইয়া যায়, মরিয়া যায়। অতএব গাছ পালারও জীবন আছে। কিন্তু গাছ পালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ এই

যে গাছ পালা নড়িয়া বেড়ায় না, খায় না, গলার শব্দ করে না, মারপিট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত কোন ক্রিয়া করে না।

অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উঠিল। দেখিল, জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু আছে, যাহা গাছ পালায় নাই। সভ্য হইলে তাহার নাম দেয়, "চৈতন্য"। অসভ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিষটা বুঝিয়া লয়।

আদিম মনুষ্য দেখে, যে মানুষ মরিলে, তাহার শরীর থাকে—অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ নিদ্রা যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্চ্ছাদি রোগে শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে সিদ্ধান্ত করে, যে চৈতন্য শরীর ছাড়া, একটা স্বতন্ত্র বস্তু।

এখন অসভ্য হইলেও, মনুষ্যের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়া সম্ভাবনা, যে এই শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক বস্তু হইল, তবে শরীর না থাকিলে এই চৈতন্য থাকিতে পারে কি না? থাকে কি না?

মনে করিতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ কি? স্বপ্ন দেখি; স্বপ্নে শরীর একস্থানে রহিল, কিন্তু চৈতন্য গিয়া আর একস্থানে, দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা কাজ করিতেছে। ভূত আছে, এ কথা স্বীকার করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সভ্য কি অসভ্য মনুষ্য কখন কখন ভূত দেখিয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিবার বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই। মস্তিষ্কের রোগে, কিম্বা ভ্রমবশতঃ মনুষ্যে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দেখিলে অসভ্য মানুষের

মনে এমন হইতে পারে, যে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এবং এই খানেই ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত।

ইহা বলিয়াছি যে অসভ্য মানুষ বা আদিম মানুষ. যাহাকে ক্রিয়াবান্, আপনার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান, দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে। জীব, আপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নির্জ্জীব ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান নহে, এ জন্য নির্জ্জীব চেতন নহে। কিন্তু আদিম মনুষ্য সকল সময়ে বুঝিতে পারে না, কোন্ টা চৈতন্যযুক্ত, কোন্ টা চৈতন্যযুক্ত নহে। পাহাড়, পর্ব্বত, জড়পদার্থ সচরাচর ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, সচরাচর ইহাদের অচেতন বলিয়া বুঝিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ বলিয়াই বোধ হয়; আদিম মনুষ্যের সেটাকে সচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়। কলনাদিনী নদী, রাত্রি দিন ছুটিতেছে, শব্দ করিতেছে, বাড়িতেছে, কমিতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে, কখন পরিমিত জলসেক করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবতী বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যের কথা বড় আশ্চর্য্য। জগতে যাহাই হো'ক না কেন, ইনি ঠিক সেই নিয়মিত সময়ে পূর্ব্বদিগে হাজির। আবার ঠিক আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে সমস্ত দিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পশ্চিমে লুক্কায়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রিয় বলিয়া বোধ হয়, ইহাও সচৈতন্য বোধ হয়। চন্দ্র, ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে? মেঘ আসিয়া

কেন বৃষ্টি করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টিরই ইচ্ছা, এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সম্বন্ধেও ঐ রূপ। বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে ঐরূপ ঘটিবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝা যাইতে পারে। অগাধ, দুস্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষুব্ধ রত্নাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে পারে। ইত্যাদি।

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া, উপধর্ম্ম বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে, যে উপধর্ম্মই সত্য ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থা। বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা তেমনি উপধর্ম্ম। মতান্তর আছে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন, কাব্য সাহিত্যশিল্প, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভব নহে।

তার পর ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড়পদার্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অনেক গুলি অতিশয় ক্ষমতাশালী, তেজস্বী, বা সুন্দর। সেই আগ্নেয়-

গিরি একেবারে দেশ উৎসন্ন দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া মনুষ্যবুদ্ধি, স্তম্ভিত, লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সেই কূল-পরিপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চারিণী নদী, মঙ্গলে অতিশয় প্রশংসনীয়া, অমঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করী বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকর্ম্মা কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য্য; ইঁহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোৎপাদন জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক, সকলই বিস্ময়কর। ইঁহাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ অনুদিত থাকেন, ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল শক্তিশালী মহামহিমাময় জড় পদার্থ, যদি সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বলিয়া বোধ হইল, তবে মানুষের মন ভয়ে বা প্রীতিতে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী তাই নহে, মনুষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, সে তুষ্ট হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে অনিষ্ট করে। এই সকল মহাশক্তি-যুক্ত মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদক পদার্থ যদি চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মনুষ্য মনে করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সর্ব্বদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, জলধি, আকাশাদির উপাসনা। এই জন্য বেদের ইন্দ্রাদি আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা, অগ্নি দেবতা প্রভৃতির উপাসনা।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা দ্বিবিধ। যাহার শক্তিতে ভীত হই, বা যাহার শক্তি হইতে সুফল পাইবার আশা করি, তাহার উপাসনা করি। কিন্তু তা ছাড়া আরও এমন সামগ্রী আছে, যাহার উপাসনা করি, সেবা করি, আদর করি। যাহার ভয়দায়িকা শক্তি নাই, অথচ হিতকর তাহারও আদর করি। অচেতন ওষধি বা ঔষধের আমরা এরূপ আদর করি। ছায়াকারক বট বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসির তলায় জল সিঞ্চন করি। উপকারী অশ্বের ভৃতাবৎ সেবা করি। গৃহরক্ষক কুক্কুরকে যত্ন করি। দুগ্ধদায়িনী গাভি, এবং কর্ষণকারী বলদকে আরও আদর করি। ধার্ম্মিক মনুষ্যকে ভক্তি করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে, বেশ্যা বাদ্যযন্ত্র পূজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে। *

আরও আছে। যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্য গুণেই দেবতা, সাতাইশ নক্ষত্র তাঁহার মহিষী।

---

* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড লায়েল লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধর্ম্ম! এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে। কাজেই বুদ্ধির জোরে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইলেন।

প্রকৃত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময়ে ইহা উপাসনা বলিয়া গণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে। কথাটা উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ করা যাউক তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা শক্তিশালী, তাহা নৈসর্গিক পদার্থের কোন বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়াই শক্তিশালী। কার্ব্বনের প্রতি অম্লজনের নৈসর্গিক অনুরাগই অগ্নির শক্তির কারণ। তাপ, জল, ও বায়ু এই তিন পদার্থে পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি।

এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম. এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম সত্য। সত্যই শক্তি। কেবল জড়শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যীশু বা শাক্য সিংহের উক্তি সকল বা কর্ম্ম সকল সমাজের সহিত নৈসর্গিক শক্তিবিশিষ্ট, অর্দ্ধেক জগৎ আজিও তাঁহাদের বশীভূত।

যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক, কেবল *হিতকর,* উনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে, শিব। সুন্দর বা সৌম্যের নূতন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সুন্দরই আছে, সৌম্য সৌম্যই আছে।

এই সত্য (The True) শিব (The Good) এবং সুন্দর (The Beautiful) এই ত্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। এই উপাসনা

পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই অহিতকর। দ্বিতীয়বিধ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন বলিয়াই জ্ঞান থাকে। গেটে (Goethe) বা বর্ডস্বর্থ (Wordsworth) এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা অহিতকর নহে, বরং হিতকর, কেন না ইহার দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি সাধিত হয়। ইহা অনুশীলন বিশেষ। এখনকার দেশী পণ্ডিতেরা (বিশেষ বালকেরা) তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠে না, কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিতেন। বেদে দ্বিবিধ উপাসনাই আছে।

প্রচারের প্রথম সংখ্যা হইতে বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কি কি কথা বলিলাম তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখা যাউক।

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন লোকাতীত চৈতন্য নহেন।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবর্ষীয়েরা যেমন ইহাঁদিগের দেবতা বলিয়া মানিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ করিত বা করে।

৩। ইহার কারণ এই যে প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া, তাহার শক্তি, হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য্য অনুসারে, তাহার উপাসনা করে।

৪। সেই উপাসনা ইষ্টকারী এবং অনিষ্টকারী উভয়বিধ হইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, বেদে কিরূপ উপাসনা আছে। তাহা হইলেই আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করি।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

—:০:—

ছা। আপনি ঈশ্বরের স্বরূপ কি ইহা বুঝাইবার জন্য যে মনোবিজ্ঞানের কচকচিতে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন বড় বুঝিতেছি না এবং সেই কচকচির মধ্যে প্রবেশ করাও বড় দুরূহ বোধ হইতেছে।

শি। দেখ, মনোবিজ্ঞানের কচকচিতে প্রবেশ না করিলে ঈশ্বর কি এবং হিন্দুধর্ম্মই বা কি তাহা সবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিবে না। বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিলে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিবে না। সেই জন্য ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঈশ্বর কথাটিতে কি অর্থ বুঝায় তাহা তোমাকে কতক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। খ্রীষ্টিয়ানদের God আর আমাদের ঈশ্বর এই দুইটি কথার একইরূপ অর্থ নহে। খ্রীষ্টিয়ানরা গির্জ্জায় গিয়া যেরূপ প্রার্থনা করাকে ঈশ্বরোপাসনা বলেন হিন্দুমতে তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিবেচনায় জগতের আদিকারণ ঈশ্বর একজন মহান্ ব্যক্তির ন্যায় জগৎ ছাড়া অন্য কোন স্থলে অবস্থিতি করিয়া জগতের কাজ কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেছেন। কে কখন কি কার্য্য করিতেছে তাহা সদাই উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে জগৎকারণ ঈশ্বর এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন স্থলে বাস করেন না। এই জগতই হিন্দুদের মতে অনন্ত

অনাদি এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যময়। হিন্দুদের মতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিদৃশ্যমান এই জগতের সমষ্টিভাব সদাই এক। এই একই ঈশ্বর, ইনি নির্গুণ, নিরাকার এবং সচ্চিদানন্দ। এই একমেবাদ্বিতীয়ং পুরুষের মহিমা হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল প্রকটিত হইয়াছে; সেই নিয়মের বশেই মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতেছে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর এই জগৎ রূপ রাজ্যের কাজ কর্ম্ম লইয়া সদাই ব্যস্ত; হিন্দুদের ঈশ্বর এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন কূটস্থ পুরুষ। এই কূটস্থ পুরুষের বিশ্বরাজ্য অনন্ত অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ফলে চলিতেছে, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘটিবে না, সুতরাং ঈশ্বর যে এই জগতের জমীদারী লইয়া সদাই ব্যস্ত আছেন ইহা হিন্দুরা কল্পনাতেও আনিতে পারেন না। যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে সেইরূপ ফল পাইবে এ নিয়মের লঙ্ঘন ত কখনই হইবে না; তবে পুণ্যবান্‌কে পুণ্যের ফল আর পাপীকে পাপের ফল দিবার জন্য ঈশ্বর কেন সদাই ব্যস্ত থাকিবেন তাহা হিন্দুরা বুঝিতে পারেন না। হিন্দুশাস্ত্রমতে মনুষ্যের কর্ম্মই শুভাশুভ ফল-প্রদাতা এবং এই কর্ম্মাত্মক শক্তিই হিন্দুদিগের দেবদেবী। এ কথা তোমাকে পরে বুঝাইব। এক্ষণে দেখ, ঈশ্বর কথাটিতে খ্রীষ্টিয়ানরা যেরূপ অর্থ বুঝেন আর হিন্দুরা যেরূপ অর্থ বুঝেন এ উভয়ে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে গেলেই মনোবিজ্ঞানের কচকচিতে প্রবেশ করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের কচকচির মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব যদি বুঝা যাইত তবে কপিলদেব কটমটে সাংখ্য শাস্ত্র বা ব্যাসদেব বেদান্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অনর্থক আমাদের মাথা ঘুরাইবার কল প্রস্তুত করিয়া যাইতেন না।

বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই তোমাকে ক্রমে ক্রমে বলিতে ইচ্ছা করি। বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ আর যোগ শাস্ত্রের নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা গন্তব্য পদার্থই এই জগতের আদি কারণ। সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত নিত্যসুখ, নির্ব্বাণসুখ পাওয়া যায় না। দেবদেবীর উপাসনায় কোন কোন শুভফল পাওয়া যায় ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত নিত্যসুখ পাওয়া যায় না। সেই জন্যই দেবদেবীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনার কাছে অধম উপাসনা। খ্রীষ্টিয়ানগণ ঐহিক পারত্রিক সুখ কামনায় যেরূপ প্রার্থনা করাকে ব্রহ্মোপাসনা বা ঈশ্বরোপসনা বলেন, সেইরূপ সকাম উপাসনা দ্বারা সেই সেই ঐহিক বা পারত্রিক ফল প্রদাতা উপাসকের কর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মাত্মক দেব দেবীর সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওরূপ সকাম উপাসনায় মুক্তিদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার কখনও সম্ভবে না। সেই জন্যই উহাদের সকাম উপাসনা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মজ্ঞের কাছে দেব দেবীর উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদের সকাম কর্ম্মকাণ্ড দেবদেবীর উপাসনা, কেননা বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা কামনা-সিদ্ধি-প্রদাতা কর্ম্মাত্মক শক্তির সাহায্য লাভ হয়। ঐ সকল কর্ম্মাত্মক শক্তিই দেব দেবী, ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই জন্যই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী দেব দেবীর উপাসনা অধম উপাসনা। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন যে

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাং।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভ হয় এবং সেই ভোগৈশ্বর্য্য লাভে মুগ্ধ জনের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না এবং সেই জন্য তাহারা সমাধি সুখ লাভে বঞ্চিত থাকে। এই জন্যই ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে দেব দেবীর উপাসনা অধম উপাসনা। একাগ্রচিত্তে যে যেরূপ কামনা করে তাহার একাগ্রতা নিবন্ধন সে সেই কামনানুযায়ী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্য্য কামনা থাকিলে ভোগৈশ্বর্য্য-ফল-প্রদা শক্তি অর্থাৎ দেব দেবীর সাহায্য পাইবে; আর যদি নিষ্কাম হয় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কামনা না থাকে তবে নিগুর্ণ নিরাকার শক্তি ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইবে। সকাম কর্ম্মই দেব দেবীর উপাসনা এবং নিষ্কাম কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা জানিও। নিরাকার ঈশ্বরোপাসক নামে খ্যাত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের সকাম উপাসনা বাস্তবিক সগুণ ও সাকার দেব দেবীর উপাসনা ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসুর সাকার কৃষ্ণোপাসনা বা অন্যরূপ উপাসনা ভোগৈশ্বর্য্য কামনা রহিত হওয়ায় উহাই যথার্থ ঈশ্বরোপসনা।

আমি তোমাকে পূর্ব্বে ঈশ্বর নিরাকার নিগুর্ণ ও বিশ্বরূপ এই কয়টি কথার যে অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে আজকাল অনেকে প্রকৃত পক্ষে দেব দেবীর উপাসনা করিয়া যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। যাহা আমাদের স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত তাহারই নাম যদি নিরাকার হয় তবে দেব দেবীও

নিরাকার। কিন্তু আমি তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যাহা অনন্ত তাহাই কেবল নিরাকার। অনন্তশক্তির আধার পদার্থই নিরাকার আর সান্তশক্তির আধার পদার্থই সাকার। দেব দেবীগণ সান্তশক্তিবিশিষ্ট এই জন্য তাঁহাদের উপাসনায় তাঁহাদের সাহায্যে অনন্ত সুখ পাওয়া কখনই সম্ভব নয়, এই জন্যই নিরাকার অর্থাৎ অনন্তশক্তির আধার সেই অনন্ত ব্রহ্মশক্তির উপাসনা ব্যতীত অনন্ত মুক্তি সুখ কেহ কখন পাইতে সমর্থ হন না। এক্ষণে ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা তোমায় বলি শুন। মুক্তিকামনায় একাগ্রচিত্ত, শমদমাদি গুণে অলঙ্কৃত, অন্য কোন ফল কামনা-রহিত সাধক যে শক্তির সাহায্যে অনন্ত আনন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হন সেই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। এই অনন্ত জগৎ এই ব্রহ্মশক্তির আধার এবং এই অনন্ত ব্রহ্মশক্তি বিশিষ্ট অনন্ত জগতই ঈশ্বর। যিনি এই ঐশ্বরিক শক্তি অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনি আপনাকে অনন্ত সত্ত্বাবিশিষ্ট পূর্ণজ্ঞানী এবং সদানন্দ স্বরূপ বুঝিয়াছেন এই জন্যই ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া ঋষিগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ছা। আপনি বলিয়াছেন যে কর্ম্মাত্মক শক্তির নামই দেব দেবী, একথাটির অর্থ কি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই।

শি। প্রথমে কর্ম্ম কথাটিতে হিন্দুশাস্ত্রে কি অর্থ বুঝায় তাহা বলি শুন। যাহা করা যায় তাহারই নাম কর্ম্ম। আমি হাত নাড়িলাম ইহা একটি কর্ম্ম। আমি হাত নাড়িবার ইচ্ছা করিলাম কিন্তু হাত নাড়িলাম না ইহাও একটি কর্ম্ম। আমার হাত নাড়া কর্ম্মটি স্থূল জাতীয় এবং হাত নাড়িবার ইচ্ছা করা কর্ম্মটি সূক্ষ্মজাতীয়। যখন হাত নাড়িলাম, যে শক্তির ব্যয়

হইল তখন সেই স্থূলজাতীয় শক্তির ক্রিয়া স্থূল জগতে প্রকটিত হয় অর্থাৎ সেই শক্তি তাড়িৎ বা তেজ বা অন্য কোন আকার ধারণ করিয়া থাকে। আর যখন কেবলমাত্র হাত নাড়িবার ইচ্ছা করিলাম তখন কি আমি কোন শক্তির ব্যয় করিলাম না? হিন্দুদের মতে দৈহিক অঙ্গচালনাদি কর্ম্ম দ্বারা যেমন শক্তির ব্যয় করা হয়, মানসিক কর্ম্ম সকলেও সেইরূপ শক্তির ব্যয় হইয়া থাকে। এই শক্তি স্থূল জগতে তাড়িত তেজ প্রভৃতি রূপে তখনই পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকটিত হয় না বটে, কিন্তু সূক্ষ্মজগতে সূক্ষ্মাকারে উহা প্রকাশ পায়।

যেমন একটি বীজ ক্ষেত্রে রোপণ করিলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি নিবন্ধন ক্ষেত্রস্থ সেই জাতীয় শক্তির সাহায্যে উহা ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফলশালী হয়, আমাদের মানসিক চিন্তা কল্পনা বা ইচ্ছা প্রভৃত শক্তিও সেইরূপ সূক্ষ্মজগতের ক্ষেত্রে বীজরূপে নিহিত হয়। ঐ বীজ যে জাতীয় সেই জাতীয় শক্তির সাহায্যে ক্রমে ফল উৎপাদন করে। সূক্ষ্মজাতীয় যেরূপ শক্তির সাহায্যে মানসিক কর্ম্ম সকল হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহারই নাম দেবশক্তি। এবং এই মানসিক কর্ম্মকেই সাধারণতঃ হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্ম বলা যায়। চিত্তের একাগ্রতা হইতে যে কর্ম্মরূপ বীজ উৎপন্ন হয় সেই বীজ বেশী তেজস্বী হয় এবং উহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সূক্ষ্মজাতীয় যে প্রাকৃতিক শক্তির বশে মানস ব্যাপাররূপ বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহারই নাম দেবশক্তি ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি. কিন্তু বাস্তবিক এরূপ কোন শক্তি জগতে আছে কি না সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হইতে পারে। এই সন্দেহ ভঞ্জন জন্য হিন্দু ঋষিগণের দোহাই না দিয়া আমি

তোমাকে পাশ্চাত্যগণের মেসমেরিজম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদিগের ইচ্ছা শক্তিতে আমরা যেমন আপনাদেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করিতে পারি সেইরূপ একজনকে মেসমারাইজ করিয়া আমার ইচ্ছার বশে তাহার হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করা যায়। ইহাতে এই প্রমাণ করা যায় যে আমার ইচ্ছাপ্রসূত সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া তাহার ফলে স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করাইতে সক্ষম হইল। সুতরাং আমার বাহিরে অবশ্যই এমন ক্ষেত্র আছে বলিতে হইবে যাহাতে আমার ইচ্ছাজনিত শক্তি প্রযুক্ত হইয়া ক্রমে তাহার ফলে অপরের অঙ্গ সঞ্চালিত করিল। যে ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছাশক্তি উহা অন্য জনের অঙ্গচালনক্ষম শক্তিতে পরিণত হইতে পারে তাহাকে পাশ্চাত্যগণের কথায় Animal magnetic fluid বলা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থে ব্যপ্ত ক্ষেত্রই হিন্দুদের মতে দেবশক্তির আধার। এবং এইরূপ ক্ষেত্রাভ্যন্তরস্থ যে শক্তির বশে মনুষ্যের কোন মানসিক কর্ম্মরূপ বীজ হইতে ক্রমে কর্ম্মফল জন্মে তাহাই দেবশক্তি অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মফল প্রদাতা তাহারাই দেবতা।

যেমন স্থূল জগতে তেজ, তাড়িত আদি নানারূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে সেইরূপ সূক্ষ্মজগতেও দেবশক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এইজন্যই হিন্দুদের দেব দেবী সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। এই জন্যই কোন একটি দেব অসীম শক্তিবিশিষ্ট ও সাকার। এই জন্যই কোন দেব দেবীর সাহায্যে অনন্তকাল স্থায়ী শুভফল পাওয়া সম্ভব নহে। এই জন্যই স্বর্গসুখ প্রভৃতি যে সকল সুখ দেবদেবীর সাহায্যে পাওয়া যায় তাহাও অনিত্য এবং মুমুক্ষুর বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই বেদের সকাম কর্ম্মকাণ্ড মুমুক্ষুর কাছে অধম উপাসনা।

সকাম মানসব্যাপার আর কোন না কোন দেব দেবীর উপাসনা একই কথা। সকাম মানসব্যাপারে রত মনুষ্য অজ্ঞাতসারে দেবশক্তির অর্চ্চনা করিতেছে। এবং তাহাতে আসক্ত হইয়া নিত্যসুখদাতা নিত্য পদার্থের অর্চ্চনা করিতে ভুলিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন কোন না কোন দেব দেবীর অর্চ্চনায় আসক্ত হইয়া মানুষে নিত্যসুখ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই হিন্দুধর্ম্মের সার কথা। তবে যে হিন্দুধর্ম্মে দেব দেবীর উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড যাহা দেবদেবীর উপাসনা তাহা একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় নহে; ফল-কামনা-রহিত হইয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা জীবের বন্ধের কারণ হয় না। অর্থাৎ উহা আপাত পক্ষে দেব দেবীর অর্চ্চনা হইলেও কামনা শূন্যতা নিবন্ধন উহা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা।

যখন একজন মনুষ্য অন্যলোকের উপাসনা করে তখন তাহার উদ্দেশ্য সেই উপাস্য লোকের নিকট হইতে কোন রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া। সেইরূপ কোন দেবশক্তি সাহায্য লাভের জন্য যাহা করা যায় তাহার নাম দেব উপাসনা; আর সেই একমেবাদ্বিতীয়ং অনন্ত পুরুষের অনন্তশক্তি যাহা এই সমগ্রজাতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তির সমষ্টি-শক্তি সেই শক্তির সাহায্য পাইবার প্রয়াসকেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। যিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন ফল কামনা করিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনি হাজার কেন ভক্তিভাবেই ডাকুন না ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য তিনি পাই-

বেন না। তাঁহার প্রার্থনার ফল ফলিবে না। একথা আমি বলি না, কেন না একান্ত একাগ্রতার সহিত সেই ফললাভের কামনা থাকায় ভক্তিবৃত্তির উদ্রেকের সহিত যে মানস ব্যাপার রূপ কর্ম্ম তিনি সৃজন করিলেন, সেই জাতীয় কর্ম্ম ফলপ্রদ দেবশক্তির সাহায্য তিনি পাইবেন। এইরূপ সকাম উপাসক ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ডাকিয়া দেবশক্তির সাহায্যে কোন ফল পাইলে সহজেই এরূপ ভ্রান্ত হইয়া পড়েন, যে মনে করেন তিনি বুঝি ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য পাইয়াছেন। এইরূপ আমাদের স্থূল চক্ষুর অগোচর কোন দৈব শক্তিকেই ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া ভ্রম হওয়ায় মানুষ যে অজ্ঞানে পতিত হয় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া বড় দুরূহ হইয়া উঠে। এইরূপ উপাসক দ্বারা ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের যত খর্ব্ব করা হয় সাকার দেব দেবীর উপাসক দ্বারা তাহা হয় না। রাজসাক্ষাৎ করিতে গিয়া দ্বারবান দ্বারা কোনরূপ অনুগৃহীত হইয়া দ্বারবান্‌কেই রাজা জ্ঞান করা যে বড় ভ্রম ইহা তোমাকে আর বেশী বলিতে হইবে না।

সকাম উপাসক কেন ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য পায় না তাহার কারণ কি বলি শুন। যদি দুইটি বেহালা একস্বরে বাঁধিয়া রাখে, তার একটি বাজাইলে অন্যটি বাজিয়া উঠে; একতানে না বাঁধিলে অমনটি ঘটে না। লোহা চুম্বকের কাছে থাকিয়া চৌম্বুক গুণবিশিষ্ট হয় তাই চুম্বকের ও লোহের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি দেখা যায়। তোমার মানসিক শক্তির সুর যে প্রকারের হইবে তুমি সেই প্রকারের দেবশক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে। যদি তোমার আন্তরিক ভাব সকাম হয় তবে তুমি কামরূপী দেবশক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তির সাহায্য পাইবে না। আর যদি নিষ্কাম হও যদি মুমুক্ষুত্ব

অর্থাৎ আমার মোক্ষ হউক এই দৃঢ় ইচ্ছা অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে যে অনন্তশক্তি মোক্ষদেবতা তাহারই সাহায্য পাইবে। ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, বিশ্বব্যাপী, সদানন্দ। যখন নিজেকে ঐরূপ সুরে বাঁধিবার ইচ্ছা অন্তরে উদিত করিতে পারিবে, যখন নিরাকারোস্মি, নির্বিকারোস্মি, নির্গুণোস্মি, সদানন্দোস্মি ইহা বুঝিবার চেষ্টা হইবে, যখন নিজের অহংজ্ঞানের সুরের সহিত বিশ্বের আত্মার সুর মিলাইবার একান্ত বাসনা জন্মিবে, তখনই তুমি ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যলাভের অধিকারী হইবে। ঈশ্বর নিষ্কাম সুতরাং তুমিও নিষ্কাম না হইলে ঐশ্বরিক সুর বাজিবে না। ঈশ্বরের নাম করিয়া সকাম উপাসনা শুনিলে আমার বড় কষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে দেব দেবীর উপাসনা করিব আর বলিব ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তি আর কি হইতে পারে? খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম্ম যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা এই খানেই দেখিতে পাইবে। হিন্দুধর্ম্ম মতে সকাম উপাসনা অধম উপাসনা, তথাপি যদি কোন হিন্দু কোন সকাম উপাসনা করেন তাহা দেব দেবীর সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। ঐশ্বরিক শক্তির ভাব আর কামদায়িনী শক্তির ভাব যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাঁহারা কখনও ভুলেন না। হিন্দুগণ ঈশ্বরের নিকট হইতে মোক্ষ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। নিত্য পদার্থ ঈশ্বর নিত্যফল মোক্ষসুখ ভিন্ন অন্য ফল প্রদান করিতে জানেন না। অনিত্য দেব দেবীগণ মনুষ্যকে অনিত্য সুখ প্রদান করিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখে; অতএব সতত সাবধান থাকিও অনিত্য দেব দেবীগণ যে সুখ দিতে সক্ষম তাহাতে মুগ্ধ হইয়া নিত্য সুখের পথে অগ্রসর হইতে ভুলিও না।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা এইবারে অল্পকথায় বলি শুন। মানবাত্মার সুর যাহার সুরের সহিত মিলাইতে পারিলে মানব নিত্যসুখ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন তিনিই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরে যোগ যুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন এবং আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন, ইহা কৃষ্ণোক্তি। অর্থাৎ সমগ্র জগতের সমষ্টি-শক্তির যে সুর, ঈশ্বরে যোগ যুক্তাত্মা পুরুষও সেই স্বরে বাঁধা। সেই জন্য এই সমগ্র জগতকে অখণ্ড এবং একমেবাদ্বিতীয়ং ভাবিয়া ইহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও।

ছা। আপনি আজ যাহা বলিলেন তাহা কি কি বিষয়ে বলিলেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখি। ১ম। মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। ২য়। খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরকে যেরূপ শুভাশুভ ফল প্রদাতা মহান্ ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞান করেন, বেদান্ত সাংখ্য বা যোগ শাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর সেরূপ নহেন। ৩য়। সগুণ দেব দেবীই ঐহিক বা পারত্রিক ফল বিধাতা। ৪র্থ। সকাম উপাসনা দ্বারা ঐশ্বরিক শক্তির' সাহায্য কোন ক্রমে পাওয়া যায় না; সকাম উপাসনা কামনানুযায়ী দেব দেবীর নিকট পর্য্যন্ত পৌছে, ঈশ্বরের ধারেও যাইতে পারে না, সেই জন্য সকাম উপাসকের পক্ষে কোন বিশেষ দেব বা দেবীর উপাসনা বরং ভাল কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি মনে জানিয়া কোন সকাম উপাসনায় অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িতে হয়। ৫ম। শম দমাদি গুণ বিশিষ্ট হইয়া মোক্ষ কামনায় ঐহিক বা পারত্রিক শুভফলে বীতরাগ হইয়া যে নিষ্কাম উপাসনা তাহাই নিরাকারের উপাসনা। ৬ষ্ঠ। নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ কোন দেব

দেবীর অর্চ্চনা, যদি মোক্ষলাভার্থে অর্থাৎ ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য করা যায় তবে তাহাও ঈশ্বরোপাসনা। ৭ম। ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে সাকার দেবদেবী বিষয়ক চিন্তা ঈশ্বরোপাসনা, কিন্তু ফল কামনা করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ প্রকৃতপক্ষে দেব দেবীর উপাসনা। ৮ম। মুমুক্ষু সাধক যে শক্তির সাহায্যে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন তাহাই ঐশ্বরিক শক্তি। ইহাই জগতের সমষ্টি শক্তি এবং জগদাধার প্রযুক্ত সেই সমষ্টি শক্তিই ঈশ্বর। ৯ম। মনুষ্যের মানসিক ব্যাপার সম্ভূত কর্ম্ম সকল যেরূপ শক্তির অধীনে পরে ফলপ্রদ হয় সেই সূক্ষ্মজাতীয় শক্তিই দেবশক্তি। ১০ম। সকাম উপাসনা মাত্রেই দেব দেবীর উপাসনা, আর নিষ্কাম উপাসনাই মোক্ষদায়িনী ঈশ্বরোপাসনা।

আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তাহা এই যে আপনি দেব দেবীকে কর্ম্মাত্মক কর্ম্মফলপ্রদ সূক্ষ্মজাতীয় শক্তিবিশেষ বলিয়াছেন। তাড়িত তেজ ম্যাগনেটিজ্‌ম ইত্যাদির ন্যায় ঐ সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সেইজন্য প্রত্যেকের গুণ সীমাবদ্ধ, সেই জন্যই সগুণ ও সেই জন্যই সাকার। আপনি সাকার কথার যেরূপ অর্থ বলিয়াছেন সে অর্থে উহারা সাকার বটে, কিন্তু মনে করুন এই কালীদেবীর যেরূপ রূপ চিত্রিত হয় ওরূপ রূপ কি বাস্তবিক কাহারও আছে?

শি। তুমি স্বপ্নে নানারূপ আকার দেখিয়া থাক। কিন্তু বল দেখি তোমার দৃষ্ট আকারের কারণ কি? স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞান মনুষ্যের কমিয়া যায় সেই সময় মানুষের নিজের মানসিক অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে যেমন পরিবর্ত্তন হইতে থাকে

তেমনি নানারূপ আকার দেখিতেছি এই জ্ঞান হয়। মন বড় চঞ্চল এইজন্য ঐ সকল আকার ক্ষণস্থায়ী। যদি কোন বাহিরের শক্তিবলে মনের অবস্থার খানিকক্ষণ একইরূপ থাকে তবে ততক্ষণ ধরিয়া ঐ আকার সম্মুখে রহিয়াছে বোধ হইবে। যে শক্তি স্থূলদেহস্থ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মনের অবস্থান্তর করিতে পারে তাহারই নাম সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি। হিন্দুসাধক সকল দেব দেবীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া এক প্রকার জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায়, (Trance state) থাকিতেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের আভ্যন্তরিক জ্ঞান বেশ আছে কিন্তু স্থূল শরীর বা স্থূল জাতীয় জ্ঞান থাকিত না। মেসমারাইজ করিলে লোকে যেমন অন্তরে জাগ্রত এবং বাহিরে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে এ সেইরূপ অবস্থা। এই অবস্থায় সাধকের মন তাঁহার কামনা ও কর্ম্ম অনুযায়ী সূক্ষ্ম শক্তির সহিত একতানে অবস্থিতি করে। এবং তাঁহার মনের অবস্থানুযায়ী রূপ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হয়। ইহাই কোন দেব দেবীর রূপ। এ সব কথা আর একদিন বুঝাইব।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

উপাসনা।

পূর্ব্বে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, যে উপাসনা দ্বিবিধ। এক, যাহাদের ফলপ্রদ বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপূর্ব্বক তাহাদের উপাসনা, আর, এক যাহাকে ভালবাসি, বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই তাহার প্রসংশা বা আদর। প্রথমোক্ত উপাসনা সকাম, দ্বিতীয় নিষ্কাম। এইরূপ সামান্য নিষ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে পারে এমত নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে হইতে পারে। ভিন্নজাতীয় মহাত্মাদিগের বিশ্বাস যে হিন্দু গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিন্দু কেহই নাই, যে বিশ্বাস করে, যে আমি আমার গাইটির স্তবস্তুতি বা পূজা করিলে সে আমাকে কোন ফল দিবে। গোরু ঘাস খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছু পারে না, তাহা সকলেই জানে। তবে সাধারণ হিন্দুর এই বিশ্বাস যে গোরুকে যত্ন করিলে, আদর করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন। এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে। যাহা উপকারী, তাহা আদরের। যাহা আদরের, তাহার আদর অনুষ্ঠেয় কার্য্য, ঈশ্বরানুমোদিত। এই রূপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় দশপূর্ণমাস যজ্ঞে বৎসাপাকরণ কার্য্যের মন্ত্রে আছে,

"হে বৎসগণ, তোমরা ক্রীড়া পরবশ, সুতরাং বায়ুবেগে

দিগ্দিগন্তরে ধাবমান হও। বায়ু দেবতাই তোমাদিগের রক্ষক। ৩॥

হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎ সাধনার্থ সবিতা দেবতা তোমাদিগকে প্রভূততৃণ বন প্রাপ্ত করান্। ৪॥

হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা অবধ্য-গাভীগণ! তোমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে নিঃশঙ্ক ভাবে গোষ্ঠে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভাগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবর্দ্ধন কর। তোমাদিগকে ব্যঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বা চৌর প্রভৃতি পাপীগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহুপরিবার হইতে থাক। ৫॥"*

ঐ যজ্ঞের দুগ্ধকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক বলেন।

"হে দুগ্ধ, যজ্ঞীয় সুপবিত্র শতধার এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও। সবিতা দেবতা তোমাকে পবিত্র করুন।"

উখা অর্থাৎ হাঁড়িকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। "হে উখে! তুমি মৃণ্ময়, সুতরাং পৃথিবী রূপিণী ত বটই। অধিকন্তু তোমার সাহায্যে যজমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয়। অতএব দ্যুরূপাও তোমাকে বলিতে পারি। ২॥

"হে উখে, তোমার উদরে অবকাশ আছে। সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষলোক ও তোমার অধীন। অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষ লোকও বলিতে পারি। এতাবতা তুমি ত্রিলোক স্বরূপ। সমস্ত দুগ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ। স্বীয়

* এই প্রবন্ধে যজুর্মন্ত্রের যে যে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল তাহা শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ হইতে।

উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাকিবে। বক্র হইবে না। সাবধান! তোমার দার্ঢ্যের ন্যূনতা বা বক্রতা হইলেই যজ্ঞবিঘ্ন উপস্থিত হইবে! সুতরাং যজমান্ আমাদিগের প্রতি বক্র হইতে পারেন, অতএব তিনি যাহাতে বক্র না হন্"। ৩॥

এখানে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে অচেতন জড়পদার্থ বলিয়াই জানেন। হাঁড়ী কি দুধকে কেহই ইষ্টানিষ্টফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে না। অথচ তাহার উপাসনা হইতেছে। এ উপাসনা কেবল আদর মাত্র। গো বৎস সম্বন্ধেও ঐরূপ। অন্য যজ্ঞের মন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

চাতুর্ম্মাস্য যাগে দর্ব্বী অর্থাৎ হাতাকে বলা হইতেছে।

"হে দর্ব্বি, তুমি অন্নে পরিপূর্ণ হইবায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ। এই আকারেই ইন্দ্র দেবতার সমীপে গমন কর। ভরসা করি পুনরাগমনকালেও ফলে পরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ শোভিত হইবে।"

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রথমেই যজমানের মস্তক কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডন করিতে হয়। আগে কুশা কাটিয়া ক্ষুর পরীক্ষা করিতে হয়। সেই সময় কুশাকে বলিতে হয়, "হে কুশা সকল! অতীক্ষ্ণধার ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌরে যে কষ্ট হইতে পারে তাহা হইতে ত্রাণ কর। অর্থাৎ তোমদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত হউক।"

পরে ক্ষৌরকালে ক্ষুরকে বলিতে হয়, "হে ক্ষুর তুমি যেন ইঁহার রক্তপাত করিও না।"

পরে স্নান করিয়া ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। বস্ত্র পরি-

ধানকালে বস্ত্রকে বলিতে হয় "হে ক্ষৌম! তুমি কি দীক্ষণীয় কি উপসদ উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত হইতেছ। আমি এই স্নানে সুন্দর কান্তি লাভ করতঃ সুখস্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে পরিধান করিতেছি।"

তারপর গাত্রে নবনীত মর্দ্দন করিতে হয়। মর্দ্দনকালে নবনীতকে বলিতে হয়। "হে গব্য নবনীত! তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছে। আমাকে তেজঃ প্রদান কর"।

এ সকল স্থানে কি কুশা কিংবা ক্ষুর বা বস্ত্র বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা মনে করিতেছে না। বাতুল ভিন্ন অপরের দ্বারা এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। এ সকল কেবল যন্ত্রের বস্তুতে যত্ন জনক বিধি প্রয়োগ মাত্র। ইন্দ্রাদি দেবের যে স্তুতি সকল ঋগ্বেদে আছে আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মাত্র ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটী ইন্দ্রসূক্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাং॥
অহন্নহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অংজঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ॥
বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেম্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং।
যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আৎ সূর্য্যং জনয়ন্ দ্যামুষাসং তাদীত্না শত্রুং ন কিলাবিবিৎসে॥
অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥
অয়োদ্ধেব দুর্ম্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষম্।

নাভারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ ॥
আপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়ৎ ব্যস্তঃ ॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনোরুহাণা অতিযন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিৎ বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠৎতাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্ভূব ॥
নীচাবয়া অভবৎ বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীৎ দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥
অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং।
বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ॥
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বা অপ তদ্ববার ॥
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্তসিন্ধূন ॥
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরৎহ্রাদুনিং চ।
ইন্দ্রশ্চ যৎযুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে ॥
অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ॥
ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব ॥”

অনুবাদ।

১। বজ্রধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে সমস্ত পরাক্রমসূচক কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমি বর্ণনা করিতেছি। তিনি অহিনামে অভিহিত বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। জল সমূহ ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন এবং পার্ব্বত প্রদেশের রুদ্ধ বহনশীল নদী সকলের কূল ভগ্ন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

২। ইন্দ্রদেব পর্ব্বতে লুক্কায়িত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তষ্টৃদেব ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত গর্জ্জনশীল বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রূপ গো সকল হম্বারব করিয়া সত্বর বৎসের নিকট গমন করে।

৩। বলবান ইন্দ্রদেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপর্য্যুপরি যজ্ঞত্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তৎপরে বলবান ইন্দ্রদেব মারকবজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া মায়াবী অসুরদিগের মায়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য উষাকাল এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন আর কোন শত্রু দেখিতে পান নাই।

৫। ইন্দ্রদেব তাঁহার বৃহৎ ও বধকারী বজ্রের সহিত লোকের উপদ্রবকারী বৃত্রাসুরকে লোকে যেমন কুঠার দ্বারা বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করে, তদ্রূপ বাহুচ্ছেদন পূর্ব্বক বধ করিয়াছিলেন, এবং বৃত্রাসুরকে তদবস্থ ভুমির উপর পতিত করিয়াছিলেন।

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দর্পযুক্ত বৃত্রাসুর মহাবীর ও বহুশত্রু নিবারক ইন্দ্রদেবকে যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্ত্র প্রহার হইতে কোন প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদী সকলের উপর পতিত হইয়া তাহাদের কূলাদি ভগ্ন করিয়াছিল।

৭। হস্ত ও পদশূন্য হইয়াও বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র ইহার পাষাণ সদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র

নিক্ষেপ করিয়াছিল। পৌরুষ বর্জ্জিত ব্যক্তি যদ্রূপ পৌরুষ বিশিষ্ট ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল।

৮। নদীর জল সকল ভগ্ন কূলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয় তদ্রূপ নদীর উপর পতিত বৃত্রাসুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রাসুর জীবনদশায় যে জল সকল বলের দ্বারায় রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন সেই জল সকলের নিম্নে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পতিত রহিল।

৯। বৃত্রাসুরের মাতা পুত্র দেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বৃত্রকে ব্যবহিত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃত্রের মাতার উপর বজ্র প্রহার করেন, তাহাতে বৃত্রমাতা হত হইয়া গাভী বৎসের সহিত যেমন শয়ন করে, তদ্রূপ মৃত পুত্রের উপর পতিত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন করিয়াছিল।

১০। অবিশ্রান্ত প্রবহনশীল নদী সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জল সমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রদেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

১১। দাস এবং অহিনামে প্রসিদ্ধ বৃত্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল যদ্রূপ পণি নামক অসুর গো সকল গুহাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া সেই সকল নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহ মার্গ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বৃত্রাসুর আপনার বজ্রে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল তখন আপনি অনায়াসে বৃত্রাসুরকে

নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রূপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমূহ মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে। তদনন্তর আপনি পণি নামক অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত অনিরুদ্ধ ও নিরুদ্ধ গো সমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। জয়লাভ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং সপ্ত নদীর প্রবাহ নিরোধ অপনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

১৩। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ প্রহার, যে গর্জ্জণ, যে বর্ষণ, যে অশনি নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই ইন্দ্রের অনিষ্ট করিতে ব্যার্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে অভিভূত করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একোন-শত সংখ্যক প্রবহনশীল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন বৃত্রাসুর বধের নির্ঘাতনেচ্ছু কোন্ জনকে দেখিয়াছিলেন?

১৫। বজ্রধর ইন্দ্রদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দুর্দ্দান্ত জীবগণের অধীশ্বর। এবম্ভূত ইন্দ্রদেব মনুষ্যদিগের প্রভু। রথচক্রের নেমি যদ্রূপ চক্রগত অরাখ্য কাষ্ঠ সকল বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি মনুষ্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করেন।*"

এই সূক্তের তাৎপর্য্য বড় স্পষ্ট। পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ। বৃত্র বৃষ্টিনিরোধকারী নৈসর্গিক ব্যাপার। বর্ষনশক্তির দ্বারা সেই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার অপহিত হইলে বৃত্রবধ হইল। এই সূক্ত বর্ষনকারী আকাশের

* এই অনুবাদ ৺ রমানাথ সরস্বতী কৃত।

সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মাত্র। ইন্দ্র এখানে কোন চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, এবং এ সূক্তে তাহার কোন সকাম উপাসনাও নাই।

স্বীকার করি, এক্ষণে বৈদিক সংহিতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই সকাম, এবং উপাস্যেরা তাহাতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু জড়-শক্তির প্রশংসা-পদ্ধতি ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিলে, শব্দের আড়ম্বরে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইল। "জগতের রাজা," এবং "জীবগণের অধীশ্বর" ইত্যাকার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জীবের রক্ষা, লোকে ইহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যবিশিষ্ট রাজা এবং জীব-গণের চৈতন্যবিশিষ্ট অধীশ্বর মনে করিতে লাগিল। তখন জগতের জড়শক্তির নিষ্কাম প্রসংশার স্থানে সকাম উপাসনা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনু-শীলন মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহুল উপধর্ম্মে পরিণত হইল।

বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি কি তাহা উপরি উদ্ধৃত অপেক্ষা-কৃত প্রাচীন সূক্তগুলি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদ-সংহিতার সকল সূক্তগুলি এক সময়ে প্রণীত হয় নাই; এবং ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র বহু দেবতার উপাসনাত্মক উপধর্ম্মই যে আছে, এমত নহে। অনেকগুলি এমত সূক্ত আছে, যে তাহা হইতে আমরা একেশ্বরবাদই শিক্ষা করি। সময়ান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব। সেইগুলি যে বৈদিক ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, আর উপরি উদ্ধৃত সূক্তের সদৃশ সূক্তগুলি যে আদিম অবস্থায়, আর সচেতন ইন্দ্রাদির উপাসনাত্মক সূক্তগুলি

প্রধানতঃ যে মধ্যাবস্থায় প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ণ করিবে সেই বুঝিতে পারিবে। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন,। সঙ্কলন ব্যতীত চতুর্ব্বেদের বিভাগ হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা ব্যক্তির দ্বারা, নানা সময়ে প্রণীত হইযাছিল। অতএব, আদিম. মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার স্থক্ত বলিয়া স্থক্তগুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা জড় প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্য-বাদ, এবং পরিনতি একেশ্বরবাদে। অতএব স্থক্তের তাৎপর্য্য বুঝিয়া তাহার সময় নির্দ্দেশ করা যায়।

এক্ষণে প্রচারের দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই;—

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন লোকোত্তর চৈতন্য নহে।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে ছিল বাআছে।

৩। তাহার কারণ এই যে প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপন করিয়া তাহার শক্তি, হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য্য অনু-সারে তাহার উপাসনা করে।

৪। এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান, সুন্দর বা উপকারী জড়পদার্থের প্রশংসা বা আদর মাত্র। কালে লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পরিণত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে ইতর দেবোপাসনা এই অবস্থায় পরিণত হই-য়াছে। ঈদৃশ উপাসনা অনিষ্টকর এবং উপধর্ম্ম। কিন্তু ইহার

মূল অনিষ্টকর নহে। জড়শক্তিও ঈশ্বরের শক্তি। সে সকলের আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং তদ্দ্বারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন করা বিধেয় বটে।

বৈদিক ধর্ম্মের এই স্থূল তাৎপর্য্য। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মেও সেই সকল বৈদিক দেবতারা উপাসিত। অতএব এখনকার হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। জড়ের শক্তির চিন্তার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনী এবং চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন করিব, এবং ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু জড়ের উপাসনা করিব না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের একটি স্থূল কথা।

এক্ষণে বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত দেবতা তত্ত্ব সমাপ্ত করিয়া, আমরা বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত ঈশ্বরতত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। হিন্দুধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।

কৃষ্ণচরিত্র।

কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচন করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কিনা তাহা তাহা আমি এখন কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের এখন কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা আমার যদি সেই

মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত গ্রহণকরিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধিও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। আমি স্থানান্তরে বলিয়াছি, যে স্বর্গ জেলখানা নহে—তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, একথা আমি মনে করি না। ধর্ম্ম একবস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌঁছিবার অনেক পথ আছে—কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রীষ্টিয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে। * অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে আমি তাঁহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি যে কৃষ্ণদ্বেষীও আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভবিবেন না।

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, যে আমরা যে তাঁহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন করিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। আমরা তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনুষ্যাতীত কোন প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল। এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মনুষ্যস্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য্য করিবেন। তিনি কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিলেন,

* "ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অ।

তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মানুষের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে? *

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবে না। যদি এরূপ কথা কোথাও থাকে তবে, যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের হয় স্বীকার করিতে হইবে, যে কৃষ্ণ ঈশ্বর নহেন, নয় দেখাইতে হইবে যে ঐ সকল প্রবাদ অমূলক। কেননা মনুষ্য ধর্ম্মের আদর্শ-প্রচার ভিন্ন আর কোন কারণে ঈশ্বরের মনুষ্য-দেহ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না। † কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই, যে

---

* We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting him where he can be no example to us at all. Let no fear of losing the dear great truth of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature; as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the wilderness; year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature; a humanity which, though given up to death on the cross, expressed all that is within the capacity of our own humanity; and if we really follow him we shall be holy even as he is holy.

Sermon by Dr Brooky, delivered at Trinity Church, Boston March 29th, 1885.

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।

† যে দুই একস্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, কখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন নাই। বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।" ‡

তিনি যত্নপুর্ব্বক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপরে চড়ে। কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণ স্বরূপ, তিনি খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুষিক।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান বাসুদেব পরম প্রীত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিপুজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন। তখন বাসুদেব সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে

‡ উদ্যোগ পর্ব্ব ৭৮ অধ্যায়

নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিনী ভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদীও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডবকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণপরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধন দানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্র যুক্ত মুহূর্ত্তে গদা চক্র অসি শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিবৃত গরুড়-কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্‌গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং

সহদেব ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ যোজন গমন করিয়া শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জন পরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া

দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও পরমাহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন শাম্ব নিশঠ চারুদেষ্ণ গদ অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।”

এদিগে সভানির্ম্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়েই মত করিল। কিন্তু যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক—কেননা কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে সম্রাট্ না হইলে রাজসূয় যজ্ঞ করা হয় না। মগধাধিপতি জরাসন্ধই তখন সম্রাট—জরাসন্ধকে জয় না করিলে রাজসূয় যজ্ঞ হইবে না। জরাসন্ধ জয়ের পরামর্শের স্থূল মর্ম্ম আমরা পরে বলিব। এক্ষণে জরাসন্ধের পূর্ব্ব পরিচয় বিষয়ে কৃষ্ণ যাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, তাহার প্রতি প্রথমে মনোযোগ আবশ্যক। কেননা ইহাতে কৃষ্ণের নিজের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু আছে। অতএব ইহা কৃষ্ণচরিত্র সমালোচকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। আমরা সেই অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। কৃষ্ণ কহিতেছেন।

“কিয়ৎকাল অতীত হইল দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে

বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংশের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্রদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বকনামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিলেন।

* * * *

"কিয়দ্দিনান্তর পতিবিয়োগ-দুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার পতিহন্তাকে সংহার কর বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধন সম্পত্তি বিভাগ করত সকলে

কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিমদেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি—তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথদিগের কথা দূরে থাকুক স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতকপর্ব্বত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রব ভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণসকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব সাত্যকি আমি বলভদ্র যুদ্ধবিশারদ সাম্ব, আমরা এই সাতজন রথী, কৃতকর্ম্মা অনাধৃষ্টি সমীক সমিতিঞ্জয় কঙ্ক শঙ্কু ও কুন্তি এই সাতজন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশজন মহাবীর, ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যমদেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।”*

* বলা বাহুল্য যে এই অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত। মূলের সঙ্গে মিলান হয় নাই।

এই কৃষ্ণকথিত পূর্ব্ববৃত্তান্ত হইতে আমরা কয়টি কথা লইতেছি।

১। কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনকাল সম্বন্ধে যে ইতিহাস প্রচলিত, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম হইবামাত্র কংসভয়ে বসুদেব তাঁহাকে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন, সেই খানে তিনি বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেন, তারপর অক্রুর গিয়া তাঁহাকে কংসবধার্থ মথুরায় আনেন, এ সকল অমূলক। কংস যে তাঁহার মাতুল নহে, কংস যে দেবকীপুত্র দ্বারা নিধন শঙ্কায় দেবকীকে কারারুদ্ধ রাখেন নাই, ইহাও বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে। তবে কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে পলাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বটে, কেন না কৃষ্ণ বলিতেছেন, যে "ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ কংসের দৌরাত্ম্যে ভীত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,।" কৃষ্ণ যে তাহা না করিয়া কংস বিনাশ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধন করিয়াছিলেন, ইহাও দেখা যাইতেছে।

২। তিনি ঈশ্বর হইলেও, ঐশী শক্তির দ্বারা কোন কাজ করেন না, মানুষী শক্তির দ্বারা কাজ করেন। ঐশীশক্তির দ্বারা ইচ্ছাক্রমেই জরাসন্ধকে নিরস্ত করিতে পারিতেন।

৩। যেখানে যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধের ফলসাধন হইতে পারে, সেখানে যুদ্ধে তিনি প্রবৃত্তিশূন্য।

৪। কৃষ্ণ বিনীত। নিজ সম্বন্ধে তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট যাহা বলিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র আত্মগৌরব প্রকাশের চেষ্টা নাই। বরং আপনার কাজ বর্ণনকালে যত অল্প কথা ব্যবহার করা যায়, তাহাই করিয়াছেন।

যিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র মনে করেন, বোধ করি তিনিও এ কয়টা কথা স্বীকার করিবেন। আর যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি ইহাতে দেখিবেন যে কৃষ্ণ মনুষ্যশরীরেও জীবের প্রতি দয়াময়, নিঃস্বার্থ, অথচ দুষ্টের দণ্ডপ্রণেতা এবং রাজনীতির আদর্শ স্বরূপ।

ঈশ্বরোপাসনা।

শি। ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেই সমস্ত কথা সংক্ষেপে আর একবার বলি শুন।

১ম। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় তাহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা।

২য়। মুখে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে; পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করিতে জানেন না। মুখের কথায় বোঝা আর অন্তরে অনুভব শক্তিদ্বারা বোঝা, এই উভয়ে অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করিবার নামই ঈশ্বরোপাসনা।

৩য়। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সাধারণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সেই অজ্ঞতা দূর না হইলে মনুষ্য প্রকৃত পক্ষে সুখী হইতে পারে না; এই বিশ্বাসটি অন্তরে দৃঢ়ীভূত হইলে আমাদের মনে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার জন্য একটি পিপাসা উপস্থিত হয়। এই জ্ঞান-পিপাসা ঈশ্বরোপাসনার প্রথম অংশ।

৪র্থ। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে পথ

অবলম্বনে সেই অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হওয়া যায় সেই পথ অবলম্বনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

৫ম। যেমন অপরিষ্কার দর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট পড়িতে পায় না, সেইরূপ সমল চিত্তে ঈশ্বরের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয় না। চিত্ত উন্নত ও নির্ম্মল না হইলে ঈশ্বর কি তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। সেই জন্য যে পথ অবলম্বনে চিত্ত উন্নত ও নির্ম্মল হয় সেই পথ অবলম্বনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

৬। যদি চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন জন্য কেহ কোন দেব দেবী রূপ সূক্ষ্মশক্তির সাহায্য অবলম্বন প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তবে সেই দেব দেবীর আরাধনাকেও ঈশ্বরোপাসনা বলিতে হইবে।

৭ম। চিত্তের উন্নতি সাধন করিতে গেলে মনুষ্যের উন্নত দশার চরম আদর্শ স্বরূপ কোন পুরুষের আদর্শ চিন্তা দ্বারা, সেই আদর্শকে সদাই অন্তরের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া সেই আদর্শানুযায়ী উন্নত হইবার চেষ্টা করা উচিত।

৮ম। আমাদের মন বড় অস্থির। কোন আদর্শ চরিত্র মনোমধ্যে সদা সর্ব্বদা ধরিয়া রাখা বড় সহজ কথা নহে। সেই জন্য এই আদর্শপুরুষের সঙ্গে আমাদের মনকে কোন বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখা চাই। উন্নত পুরুষের সহিত মনের বন্ধনদৃঢ় করিবার জন্য দৃঢ়া ভক্তির প্রয়োজন। এই জন্য ভক্তির সম্যক্ উৎকর্ষসাধন ব্যতীত ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

৯। অনেকে ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল ঈশ্বর কথাটীর উপর ভক্তি স্থাপন করিয়া সেই ভক্তিবৃত্তির চালনা করাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসক তাঁহার কর্ম্মানুযায়ী কোন দেবশক্তির সাহায্য পাইলেই

সেই দেবশক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া দুস্তর ভ্রমে পতিত হইয়া পড়েন। সুতরাং যাহাতে এইরূপ ভ্রমে পড়িতে না হয়, সেইজন্য ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা উচিত।

১০। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যে এক শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত-শক্তি। জগতে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত শক্তিই—কি স্থূল কি সূক্ষ্ম সকলেই - সেই এক শক্তির বিকার মাত্র। সমগ্র জগতের সমষ্টি শক্তিই ঈশ্বরের শক্তি। এই শক্তিকে হিন্দুশাস্ত্রে বিশুদ্ধ চৈতন্য শক্তি বলিয়া থাকে।

১১। যিনি তাঁহার আত্মশক্তি এই সমষ্টি শক্তির সহিত একতানে মিলাইতে পারিয়াছেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বর কি তাহা বুঝিয়াছেন। এই সমগ্র জগৎকে তিনি অখণ্ড ও অদ্বিতীয় বলিয়া বুঝিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র জগতের সমষ্টিভাব হইতে তিনি আপনাকে পৃথক্ বলিয়া আর বুঝেন না। এইরূপ যিনি

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ

তিনিই উন্নত দশায় চরম আদর্শ পুরুষ এবং তিনিই সগুণ ঈশ্বর।

১২। এই সমগ্র জগতের সমষ্টিভাবই ঈশ্বর, এইটি স্পষ্ট বুঝিলে ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, ঈশ্বর বিশ্বরূপ ও অনন্ত এই সকল বিশেষণ শব্দগুলির অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৩। মনুষ্যের কর্ম্মের ফলদাতা শক্তির নাম দেবদেবী। দেবদেবীগণ অনিত্য সুখের প্রলোভনে মানুষকে দগ্ধ করিয়া

রাখে এবং সেই জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া আছে। দেবদেবীগণের প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যতদিন সামান্য অনিত্য সুখের কামনা মনুষ্য হৃদয়ে প্রবল থাকিবে ততদিন তিনি নিত্যসুখদাতা ঈশ্বর যে কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। সেইজন্য যিনি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা করিতে চান তাঁহাকে প্রথমতঃ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। যে পাদরি মহাশয় সপ্তাহের সমস্ত ঘণ্টাই অনিত্য ধন মানের সুখ কামনায় মুগ্ধ হইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং এক ঘণ্টা গির্জ্জায় গিয়া চোক বুজিয়া নিরাকার ঈশ্বর ভাবিতেছেন, তিনি ঈশ্বর কি তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সকাম কর্ম্মই দেবদেবীর উপাসনা এবং নিষ্কাম কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা।

১৪। উপাসনার পথে চলিতে চলিতে শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান ও মুমুক্ষুত্ব এই ছয়টি গুণ যখন ক্রমে ক্রমে উপাসনার অন্তরে বিকশিত হইবে, তখনই তিনি ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পথে চলিতেছেন বুঝিতে হইবে। এবং যে উপাসনা দ্বারা অন্তরে এই সকল গুণের ক্রমবিকাশ না হয় তাহা তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে। ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আজ যাহা সংক্ষেপে বলিলাম এবং পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি ইহা সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের সার কথা। তুমি এইবারে বেদান্ত সম্বন্ধে বেদান্তসার গ্রন্থখানি এবং ভগবদ্গীতাখানি পাঠ করিও তাহা হইলেই হিন্দুধর্ম্মের ভিতর কি গভীর মনোহর ভাব আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি।

৩। রাধাকৃষ্ণ।

আমি একটা প্রাচীন গীত আপন মনে গায়িতেছিলাম।

"ব্রজ ত্যেজে যেওনা,, নাথ,"—

এইটুকু গায়িতে না গায়িতে, বাবাজি "অহঃ" বলিয়া, একেবারে কাঁদিয়া অজ্ঞান। আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজি বলিলেন,

"হাসিলি কেন রে বেটা?"

আমি বলিলাম, "তুমি হাঁ করতেই কাঁদ তাই আমি হাসি।"

বাবাজি। হাঁ ক'রে যা বলেছিস্, সে কথাটা কিছু বুঝেছিস্? না শালিক পাখির মত কিচির কিচির করিস্?

আমি। বুঝব না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বল্‌চেন যে তুমি আমাদের ব্রজ ছেড়ে যেও না।

বাবাজি। ব্রজ কি বল্ দেখি?

আমি। কৃষ্ণ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোপীদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন।

বাবাজি। অধঃপাতে যাও। ব্রজ ধাতু কি অর্থে বল দেখি?

আমি। ব্রজ ধাতু! অষ্ট ধাতুইত জানি। আবার ব্রজ ধাতু কি?

বাবাজি। ব্রজ গমনে। ব্রজ, অর্থাৎ যা যায়।

আমি। যা যায়, তাই ব্রজ? গোরু যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমি যাও—সব ব্রজ?

বাবাজি। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল দেখি?

আমি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ।

বাবাজি। জগৎ কোন্ ধাতু হইতে হইয়াছে?

আমি। ধাতু-ছাড়া যা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিব ও কথাটা শুনিলেই কেমন ভয় করে।

বাবাজি। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা যায়, তাই জগৎ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক।

আমি। ব্রজ তবে একটা জায়গা নয়? আমি বলি বৃন্দাবনই ব্রজ।

বাবাজি। বৃন্দাবন নামে যে শহর, এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠাকুরেরা তৈয়ার করিয়াছেন। নহিলে বৃন্দাবন নামে কোন নগর বা গ্রাম পূর্ব্বে ছিল না।

আমি। তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছে?

বাবাজি। "বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্" যে স্থানে বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন (করেন বলিলেই ঠিক হয়) সেই বৃন্দাবন।

আমি। বৃন্দা কে?

বাবাজি। রাধা ষোড়শ নাম্নাং চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।

তস্যাঃ ক্রীড়া বনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্

রাধাই বৃন্দা।

আমি। রাধা কে?

বাবাজি। রাধ ধাতু—

আমি। ধাতু ছাড় বাবাজি।

বাবাজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্তৌ, তোষে, পূজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, যে তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার পূজা (বা আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেই রাধা। তুমি ঈশ্বরভক্ত হইলে রাধা হইবে।

আমি। তবে তিনি গোপিনী বিশেষ নন?

বাবাজি। গোপিনী শব্দ হয় না—গোপী শব্দ। কাকে বল?

আমি। গোপের স্ত্রী গোপী।

বাবাজি। গো শব্দে পৃথিবী। যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারাই পৃথিবীর রক্ষক। তাঁহারাই গোপ। স্ত্রীলিঙ্গে তাঁহারা গোপী।

আমি। গোলোক কি তবে?

বাবাজি। এই পৃথিবী গোলোক—ভূলোক।

আমি। আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যদি রূপক হইল, তবে নন্দ কি?

বাবাজি। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার করি না, এই একটা উপসর্গ। যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ।

আমি। ভগবান্ কি আনন্দে জন্মেন, যে তিনি নন্দনন্দন?

বাবাজি। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, এ কথা কেহ বলে না। তিনি বসুদেবের পুত্র, নন্দালয়ে ছিলেন এই মাত্র।

আমি। সে কথারই বা অর্থ কি?

বাবাজি। পরমানন্দ ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ তিনি আনন্দেই বিদ্যমান।

আমি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য কি?

বাবাজি। ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়?

আমি। সবই রূপক দেখিতেছি। কৃষ্ণও কি রূপক নন?

বাবাজি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়া, এই ধর্ম্মার্থক রূপকটি গঠন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের নামের আর একটা অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল। কৃষ ধাতু কর্ষণে বা আকর্ষণে। যিনি মনুষ্যের চিত্ত বা কর্ষণ আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ।

আমি। এটা বাবাজি কষ্টকল্পনা।

বাবাজি। তাত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কষ্টকল্পে ঘটাইতে হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর। তাঁহাকে নমস্কার কর।

আমি। কিন্তু রূপকের কি হইবে? রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব কি?

বাবাজি। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভক্তের উপাসনা করিবে। কেননা ভক্ত তন্ময়, ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত। জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে। অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ

আমি। শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত মন্ত্রের ঋষি কে—তাহা জানিতে হইবে। মন্ত্রের ঋষি কে—ইহা না জানিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের মধ্য শক্তি কিরূপ চৈতন্যযুক্ত ইহা না জানিয়া যিনি মন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে পাপভাক্ হইতে হয় ইহা শ্রুতির কথা।

যোহস্য অবিদিত ঋষিচ্ছন্দো দৈবত বিনিয়োগেন ব্রাহ্মণেন বা মন্ত্রেণ বা যজতি যাজয়তি বা অধীতে অধ্যাপয়তি বা হোমে কর্ম্মণি অন্তর্জলাদৌ বা স পাপীয়ান্ ভবতি।

এখন দেখ বেদোক্ত ধর্ম্মচারী ঋষিগণকে জড়োপাসক বলা কি কোন ক্রমে সঙ্গত হয়? যে পাশ্চাত্যগণ হিন্দুদের জড়োপাসক বলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই জড়োপাসক। পাশ্চাত্যগণ আজকাল নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল শক্তি যে, চৈতন্যময়ের চৈতন্যযুক্ত ইহা একবারও ভাবেন না। জগতে ঐ সকল শক্তি দ্বারা চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে পাশ্চাত্যগণ তাহা একবার অনুসন্ধানও করেন না। পাশ্চাত্যগণ ঋষি বিনিয়োগাদি না জানিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সহিত খেলা করিতেছেন। শ্রুতি মতে উঁহারা পাপভাগী হইতেছেন।

আমার বোধ হয় যে দিন হইতে ডাইনামাইট সৃষ্ট হইয়াছে সেই দিন হইতে পাশ্চাত্যগণের উক্ত পাপের ফল ফলিবার সূত্রপাত হইয়াছে।

হিন্দুরা জড়োপাসক নহে। চৈতন্যবিহীন পদার্থ হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য পদার্থ। আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলা হয় যেমন অগ্নি বায়ু নদী পর্ব্বত ইত্যাদি ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যময়ের চৈতন্যযুক্ত পদার্থ, চৈতন্যবিহীন পদার্থ আর

মৃত শরীর এই দুইটি [illegible] হিন্দু একই অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দু থাকিতে চান না।

সব হ্যায় ফাক্।

(৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাগুলি পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। সেই গুলি সাধারণে পরিচিত হয়, ইহা প্রচারকর্ত্তাদিগের উদ্দেশ্য। অন্যান্য পত্রে, সরল কবিতার নমুনা বাহির হইয়াছে। আমরা অন্য রকমের একটু উদাহরণ দিলাম।)

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ বাবা সব হ্যায় ফাক্।
ধনের গৌরব কেন মিছা কর জাঁক্, বাবা মিছা কর জাঁক্॥
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পরে পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্।

নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকার দেহ শুদ্ধ,
চারিদিকে হবে স্তব্ধ, রোদনের ডাক্।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক্॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্।

মিথ্যা প্রবঞ্চনা রত, শত শত অহঙ্কৃত,
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দেও পাক্।
পোষাকের ঘটা মোটা, জুতা পায়ে এড়ি ওঁটা,
কপালে তুড়িয়া ফোঁটা, গোঁজা করে নাক্,
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্,
নারীর কোমল গাত্র মদনের সুরাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র নয়নের তাক্।

বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় জরির কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্।

স্নেহ করে পরিজন, সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাখ লাখ।
রাখিয়াছে বাপদাদা, রূপ ধপ বর্ণ শাদা,
শারি শারি তোড়া বাঁধা শোকে থাকে থাক॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্।

হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক।
তুমি কেবা কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছা মিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্।

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল,
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক।
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্।

সব ভর্‌পুর।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর, বাবা সব ভরপুর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ পথে মন দেহ,
পরিহরি মোহগেহ, চল সুরপুর।
গৌরবযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার,
করহ ও কার সার, গর্ব্ব হবে চুর॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভর্‌পুর।

নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ,
কাঁদিবে জনম শোক, আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন পদ্ম, মনমধুকর সদ্য,
কৈবল্য কমল পদ্ম, পাইবে মধুর ॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভর পুর।

সুখ কল্পনা মিথ্যা নয়, যত অনুগত চয়,
শীলতার বশ হয়, শুন হে চতুর।
বিধাতার সুনির্ম্মাণ, সুখদ সম্ভোগ প্রাণ,
ভোগ যোগে রাখ মান, দুঃখ হবে দূর ॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভর পুর।

সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর পুর।
তাহে প্রজা বৃদ্ধি কর, প্রজাপতি পথ্য রয়
পিতৃ নাম রহে কয়, বুদ্ধি হয় তুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভর পুর ॥

পরিজন স্নেহ নিধি, যতনে মিলায় বিধি,
এত নহে মন্দ বিধি, সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব,
মনোগত এই ভাব, আদেশ মনুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভর পুর।

আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম্ম হয় যথোযোগ,
এত নহে পাপ রোগ, অসাধ্য সাধুর।
সুখের এ কর্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে ঊর্মি,
এ সব তেয়াগিয়ে তুমি, হইবে ফতুর ॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভর পুর।

কুম্ভধারী নট মত, হয় কাল অবিরত,
গৃহকার্য্যে থাকি রত, দিবা হে ঠাকুর।
চরম সময়ে তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হবে ভবার্ণব, যাবে শান্তিপুর ॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥